আর্ট ও বাংলার রেনেসাঁস

অন্নদাশঙ্কর রায়

আর্ট
ও বাংলার রেনেসাঁস

আর্ট
ও বাংলার রেনেসাঁস

অন্নদাশঙ্কর রায়

পা রু ল

সূচি

আর্ট

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

টলস্টয়ের মতো মহাশিল্পী তাঁর কীর্তির শিখরে বসে আর্টজিজ্ঞাসা লিখে তাঁর আপন সৃষ্টিকেই খর্ব করেছিলেন। এটা আমার মনে লেগেছিল। কারণ আমি ছিলুম তাঁর *আনা কারেনিনার* মন্ত্রমুগ্ধ।

বিশ বছর বয়সে সেই যে আমার মনে আর্টজিজ্ঞাসা সঞ্চারিত হয় তারই পরিণতি এই 'আর্ট'। এটি লেখার কল্পনা আমার ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে, যখন আমি *সত্যাসত্য* রচনায় নিবিষ্ট। খাতার পাতায় নোট করে যাই, কিন্তু প্রবন্ধ আকার দিইনে। চল্লিশ বছর বয়সে বুদ্ধদেব বসুর আহ্বান পাই। তাঁর সম্পাদিত *কবিতা*র জন্যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ চাই। বিষয় আর্টের মূলসূত্র।

তখনও আমার বলবার কথা আমারই কাছে পরিষ্কার হয়নি। বুদ্ধদেব বসুর আহ্বানে সাড়া দিলে অপদস্থ হব। তা সত্ত্বেও রাজি হয়ে গেলুম। আর কিছু না-হোক সম্পাদকের চাপে নিবিড়ভাবে ভাবতে বাধ্য হব। কিন্তু কয়েকটি প্রবন্ধ লেখার পর দেখি দেশময় অশান্তি। সাম্রাজ্য টলমল। আমার উপরে রাজপুরুষোচিত দায়। কোনোমতে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখতে পারলুম। তারপর আমার চোখের সুমুখে দেশ ভেঙে গেল। সেই ভাঙনের দিনে আমার উপরে চাপল আরও দুর্বহ দায়। শেষে সব ছেড়ে দিয়ে দায়মুক্ত হলুম।

ভেবেছিলুম অঢেল অবসর পাব ও যত খুশি লিখব। কিন্তু রাষ্ট্র থেকে দূরে সরে থাকলেও দেশ থেকে তো বিদায় নিইনি। সাময়িক সমস্যাই আমার কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। অনেক দিন পরে 'অন্তঃসার' লিখি। কিন্তু তার পরের প্রবন্ধ 'অন্তঃসৌন্দর্য' আরম্ভ করে আর এগোতে পারিনে। এবার দেশের দশা দেখে নয়; এবার আমার নিজেরই আইডিয়া স্পষ্ট নয় বলে। জোর করে তাকে স্পষ্ট করা যেত না। অপেক্ষা করাই শ্রেয়। প্রজাপতিকে ধরতে ছুঁতে পাকড়াতে ও পিনবদ্ধ করতে এগারো বছর লাগল।

ওই প্রবন্ধটিকে ডিঙিয়ে যেতে পারলে এ বই কবে শেষ হয়ে যেত। কিন্তু তাহলে বাকিটা ঠিকমতো লেখা হত না। আমার চিন্তার বিবর্তনে ওই প্রবন্ধটি একটি স্টেজ।

আরও কয়েকটা প্রবন্ধ লেখার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু তাহলে আরও অনেক দেরি হত। যে বইয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে বিশ বছর কি তারও আগে, তাকে আর ফেলে রাখা যায় না। আমার প্রকাশক অতিশয় সজ্জন। তা বলে তিনি চিরকাল ধৈর্য ধরতে পারেন না। তাই এইখানে দাঁড়ি টানছি। সবসময় কিছু হাতে রেখে দেওয়াও আর্ট। হাত একেবারে খালি করে দিতে নেই। তা ছাড়া আমার আর্টজিজ্ঞাসাও অফুরন্ত।

অন্নদাশঙ্কর রায়

১২ নভেম্বর ১৯৬৮

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আর্ট কথাটি আমি পাই বারো বছর বয়সে *সবুজপত্র* পড়তে গিয়ে। বাংলা হরফে লেখা এই ইংরেজি শব্দটির অর্থ কী তখন আমি জানতুম না। কিন্তু শব্দটি আমার মনে গেঁথে যায়। কলেজে পড়তে গিয়ে হাতের কাছে পাই টলস্টয়ের বই *হোয়াট ইজ আর্ট*। কতক বুঝি কতক বুঝিনে। অস্কার ওয়াইল্ড না কার রচনায় পাই 'আর্ট ফর আর্টস সেক'। আর্টের জন্যই আর্ট। টলস্টয় কিন্তু এটা সইতে পারেন না। সত্য আর শিব তাঁর কাছে শ্রেয়। সৌন্দর্যই একান্ত নয়। রম্যা রল্যাঁর দৃষ্টি ছিল জনগণের উপরে। শেষবয়সে টলস্টয়েরও তাই। আর্ট যেন তাঁদের জন্যে।

এই নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে করতে একদিন পাটনা থেকে যাই শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথকে নির্জনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'Is Art too good to be human nature's daily food?' আর্ট কি এতই ভালো যে মানবপ্রকৃতির দৈনন্দিন পথ্য হতে পারে না?

তিনি একটু ভেবে নিয়ে বলেন, 'তা কী করে হবে? উচ্চতর গণিত কি সর্বজনবোধ্য? আগে সহজ গণিত শিখতে হবে।'

বোঝা গেল যে আর্ট উচ্চতর গণিতের সঙ্গে তুলনীয়। তাহলে তো শুধু বিদগ্ধজনের জন্যে। মন মানে না। বছর চারেক বাদে সুইটজারল্যাণ্ডে গিয়ে রম্যা রল্যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি ও সেই একই প্রশ্ন শুধাই। তিনি তা শুনে বিরক্ত হয়ে বলেন, 'রেনেসাঁসের যুগে সাধারণ কারিগররাও সুন্দর সুন্দর ভোগ্যসামগ্রী তৈরি করত। সাধারণের জন্যে। সকলেই ব্যবহার করত, সকলেই খুশি হত। আর্ট কতক লোকের বিলাসবস্তু নয়।

নানা মুনির নানা মত শুনে আমি নিজের জন্যে একটা পথ খুঁজে বার করি। আমি পাঠকদের দিকে অর্ধেক দূর যাব। পাঠকরা আমার দিকে অর্ধেক দূর আসবেন। আমি যেমন তাঁদের জন্যে শ্রম স্বীকার করব, তেমনি তাঁরাও আমার জন্যে শ্রম স্বীকার করবেন। বিনা শ্রমে গড়বার মতো লেখা আমার নয়। বিনা শ্রমে আমিও তো লিখিনে। বিশুদ্ধ আর্টের রসাস্বাদন ও রূপভোগের জন্যে জনগণকেও প্রস্তুত হতে হবে। তা সেসাহিত্যই হোক আর সংগীতই হোক আর চিত্রই হোক। যা নিছক জনপ্রিয়, তা রসোত্তীর্ণ ও রূপতীর্থ তথা কালোত্তীর্ণ হয় না। উত্তীর্ণ হওয়াটাই লক্ষ্য।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়ে কার্তিক ঘোষ আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। শিশুসাহিত্য রচনায় ইনি সুনাম অর্জন করেছেন। প্রকাশনায়ও তিনি সার্থকতা অর্জন করবেন আশা করি।

১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৯

অন্নদাশঙ্কর রায়

আর্ট কী ও কী নয়

লেখার ভিতর দিয়ে আমি আমার আপনাকে দিচ্ছি, যিনি পড়ছেন তিনি আমাকে পাচ্ছেন। গানের ভিতর দিয়ে আমি আমার আপনাকে দিচ্ছি, যিনি শুনছেন তিনি আমাকে পাচ্ছেন। ছবির ভিতর দিয়ে আমি আমার আপনাকে দিচ্ছি, যিনি দেখছেন তিনি আমাকে পাচ্ছেন।

আরও আছে। কিন্তু যে-কথাটা বোঝাতে চাই সেটা এই যে, একটা-না-একটা ছলে আমি আমার আপনাকে দিচ্ছি আর তিনি আমাকে পাচ্ছেন। আমার পক্ষে এই দেওয়াটা আনন্দের, তাঁর পক্ষে ওই পাওয়াটা আনন্দের। দেওয়া ও পাওয়ার এই যে ছল বা উপলক্ষ্য বা মাধ্যম এরই নাম আর্ট। এও আনন্দের।

আমরা অনেক সময় বলে থাকি রান্না একটা আর্ট। অযথা নয়। রান্নার ভিতর দিয়ে একজন তার আপনাকে দিতে পারে, যে খায় সেতাকে পেতে পারে। দেওয়া ও পাওয়ার এটাও একটা ছল বা উপলক্ষ্য বা মাধ্যম। স্যাকরা যে গয়না গড়ে, ধোপা যে কাপড় কাচে, গাড়োয়ান যে গাড়ি হাঁকায়, পসারিনি যে পসরা হাঁকে, এদের এক-একটি ছলে আপনাকে দেওয়া, আপনার পরিচয় দেওয়া, এক-একটি আর্ট বলে গণ্য হতে পারে। যদিও হয় না।

বস্তুত মানুষের আপনাকে দেওয়ার অন্ত নেই, পরকে পাওয়ার অন্ত নেই, দেওয়া ও পাওয়ার ছল বা উপলক্ষ্য বা মাধ্যম অনন্ত অজস্র। আমার এক কালে দুরভিলাষ ছিল যে আমার প্রতিদিনের প্রত্যেকটি কাজ ও অকাজ, প্রত্যেকটি হাসি ও কান্না, প্রত্যেকটি চিন্তা ও বাক্য আর্ট হবে। আমি যখন মরব তখন লোকে বলবে, অমন করে মরাটাও একটা আর্ট। এখন ততবড়ো দুরভিলাষ নেই, তবু এখনও আমি বিশ্বাস করি যে মোটের উপর জীবনটা একটা আর্ট। ঠিকমতো বাঁচতে পারাটা একটা আর্ট। তা যদি হয় তবে জীবনের ছোটো-বড়ো অনেক ব্যাপার আর্ট হতে পারে। তাস খেলাও একটা আর্ট, চুকলি করাও তাই। ঢিল মেরে আম পাড়াও একটা আর্ট, ফাঁদ পেতে প্রজাপতি ধরাও তাই। গম্ভীরভাবে যোগাসনে বসে মেয়েদের দিকে আড়চোখে চাওয়াও একটা আর্ট, পাগলা ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে দিব্যি সরে পড়াও তাই। এসব উপলক্ষ্যেও মানুষ তার আপনাকে দিচ্ছে, আপনার পরিচয় দিচ্ছে। হয়তো কেউ লক্ষ করছে না, কিন্তু করতে তো পারত। লক্ষ করলেই পরিচয় পেত। সবসময় কল্পনা করতে হয় যে কেউ একজন লক্ষ করছেন। আর কেউ না করলেও, অন্তর্যামী ভগবান।

আর্ট কথাটা আমাদের ভাষার নয়। এর ঠিকঠিক প্রতিশব্দ নেই। তবে কলা কথাটা যদি হাস্যকর না হত, তা দিয়ে আর্টের কাজ চলত। হাস্যকর হয়েই মাটি করেছে। ধরুন আমি যদি নিরীহভাবে বলি, আপনার লেখায় কলা আছে, হনুমানেরা আপনাকে খেপিয়ে তুলবে। জীবনটা একটা কলা শুনলে হনুমানেরা ঠাওরাবে আমিও তাদের একজন। সেই ভয়ে আমি ইংরেজি আর্ট কথাটাকে আসরে নামালুম। শিল্প এক্ষেত্রে অচল, কেননা ছলার সঙ্গে কলার নিকট সম্পর্ক শিল্পের মধ্যে একটা আয়াসের ভাব। আর্টিস্টকে আমরা শিল্পী বলে অনুবাদ করে থাকি, কিন্তু ওর চেয়ে খাঁটি অনুবাদ কলাবৎ বা কলাবতী।

আর্ট কথাটার মস্ত দোষ এই যে, আর্ট বলতে যার যা খুশি সেতাই বোঝে। ইদানীং সাহিত্য শব্দটাও পিতৃমাতৃহীন হয়েছে। সাহিত্য সম্মেলনে বিজ্ঞান শাখা ইতিহাস শাখা দেখে ভ্রম হয় বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস বুঝি সাহিত্যের শাখা। যাদের মাথা এত পরিষ্কার তাদের কেউ যদি ধর্মকেও আর্টের আমলে আনে কিংবা আর্টকেও ধর্মের আমলে তবে নালিশ করতে পারিনে। শুধু চতুরাননকে স্মরণ করে নিবেদন করতে পারি, শিরসি মা লিখ। অধুনা চণ্ডীমন্ডপের সমাজপতিরা যদি-বা চুপ করেছেন, তাঁদের চাদর পড়েছে মস্কো মন্ডলের সমাজতন্ত্রীদের কাঁধে। আর্ট এবং মার্কস কথিত সুসমাচার যে এক এবং অভিন্ন হওয়া উচিত, না হলে বুর্জোয়া

বলে বর্জনীয় হওয়া বিধেয়, আধুনিক ভাটপাড়া থেকে এই জাতীয় পাঁতি দেওয়া হচ্ছে। আর্ট যে একপ্রকার প্রোপাগাণ্ডা, প্রোপাগাণ্ডা যে একপ্রকার আর্ট, অপোগণ্ডরা সহজেই তা মেনে নিচ্ছে। না নেবেই-বা কেন? তাদের পূর্বপুরুষেরা যে আবহমানকাল দেবদেবীর মাহাত্ম্য-প্রচারকে *মঙ্গলকাব্য* বলে মেনে এসেছে।

আর্ট কী তার একটা আভাস দিয়েছি, সংজ্ঞা দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। আর্ট কী নয় তার এবার একটা ইঙ্গিত দিই।

আমার অনেক লেখা আছে, সব লেখার ভিতর দিয়ে আমি আমার আপনাকে দিইনি। বৈষয়িক চিঠিপত্র, মামলার রায়, পরিদর্শনের মন্তব্য, তদন্তের রিপোর্ট এসব লেখা আর্ট নয়। যদিও তাদের কোথাও কোথাও হয়তো আমার সাহিত্যিক রুচির ছাপ আছে।

যেমন সব প্রেম প্রেম নয়, তেমনি সব লেখা আর্ট নয়। প্রতিদিন রাশি রাশি লেখা প্রকাশিত হচ্ছে, আরও কত অপ্রকাশিত থাকছে। সব যদি আর্ট হত তবে আনন্দের বিষয় হত, কিন্তু বিষয়কর্ম চলত না। কোম্পানি আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে বারো ভোল্ট ব্যাটারি দিতে পারবে না। আমি যদি এর উত্তরে একটা কবিতা কি প্রবন্ধ লিখে পাঠাই তাহলে কোম্পানি আমাকে পাগলাগারদে পাঠাবে। সব লেখা আর্ট নয়, তাই বাঁচোয়া। নইলে কোম্পানি আমাকে একটা ছোটোগল্প পাঠিয়ে বলত এই তার পালটা জবাব। তখন আমি মনের ঘেন্নায় লেখা ছেড়ে দিতুম।

পৃথিবীতে তিন ভাগ জল যেমন সত্য, জীবনে বারো আনা বিষয়কাজ তেমনি। বিষয়কাজের সঙ্গে আর্টের সম্বন্ধ সদরের সঙ্গে অন্দরের। আমার বিহার উভয়ত্র। আমি নভেলও লিখি, রিপোর্টও লিখি। কিন্তু অন্দরকে যেমন সদর বলে ভ্রম করিনে তেমনি নভেলকে রিপোর্ট বলে; কিংবা রিপোর্টকে নভেল বলে। সব লেখা আর্ট নয়। কারণ সব লেখায় আমি আমার আপনাকে দিতে পারিনে, দেবার ছল পাইনে। ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর, জীবনে এরকম নিত্য ঘটে না। ঘটে হয়তো ক্বচিৎ। যদি কেউ ঘরে-বাইরের ভেদ তুলে দেন তবে তাঁর জীবনটা হাট হয়ে উঠবে। লেখার থেকে আর্ট উঠে যাবে।

যেমন সব লেখা আর্ট নয় তেমনি সব গান আর্ট নয়, সব ছবি আর্ট নয়, সব রান্না আর্ট নয়, সব কান্না আর্ট নয়, সব চুলছাঁটা আর্ট নয়, সব হাতসাফাই আর্ট নয়। দেখতে হবে কীসে মানুষ তার আপনাকে দিয়েছে, দেবার ছল পেয়েছে। কীসে দেয়নি, দেবার ছল পায়নি। সেই অনুসারে স্থির করতে হবে কোনটা আর্ট, কোনটা আর্ট নয়।

আমি চুল ছাঁটাকেও আর্টের মধ্যে ধরেছি, পকেট কাটাকেও। কিন্তু বিজ্ঞান দর্শন বা ইতিহাসকে ধরতে রাজি নই। এর কারণ আমি সাম্রাজ্যবাদী নই, স্বরাজ্যবাদী। বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস সমাজতত্ত্ব এরা একটা স্বতন্ত্র রাজ্য। আর্টও স্বতন্ত্র। পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ নিশ্চয় আছে, না থাকলে অস্বাভাবিক হত। কিন্তু যা আর্ট নয় তাকে আর্টের সীমানার ভিতর পুরলে আর্ট বেচারি কোণঠাসা হয়, তার পা ছড়াবার ঠাঁই থাকে না। আবার উলটো বিপত্তি ঘটে যখন আর্টের উপর ফরমাশ পড়ে বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক হবার। বিজ্ঞানকে বা ধর্মকে আত্মসাৎ করতে গিয়ে আর্ট তাদেরই উদরসাৎ হয়। আজকাল সমাজকে নিয়ে আর্টের এই বিপত্তি।

তবে আর্ট ও আর্ট-নয়ের মাঝখানে কোনো সুনির্দিষ্ট সীমান্তরেখা নেই। যে রেখা নেই তাকে গায়ের জোরে টানতে গেলে দ্বন্দ্ব বাঁধে। 'উপনিষদ' পড়তে পড়তে অনেক সময় মনে হয়েছে যা পড়ছি তা কাব্য। প্লেটোর রচনা পড়ে বুঝতে পারিনি কেন আর্ট নয়। বাইবেলের যেখানে-সেখানে কবিতার কণা ছড়ানো। এসব উড়িয়ে দেবার যো নেই। অথচ একথা কখনো মানতে পারিনে যে ধর্মগ্রন্থের বাইরে দর্শনগ্রন্থের বাইরে আর্ট নেই বা থাকলেও নীচু দরের আর্ট। আসল কথা, কোথায় আর্ট শেষ হয়ে দর্শন আরম্ভ হয়েছে, কোথায় ধর্ম শেষ হয়ে আর্ট আরম্ভ হয়েছে তা কেউ জানে না, জানতে পারে না। কেউ কি বলতে পারে কোনখানে হেমন্তের সারা, শীতের শুরু? কোনখানে বসন্তের শুরু, শীতের সারা?

সীমানার গোলমাল চিরদিন থাকবে, জোর করে বেড়া দিলে বেড়া টিকবে না। তা বলে যদি কেউ মনে করেন যার নাম বিজ্ঞান তারই নাম ধর্ম, যার নাম ধর্ম তারই নাম দর্শন, যার নাম দর্শন তারই নাম ইতিহাস,

যার নাম ইতিহাস তারই নাম সমাজতত্ত্ব, যার নাম সমাজতত্ত্ব তারই নাম আর্ট, তবে সেই অদ্বৈতবাদীকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার জন্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে বলব। সীমানার বিবাদ হাজার বার সইব, কিন্তু এই হবুচন্দ্রের বিচার এক বারও না। কোনখানে ব্যবধান তা যদিও স্পষ্ট নয় তবু ব্যবধান তো সত্য। ব্যবধানের সত্যতা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হয়।

যা আর্ট তা আছে। যা আর্ট নয় তাও আছে। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ, তাও আছে। প্রভেদের অস্পষ্টতা, তাও আছে। সুতরাং তর্কের অবকাশ চিরকাল। তাতে আমার ক্ষোভ নেই। আমার লেখা যদি আর্ট হয়, আমার আর্ট যদি সত্য হয়, তবে সত্যের জোরে নিজের স্থান করে নেবে, তর্কের জোরে নয়, তত্ত্বের জোরে নয়। কিন্তু সম্প্রতি একটা ধারণা আর্টিস্টদের নিজেদেরই মাথা ঘুলিয়ে দিচ্ছে। তাঁরা ভাবছেন যে আপনাকে দেওয়াটা কোনো কাজের নয়, যে ছলে দেওয়া যায় সেটাও বাজে, দিতে হবে এমন কিছু যাতে সমাজের প্রত্যক্ষ প্রগতি হয়, তা দিলেই আর্ট হবে, না দিলে আর্ট হবে না। এই ধারণা যে একটা কুসংস্কার—একটা নতুন কুসংস্কার—এ জ্ঞান একদিন ফিরবে তাঁদের, যাঁদের ভিতরে কিছু আছে। অন্তরের মূল্যই আর্টের পরম মূল্য, বাইরের মূল্য তাকে মূল্য দিতে পারে না। আর্ট একটা ছল, একটা উপলক্ষ্য, একটা মাধ্যম। সমাজ-প্রগতির হেতু বা নিমিত্ত নয়। সেকাজ অন্য লেখার, অন্য ছবির, অন্য গানের।

লক্ষ্য এবং উপলক্ষ্য

আমার কিছু দেবার আছে। না দিয়ে আমার শান্তি নেই। যত দিন আমি না দিয়েছি তত দিন আমার অন্তর আকুল, আমার অন্তর উদ্বেল। হয়তো শুধু এই জিনিসটি দিয়ে যাবার জন্যেই আমি জন্মেছি, মরার আগে না দিয়ে যাই তো জীবন বৃথা। কে জানে হয়তো আবার জন্মাতে হবে কেবল এই অঞ্জলি অর্পণ করবার জন্যেই, এই ভার থেকে মুক্ত হবার জন্যেই। মুক্তির যেন আর কোনো অর্থ নেই, মুক্তি বলতে বুঝি এই দায় থেকে মুক্তি। এই বোঝা আমার নামবে যেদিন সেদিন আমার কী উল্লাস, কী সোয়াস্তি!

তারপর দেখা যাবে আমার দানের ভিতর দিয়ে আমি আপনাকে দিয়ে গেছি। একখানি উপন্যাসের কি একটি কবিতার ভিতর দিয়ে আমার পরিপূর্ণ পরিচয় জানিয়ে গেছি। দৃশ্যত ওখানি একখানি উপন্যাস বা ওটি একটি কবিতা। কিন্তু অদৃশ্যত আমার আপনা।

সেইজন্যেই বলেছি, আর্ট একটা ছল, একটা উপলক্ষ্য, একটা মাধ্যম। ওর আড়ালে রয়েছে আরও একটা ব্যাপার। দেওয়া আর পাওয়া। জানা আর জানানো। যে দিচ্ছে তার নাম লেখক বা গায়ক বা চিত্রকর—এক কথায় আর্টিস্ট। কিন্তু ওই নামের অন্তরালে রয়েছে আরও একজন, সেদাতা; সেজ্ঞাপক। লেখক নামে আমি সাধারণের পরিচিত। কিন্তু ওই কি আমার পরম পরিচয়? আমি যে ওর চেয়ে অনেক বড়ো, ওর চেয়ে অনেক উঁচু। আমি যে দাতা। আমি আত্মদা। লেখাটা আমার ছল, যে ছলে আমি আপনাকে দিই।

তেমনি যিনি পাচ্ছেন তাঁর নাম পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শক বা এক কথায় রসিক। যিনি রসের আস্বাদন করেন। যিনি উপভোক্তা। কিন্তু ওই নামের অন্তরালে আছেন আরও একজন, তিনি জ্ঞাতা; তিনি গ্রহীতা। পাঠক নামে আপনি লাইব্রেরি মহলে পরিচিত। কিন্তু ওই কি আপনার চূড়ান্ত পরিচয়? ওর চেয়ে যে আপনি অনেক বৃহৎ, অনেক মহৎ। আপনি যে গ্রহীতা। গ্রহণ করেন একজনের আত্মদান। বইখানা তো একটা উপলক্ষ্য, একটা মাধ্যম। আপনি যে জ্ঞাতা। জ্ঞাত হন একজনের অন্তর। আপনি যে অন্তরঙ্গ।

অন্তর জানাজানির ব্যাপারটা অলক্ষে। সেইটেই লক্ষ্য। বই লেখা ও বই পড়ার ব্যাপারটা সকলের নজরে। এটা উপলক্ষ্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের স্বভাব এই যে ওরা চাক্ষুষ যা দেখে তাই চরম প্রমাণ বলে ধরে নেয়। তলিয়ে দেখতে যায় না। সেইজন্যে উপলক্ষ্যকে মনে করে লক্ষ্য। লক্ষ্যের কোনো সন্ধান রাখে না। লেখা যদি লক্ষ্যভেদ না করে বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তা হলে ওরা টেরই পায় না, কেয়ারই করে না। বলা বাহুল্য এমন লোক শুধু পাঠকদের মধ্যে নয়, লেখকদের মধ্যেও আছেন। অনেক আর্টিস্ট অন্তর দিতে জানেন না, অন্তরঙ্গ চান না। তাঁদের সম্বন্ধ অন্তরঙ্গের সঙ্গে নয়, ক্রেতা বা স্তাবকের সঙ্গে। বই খুব বিক্রি হচ্ছে, ছবির খুব সুখ্যাতি হচ্ছে। গান শুনতে রাজা-মহারাজারা আমন্ত্রণ করছেন। ব্যাস, জন্ম সার্থক।

আর্ট একজনের অন্তরবাসীকে আরেক জনের অন্তরগোচর করে। একজনের সত্য পরিচয় আরেক জনের হৃদয়ে পৌঁছে দেয়। একজনের গোপনতম বাণী আরেক জনের মনের কানে বলে। একজনের সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা দিয়ে আরেক জনের উপভোগ্য বানায়। একজনের সঞ্চিত ঐশ্বর্য নিয়ে আরেক জনের উত্তরাধিকার গড়ে।

একজন, আরেক জন, এই দুজন না থাকলে আর্ট হয় না। অন্তত একজন কল্পিত পাঠক বা দর্শক থাকা চাই, যার জন্যে লেখক লিখবে বা নর্তক নাচবে। একলব্যের দ্রোণাচার্যের মতো একজন শ্রোতার প্রতিমা বা প্রতীক সামনে রেখে সারেগামার সাধনা করতে হয়। প্রত্যেক আর্টিস্টের নিজের ভিতরেই একজন রসিক বা রসাস্বাদক থাকেন, তাঁকেই সাক্ষী করে অনেক সময় কাজ করে যেতে হয়।

একজন, আরেক জন, এই দুজন না থাকলে আর্ট হয় না, বলেছি। একবার হয়ে গেলে পরে সর্বজন তাঁর অধিকারী। সর্বজনকে আরেক জন বললে যদি গণিতশাস্ত্রের অবমাননা হয় তাহলে আরেক পক্ষ বলতে পারি। আমি এক পক্ষ, আমার পাঠকরা অপর পক্ষ। আক্ষরিক অর্থে না হলেও অপর পক্ষ হচ্ছেন আরেক জন। তাঁরা বা তিনি আমার অন্তরঙ্গ। একযোগে না হলেও এক এক করে আমার অন্তরঙ্গ। যখন লিখি তখন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি আত্মনিবেদন করি। যে ছলে করি তার নাম উপন্যাস বা কবিতা বা আরও তুচ্ছ ছড়া। সেই আমার আর্ট।

আমি নিজেকে একজন বলে গণেছি। কিন্তু এমন যদি হত যে আমি ও আমার বন্ধুরা মিলে 'বন্দে মাতরম' গান রেকর্ডে দিয়েছি, গানের কোন অংশ কে গেয়েছে জানবার উপায় নেই, সবটাই সকলের গাওয়া, তাহলে আমরা ঠিক একজন হতুম না আক্ষরিক অর্থে। এক পক্ষ বললে গণিতশাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা হত। কিন্তু আর্টের বিচারে এক পক্ষও যা, একজনও তাই। তার মানে আমরা 'বন্দে মাতরম' গায়করা সাত-আট জন হয়েও একজন। কারণ অন্তর আমাদের একটিই। সুরও একটি। তালও একটি দৃশ্যত। আমরা বহু, কিন্তু অদৃশ্যত এক।

এই অর্থে তাজমহল একজনের সৃষ্টি। সেই একজনের নাম সকলের সুবিধার খাতিরে শাহজাহান। আসলে তাঁর নামই নেই।

যেমন নেই সাঁচি ভারহুৎ ইলোরা অজন্তার ভাস্করদের স্থপতিদের চিত্রীদের নাম। তাঁরা এক লক্ষ্যে এক উপলক্ষ্যে এক হয়েছেন। তাই তাঁরা একজন। অজন্তার বেলায় একজন, ইলোরার বেলায় একজন, তাজমহলের বেলা একজন, কোণার্কের বেলায় একজন। গণভাস্কর্য বা জনস্থাপত্য বলে যদি কিছু থাকে তবে তা একজনের সৃষ্টি। যে হিসাবে আমাদের সেই 'বন্দে মাতরম' গান। একজন মানে মাথা গুনতির একজন নয়। অন্তর গুনতির, সুর গুনতির, লক্ষ গুনতির একজন। মহাভারতেও বহুজনের হাত লেগেছে, রামায়ণেও বহুজনের হস্তক্ষেপ। সকলের নাম মনে রাখা যায় না বলে *ব্যাস বাল্মীকি*র নামই গ্রন্থকারের নাম।

একজনই হোক আর বহুজনই হোক, এক পক্ষ দাতা, অপর পক্ষ গ্রহীতা; এক পক্ষ জ্ঞাপক, অপর পক্ষ জ্ঞাতা। দুই পক্ষ নিয়ে যেমন পক্ষী, তেমনি আর্ট। কিংবা দুই পাড় নিয়ে যেমন নদী, তেমনি আর্ট। উপমা দুটি জুতসই হল না, কিন্তু ওর চেয়ে সুন্দর উপমা খুঁজে পাচ্ছি কোথায়! যুগল না হলে যেমন লীলা হয় না, দুই পক্ষ না হলে তেমনি আর্ট হয় না। দুই হাত না হলে যেমন তালি বাজে না, দুই পক্ষ না হলে তেমনি বাঁশি বাজে না, বীণা বাজে না, অর্কেস্ট্রা বাজে না। দুই-এর উপরে আমি এতটা জোর দিচ্ছি এইজন্যে যে লেখকের ও পাঠকের পরস্পরের সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে সাহিত্য হয় আঁধারে ঢিল ছোড়া। আমরা প্রতিদিন আঁধারে ঢিল ছুড়ছি ও খাচ্ছি। আমাদের অধিকাংশ রচনা প্রীতি পাচ্ছে না, ব্যর্থ হচ্ছে।

লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মন জানাজানি, বছরে চারখানা করে বই লেখাটাই লক্ষ্য নয়। ওটা যে সবসময় আর্ট তাও নয়। ওটা অধিকাংশ স্থলে আর্ট নয়, ইণ্ডাস্ট্রি। ওর মূলে রয়েছে আর্থিক তাড়না, আন্তরিক প্রেরণা নয়। আন্তরিক প্রেরণা যেখানে, সেখানে চেনাশোনাটাই লক্ষ্য, আর আর্ট তার উপলক্ষ্য। অর্থের প্রশ্ন ওঠে না, তবে সামাজিক অব্যবস্থার দরুন আর্টিস্টকে তা নিতে হয়, নতুবা প্রাণহানি।

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের যুগে সামাজিক অব্যবস্থার পেষণে আর্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে বাজারের পণ্য। যেমন চাল ডাল মশলা মাছ মাংস ডিম শাড়ি গয়না সিঁদুর; তেমনি নাটক উপন্যাস কাব্য নাচ গান ছবি। লেখকের সঙ্গে পাঠকের যথার্থ সম্বন্ধ কোনো পক্ষেরই মনে নেই, দু-পক্ষেরই ব্যবহার এ দেশের বরপক্ষের ও কন্যাপক্ষের ব্যবহারের মতো। রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' বলছে,

কেহ বা দেখে মুখ কেহ বা দেহ,
কেহ বা ভালো বলে, বলে না কেহ।
ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।

বলা বাহুল্য কন্যাপক্ষীয়রাও বরকে পরখ করে নেন সুযোগ পেলেই। কেউ কাউকে পরখ করতে ছাড়ে না, কারণ সম্বন্ধটা হচ্ছে ক্রেতা-বিক্রেতার।

আর্ট যেহেতু পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সেহেতু তার বিচার হচ্ছে পণ্য হিসাবে। যিনি দাম দিয়ে কিনে কৃতার্থ করবেন তিনি কেন গ্রহীতা হবেন, তিনি ক্রেতা! আর যে হতভাগ্য দাম না নিয়ে পারে না সেকোন মুখে বলবে সেদাতা! হাতেনাতে ধরা পড়ছে সেবিক্রেতা। স্বয়ং শেক্সপিয়ারের পক্ষেও প্রমাণ করা শক্ত যে তিনি বিশুদ্ধ দাতা। টলস্টয়ের প্রকাশক ও পত্নী তাঁকে দাতা হতে দিলেন না কিছুতেই, তাঁর শেষজীবনের দ্বন্দ্ব তো প্রধানত এই নিয়ে। এই দ্বন্দ্ব থেকে তাঁকে উদ্ধার করল তাঁর মৃত্যু। মৃত্যুর পরে তিনি আর বিক্রেতা নন, তিনি বিশুদ্ধ দাতা। কিন্তু আমরা যারা বেঁচে আছি ও থাকতে চাই, এই দ্বন্দ্ব থেকে পরিত্রাণের উত্তম কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিনে। ইচ্ছা করে কোনো এক আশ্রমের বা ট্রাস্টের নামে গ্রন্থের উপস্বত্ব লিখে দিতে, কিন্তু তাতে করে লেখকের সঙ্গে পাঠকের সম্বন্ধ শোধরায় না।

আর্টের মূল্য

আমি আমার আপনাকে দিচ্ছি। যার ভিতর দিয়ে দিচ্ছি, যে ছলে দিচ্ছি, যে উপলক্ষে দিচ্ছি তার নাম আর্ট। আর্টের মূল্য কী? আর্টের মূল্য কতক তার নিজের, কতক আমার।

যেমন একখানা চিঠির মূল্য। প্রিয়ার চিঠি প্রিয়ার মূল্যে মূল্যবান। কিন্তু যদি প্রিয়ার চিঠি না হয়ে অপ্রিয়ার চিঠি হত তা হলেও তার একটা মূল্য থাকত। চিঠি হিসাবে। সেটা তার নিজের মূল্য।

আর্টের মূল্য কতক তার নিজের। যেহেতু সেআর্ট কতক আর্টিস্টের। যেহেতু তিনি আপনাকে দিচ্ছেন। এ ছাড়া আরও এক মূল্য আছে। বিষয়ের। বিষয়বস্তুর। চিঠি এলে প্রথমেই মনে জাগে, কে লিখেছে? তারপরে কথা ওঠে, কী লিখেছে? প্রিয়জনের চিঠিতে যদি কিছু নাও থাকে তবু তা মূল্যবান, কিন্তু কিছু থাকলে আরও মূল্যবান। জানতে ইচ্ছা করে কেমন আছে, কী করছে, কবে দেখা হবে। তেমনি প্রিয় লেখকের নতুন বই দেখলে পড়ে দেখতে ইচ্ছা করে কী বিষয়ে লেখা, বিষয়ের দিক থেকে মূল্যবান কি না। সাধারণত আমরা ধরে নিই নিশ্চয়ই মূল্যবান। কিন্তু শেষ করবার পর নিরাশ হয়ে বলি, কই, কী এমন ভালো! কিংবা নিশ্চিন্ত হয়ে বলি, ভালোই হয়েছে। কিংবা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলি, আগেরখানার চেয়েও ভালো।

আর্টের মূল্য তাহলে তিন দফা। এক, তার নিজের। দুই, তার রচয়িতার। তিন, তার বিষয়ের। লাইব্রেরিতে যখন একরাশ বই হাতের কাছে পাই তখন আমরা একখানা টেনে নিই তার লেখকের নাম দেখে, যেমন রবীন্দ্রনাথের। একখানা পেড়ে নিই বিষয়ের আকর্ষণে, যেমন স্বপ্নের ফলাফল। এবং যদি সুরসিক হয়ে থাকি তো একখানা বইয়ের খোঁজ করি নিছক আর্টের খাতিরে। যেমন *বীরবলের হালখাতা*। সংস্কৃত সাহিত্যে এমন অনেক রচনা আছে যার আদি-অন্ত সুভাষিত। আমরা তাদের স্বাদ নিই লেখকের খাতিরে নয়, কারণ লেখক অনামা। বিষয়ের খাতিরে নয়, কারণ বিষয় মরচে-ধরা। আর্টের খাতিরে। অর্থাৎ কে বলেছে তার জন্যে নয়, কী বলেছে তার জন্যে নয়, কেমন করে বলেছে তারই জন্যে।

সোনায় সোহাগা হয় যদি 'কেমন করে বলেছে'র সঙ্গে 'কী বলেছে'র সঙ্গম হয়। তার সঙ্গে যদি 'কে বলেছে' যোগ দেয় তো ত্রিবেণীসঙ্গম। কিন্তু এরকম সার্থক রচনা জগতে খুব বেশি নেই। সেইজন্যে শেক্সপিয়রের এত দর। আমাদের দেশে কালিদাসের ও রবীন্দ্রনাথের। অবশ্য এঁদের সব রচনা সমান সার্থক বা সমান অমূল্য নয়। কিন্তু কোন কোন রচনা সার্থক বা অমূল্য তা বিচার করা সহজ হয় যদি মনে রাখি কেমন করে বলেছেন, কী বলেছেন, কে বলেছেন।

কে বলেছেন, এর মধ্যে একটু কথা আছে। মলাটের উপর যদি লেখা না থাকে তো লেখকের নাম উদ্ধার করা শক্ত। ছেলেবেলায় এমন অনেক বই আমার চোখে পড়েছে যেগুলির মলাট ছেঁড়া ও ভিতরের কয়েক পৃষ্ঠা নেই। প্রাচীন পুথির যেখানে ভণিতা আছে সেখানে নাম পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু যেখানে ভণিতার অভাব সেখানে লেখকের নাম অজ্ঞাত। ছবিতে স্বাক্ষর করার প্রথা সেকালে ছিল না, একালে সকলে মানেন না। মন্দির মসজিদের গায়ে রাজারাজড়ার নাম খোদাই থাকতে পারে, কারিগরের নাম থাকে না। ভাস্কর্যের কোনো কোনো স্থলে উৎকীর্ণ লিপি লক্ষিত হয়, কিন্তু ভাস্করের নাম নয়।

তা হলে কে বলেছেন বা এঁকেছেন বা গড়েছেন কেমন করে জানব? জানব মন দিয়ে পড়ে, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে, সত্তা দিয়ে অনুভব করে। নাম হয়তো জানব না। তাতে কিছু যায়-আসে না, কারণ নামটা একটা লেবেল ছাড়া আর কী? উঠে গেলেও যে যার জিনিস চিনে নিতে পারে। তেমনি অজন্তার গুহাচিত্র দেখে চিনতে পারি, যদি যত্ন করি, কে কোনখানা এঁকেছেন। নাম জানিনে, কিন্তু যেকোনো নাম কল্পনা করতে পারি। উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে না চাপালেই হল। নীচে স্বাক্ষর না থাকলেও যেকোনো অর্বাচীন দর্শক

যামিনী রায়ের ছবির সঙ্গে নন্দলাল বসুর ছবির তফাত ধরতে পারবে। নাম যদি না জানে তো কল্পনা করবে, এখানা পাঁচকড়িবাবুর ওখানা তিনকড়িবাবুর। আমার নাম ও বুদ্ধদেববাবুর নাম যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তা হলেও আমাদের লেখায় এমন কোনো গভীর পার্থক্য থাকবেই যার থেকে আন্দাজ হবে আমার নাম উদো, ওঁর নাম বুধো।

অত কথায় কাজ কী, শেক্সপিয়র যে বেকনের ছদ্মনাম, নাটকগুলি যে বেকনের কীর্তি, এখনও এ ধারণা খাস ইংল্যাণ্ড থেকে যায়নি। সুতরাং নিজ নামে লিখলেও নিস্তার নেই। বৌদ্ধরা হয়তো একদিন দাবি করবেন যে অন্নদাশঙ্কর হচ্ছে বুদ্ধদেবেরই অষ্টোত্তর শত নামের এক নাম। ভরসা এই যে বোদ্ধারা সে-দাবি নাকচ করবেন।

কিন্তু যে-কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই সেটা এই যে, আর্টের ভিতরেই আর্টিস্টের সত্যিকার পরিচয় অদৃশ্য থাকে, যার অন্তর্দৃষ্টি আছে সেআবিষ্কার করতে পারে। প্রিয়জন যদি টাইপরাইটারে চিঠি লেখেন ও নীচে নাম সই করতে ভুলে যান তাহলে কি আমরা ও-চিঠি আর কারও চিঠি বলে ভুল করি? সেক্ষেত্রে আমরা অভ্রান্ত। প্রত্যেকটি বাক্যের ও শব্দের যোজনায় প্রিয়জনের পরিচিত মুখ নতুন করে দেখতে পাই। তেমনি আর্টের বেলা। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা যদি অন্য কোনো নামে প্রচারিত হয় তা হলেও আমার চিনতে ভুল হবে না কে লিখেছেন। কবি তাঁর অদৃশ্য পরিচয় চিরকালের মতো রেখে গেছেন তাঁর প্রকাশিত অপ্রকাশিত যাবতীয় লেখায়। হয়তো তাঁর নামটা লোকে ভুলে যাবে, বা ভুল করবে। বলবে ভানুসিংহ বা নিবারণ চক্রবর্তী। কিন্তু তাঁর পরিচয় নিয়ে ভুল করতে পারে না। ভোলবার নয়।

আর্টকে মূল্যবান করে আর্টিস্টের প্রচ্ছন্ন পরিচয়। মহাশিল্পীরা সে-পরিচয় আরও প্রচ্ছন্ন করেন, তাঁদের কাছে তাঁদের নিজেদের দাম কানাকড়ি। তাঁরা যা দিতে চান তাকেই দাম দেন সবচেয়ে বেশি। কী দিচ্ছেন তারই উপর এতটা জোর দেন যে কেমন করে দিচ্ছেন তাও ভাবেন না। তাঁদের রচনায় আর্ট যদি থাকে তো অনিচ্ছাকৃত বা অযত্নসম্ভব। অথচ সে-আর্ট সজ্ঞান শিল্পীর অসাধ্য। যাঁরা দু-বেলা 'আর্ট' 'আর্ট' করেন তাঁরাই যে সেরা আর্টিস্ট তা নয়। সেরা আর্টিস্টদের মুখে কথা নেই, তাঁরা ইজম আওড়ান না, তাঁদের একাগ্র অভিনিবেশ বিষয়ের উপর। কিন্তু তাঁদের অজ্ঞাতসারে তাঁদের ভিতরে যে আর্টিস্ট থাকে সেআর্টের প্রতিও তীব্র দৃষ্টি রাখে। তাঁরা যেমন-তেমন করে লেখেন না, আঁকেন না, গড়েন না। কেমন করে লেখেন বা আঁকেন তা হয়তো তাঁদেরও অজ্ঞাত, কিন্তু আমরা যখন পড়ি বা দেখি তখন বুঝতে পারি সেটাও আছে এবং সেটাও দামি।

কেমন করে লিখব এটা অনেক সময় 'কী লিখব'র থেকে অভিন্ন। বিষয় অনুসারে লেখার ধরনধারণ বদলায়। প্রত্যেক বারেই ভেবে নিতে হয় কেমন করে লিখব, কেমন করে লিখলে ঠিক লেখাটি ওতরাবে, ঠিক সুরটি বাজবে, ঠিক ছবিটি ফুটবে, ঠিক অর্থটি হৃদয়ঙ্গম হবে। যাঁরা ওস্তাদ লিখিয়ে তাঁদের অত ভাবতে হয় না, তাঁদের অজ্ঞাতসারে আর একজন ভাবে, সেতাঁদের ভিতরকার আর্টিস্ট। তাঁরা তাঁদের সবটা মনোযোগ দেন বিষয়ের উপরে। 'কী লিখব'র উপরে। 'কেমন করে লিখব'র দিকে নজর আর একজনের। কিন্তু আমার ভিতরকার মানুষ যদি না ভাবে তো আমাকেই ভাবতে হয়। তাতে আমার বিষয়বিভোরতা ব্যাহত হয়। ধ্যানীর পক্ষে ধ্যানহানি প্রায় প্রাণহানির মতোই দুঃখকর। সেইজন্যে আমি আঙ্গিকের কথা একেবারেই মনে আনতে চাইনে। অথচ ওর প্রয়োজন মানি।

একটু বয়স হলে, হাত পাকলে, আত্মবিশ্বাস জন্মালে অন্যান্য সাধকের মতো শিল্পীরও স্মরণীয় শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। শর যেমন লক্ষ্যে মগ্ন সাধকও তেমনি বিষয়ে মগ্ন। বিষয় অবশ্য ধনসম্পদ নয়। বিষয় হচ্ছে যা দেবার। যা না দিয়ে আমার নিষ্কৃতি নেই, যা দিতে আমি এসেছি। কে কী দিতে এসেছে তা অপরের অজানা, হয়তো তার নিজেরই না-জানা। কিন্তু প্রত্যেক অভিনেতার যেমন নির্দিষ্ট পাঠ প্রত্যেক লেখকেরও তেমনি। জীবনদেবতার নির্দেশ। তিনিই প্রম্পট করেন। আমরা ইতস্তত পরীক্ষা করতে করতে যে যার বিষয় পেয়ে যাই। এ ক্ষেত্রে যার-তার ফরমাশ খাটে না। তবে পরের ফরমাশও অনেক সময় সোনার কাঠির কাজ

করে। তার পরশ লেগে আমাদের ঘুম ভাঙে, আমরা আত্মস্থ হই, আপনাকে চিনি, আপনার পাঠ বুঝে নিই। পরের ফরমাশ খাটতে গিয়ে ঘরের কাজ করি। যা দেবার তা প্রথমে জানি, তার পরে দিই।

তিন দফা মূল্যের কথা হল। এবার কাঞ্চনমূল্য। কাঞ্চনমূল্য আর্টের নয়, কারণ আর্ট হচ্ছে বিশুদ্ধ দান। কাঞ্চনমূল্য ছাপা কাগজের, কাঞ্চনমূল্য বহুজনের শ্রমের। আর্টিস্ট তার পাওনা হিসাবে যেটুকু পায় সেটুকু যেকোনো শ্রমিকের পাওনা। কারও কম, কারও বেশি।

মুখ্য আর গৌণ

আমার কিছু দেবার আছে, আমি তা দিয়ে যেতে চাই—এইভাবে আর্টের শুরু। আর্টের গোড়ার কথা অন্তরের পূর্ণতাবোধ ও পূর্ণতার অঞ্জলি শূন্য করার কামনা।

এ যেমন গোড়ার কথা তেমনি মাঝখানকার কথা হচ্ছে কেমন করে শূন্য করব সেই কৌশল জানা ও প্রয়োগ করা। কেমন করে দিতে হয় সেবিদ্যা আমি শিখেছি, সেলীলা আমি সেধেছি—এইভাবে আর্টের চলা।

তার পরের কথা দান। আমার যা দেবার ছিল আমি তা দিয়েছি, সেই সূত্রে আপনাকে দিয়েছি—এইভাবে আর্টের সারা। আর্ট যখন সারা হয় তখন দেখা যায় অঞ্জলি শূন্য করে একজন তার পূর্ণতার দান দিয়ে গেছে, সেই ছলে নিজেকেও দিয়ে গেছে। এই হচ্ছে শেষ কথা।

শুরু ও সারার মাঝখানে দীর্ঘ পথ। এ পথ যে কেবল দীর্ঘ তাই নয় দুর্গমও বটে। সুতরাং শুরু করার আগে দশ বার ভাবা উচিত এ পথে পা দেব কি দেব না। জগতে করবার মতো কাজ অনেক আছে, আর্টই একমাত্র করণীয় নয়। যদি কেউ সব জেনেশুনে এ পথে পা দেন তবে তাঁকে মনে রাখতে হবে এ পথের অন্য নাম কলাবিদ্যা বা লীলাসাধনা। এর কোনো শর্টকাট বা একলম্ফ নেই।

কিন্তু এই সামান্য কথাটা অনেকের মনে থাকে না। তাঁদের ধারণা যেমন-তেমন করে বাজালেই তার নাম বীণাবাদন, যেমন-তেমন করে গাইলেই তার নাম মার্গসংগীত, যেমন-তেমন করে লিখলেই তার নাম কথাসাহিত্য। না, আর্টের মধ্যে 'যেমন-তেমন করে'র স্থান নেই। এর আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত 'কেমন করে'র রাজত্ব।

কেমন করে লিখব বা গাইব বা আঁকব বা গড়ব এ চিন্তা যাঁর কাছে তুচ্ছ চিন্তা তাঁর উচ্চ চিন্তা নিয়ে তিনি দর্শন বিজ্ঞান ধর্মনীতি সমাজনীতি করুন, আর্ট তাঁকে দিয়ে হবে না। এ রাজ্যে উচ্চ চিন্তার মূল্য আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু যতক্ষণ-না সে-জিনিস আর্টে রূপান্তরিত হচ্ছে ততক্ষণ তাকে আর্ট বলার উপায় নেই। সে-জিনিস এক লম্ফে আর্ট হয়ে ওঠে না। মহাবীর মারুতি *রাম*নাম বুকে এঁকে এক লম্ফে সাগর পার হয়েছিলেন, কিন্তু *রামায়ণ* বা *রামচরিতমানস* যাঁরা লিখে গেছেন তাঁরা কেবল *রাম*নামের মহিমায় কালসাগর পার হননি। কেমন করে লিখতে হয় সে-বিদ্যা শিখেছেন ও তার সাহায্য নিয়ে কালসাগর পার হয়েছেন।

এর থেকে যদি কেউ সিদ্ধান্ত করেন যে আর্টের আসল কথাটা হল কলাবিদ্যা, কোনো মহান সত্য বা গভীর প্রেরণা থাকলেও চলে, না থাকলেও চলে, তবে তিনি ভুল করবেন। সেকালের অনেকে এ ভুল করেছিলেন, একালের অনেকে করছেন, ভাবীকালের অনেকেও করবেন। আমরা আর্টিস্টরা মায়া দিয়ে মনোহরণ করি, সেটা আমাদের স্বধর্ম। কিন্তু তাই বলে সত্যকে গৌণ ও মায়াকে মুখ্য করতে যাইনে, যদি যাই তো আমরা সত্যিকার আর্টিস্ট নই, আমরা মায়াবী। মায়া যাঁদের সম্মোহিত করেছে তাঁরা আর্ট সৃষ্টি করতে অক্ষম। তাঁরা নিজেরাও মজেন, অপরকেও মজান; শেষপর্যন্ত কোথাও পৌঁছোন না, পৌঁছে দেন না। শুরু থেকে সারা অবধি যে মাঝখানকার পথ সেই পথই তাঁদের বেঁধে রাখে, মুক্তি দেয় না। কী করে তাঁরা মুক্তপুরুষ হবেন! আর আর্টিস্টের অন্য নাম তো মুক্তপুরুষ। যে পুরুষ দানভার মুক্ত। যে কিছু হাতে রাখেনি, হাত খালি করে দিয়ে গেছে।

এই পথপাশবদ্ধদের কালোয়াত বলা যেতে পারে। কালোয়াতি সংগীত আমাদের কানেই পশে, কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে না। কালোয়াতি কবিতারও সেই স্বভাব। কালোয়াতি চিত্র, কালোয়াতি ভাস্কর্য, কালোয়াতি নৃত্য—যতরকম কালোয়াতি আর্ট আছে তাদের সকলেরই সেই প্রকৃতি। তারা মরমে পশে না। আর্টের যেখানে সারা তাদের সেখানে প্রবেশ নেই, ততদূর তারা পৌঁছোয় না, মধ্যপথেই বাঁধা পড়ে। বিশুদ্ধ

কালোয়াতিরও একপ্রকার রস আছে, সেটা কলাবিদ্যার নিজস্ব রস। কলারসিকরা সেরসের সমঝদার। তাঁরা একখানি বিশুদ্ধ আলাপ শুনলে ধন্য হয়ে যান, তাঁকেই বলেন পিওর আর্ট। এই যদি হয় পিওর আর্ট তো শুধু অল্পসংখ্যক গন্ধর্বের জন্যে। এঁরা মানুষ হলে এঁদের হৃদয় থাকত এবং হৃদয়ের সমঝদারি অত সহজে মিটত না, হৃদয় চাইত হৃদয়ের নিবেদন। সত্যকারের সমঝদার হচ্ছেন হৃদয়রসিক, সেইসঙ্গে কলারসিক। আর মায়ামুগ্ধ সমঝদার হচ্ছেন বিশুদ্ধ কলারসিক। পিওর আর্ট বলতে যদি বোঝায় হৃদয়-বিরহিত কালোয়াতি তবে তাকে আমি উঁচুদরের আর্ট বলতে কুণ্ঠিত। জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* আমাকে মুগ্ধ করে, অবাক করে, কিন্তু আমার হৃদয়ে পৌঁছোয় না। শ্রুতিসুখে আচ্ছন্ন করে, কিন্তু মর্ম স্পর্শ করে মর্মান্তিক সুখী করে না। সেইজন্যে মনে হয় জয়দেবও পথপাশবদ্ধ মায়াবী পুরুষ, মুক্তপুরুষ নন। চণ্ডীদাস তাঁর বিপরীত।

আর্টের মধ্যে একটা মুক্তি আছে। যাতে তা নেই তা আর্ট হতে হতেও হল না, কোনো এক জায়গায় ঠেকে গেল। হয়তো কলাবিদ্যার একান্ত অভাব, নয়তো কলাবিদ্যার একান্ত আতিশয্য। কিংবা এমনও হতে পারে যে গোড়াতেই গলদ। দান করবার মতো অন্তঃসার নেই। পূর্ণতাবোধ নেই। দান করার কামনা নেই। কামনার বেদনা নেই। যা আছে তা অন্য জাতের কামনা, যেমন ধনকামনা যশকামনা শক্তিকামনা। শুরুতেই যদি ছাই থাকে তো সারাতেও তাই থাকে। মাঝখানে থাকে ভস্মে ঘি ঢালা। কলাবিদ্যার অপচয়।

তবে অনেক সময় ছাইঢাকা আগুনও থাকে। ঘি ঢালতে ঢালতে জ্বলে ওঠে। ঘৃতের কিছু অপব্যয় হয়, কিন্তু একেবারে অপচয় নয়। সেইজন্যে কোনো কবিযশঃপ্রার্থীকে উপহাস করতে নেই। উৎসাহ দিয়ে বলা উচিত, 'লিখুন, লিখতে থাকুন, লিখতে লিখতেই হবে।' এটা স্তোকবাক্য নয়। লিখতে লিখতে কত লেখক নিজেকে পেয়ে গেছেন। পেয়ে গেছেন নিজের বাণী, নিজের ধ্যান, নিজের যা শ্রেষ্ঠ, নিজের যা সত্য। কিন্তু লিখতে লিখতে মানে যেমন-তেমন করে লিখতে লিখতে নয়। কেমন করে লিখতে হয় তার প্রতি দৃষ্টি রেখে লিখতে লিখতে। কলাবিদ্যার অনুশীলন করতে করতে। গাইতে গাইতে কেউ গুণী হয় না, কেমন করে গাইতে হয় তার প্রতি লক্ষ রেখে গাইতে গাইতে গুণী হয়; যদি তার ভিতরে গুণ থাকে, আগুন থাকে।

'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী—' রবীন্দ্রনাথের এই লাইনটিতে ঝোঁক পড়েছে 'কেমন করে'র উপর। গানের উপর নয়। এই 'কেমন করে' আছে বলেই গুণ আছে। চর্চা করতে করতে গুণ ফুটে ওঠে, আগুন জ্বলে ওঠে। সুরের আগুন তো বটেই, হৃদয়মনের আগুন। বৈষ্ণবকবিরা যাকে বলেন, 'হিয়া দগদগি অন্তরদাহনি'। তারপরে আর ভস্মে ঘি ঢালা নয়, আগুনে ঘি ঢালা।

আর্টের ইতিহাসে সবরকম পথিক দেখা যায়। কেউ পথকেই সর্বস্ব করে কালোয়াত হলেন, কেউ পথসংক্ষেপ করতে গিয়ে বেরসিক। সেই যিনি বলেছিলেন, 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে', তাঁর যে কিছু বলবার ছিল না তা নয়। তবু তিনি হলেন চিরকাল হাস্যাস্পদ, অথচ সেই কথা আরেক জনের মুখে রূপ নিল 'নীরসঃ তরুবরঃ পুরুতঃ ভাতি' আর তিনি হলেন কবির কবি। সেই থেকে একটা সূত্র রচিত হল বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। অন্যান্য সূত্রের মতো এটিও মনে রাখার সুবিধার জন্যে। এর মধ্যে কাব্যের সব কথা নেই। রস যার আত্মা এমন যে বাক্য সেই হচ্ছে কাব্য। কিন্তু কোন রস? কথার পর কথা সাজিয়ে গেলেও তাঁরও তো একটা রস আছে। 'না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো' এটা শুধু নায়িকার অত্যুক্তি নয়। শব্দের মধ্যে, ধ্বনির মধ্যে, উপমার মধ্যে, অলংকারের মধ্যে স্বকীয় একটা রস আছে। সেটা বিষয় নিরপেক্ষ। প্রেরণা নিরপেক্ষ। কালোয়াতেরা এ রসের সন্ধান রাখেন। কিন্তু শুধুমাত্র এই রসই কাব্যের মূলতত্ত্ব নয়। কবির হৃদয় থেকে উৎসারিত হৃদয়রসই সেই রস যাকে বলা যেতে পারে কাব্যের আত্মা। সেই রসে রসাত্মক না হলে বাক্য কখনো কাব্য হতে পারে না, কলা কখনো আর্ট হতে পারে না।

রস আর আলো

উদ্ভিদ রস বিনা বাঁচে না, আলো বিনা বাড়ে না। আলো আর রস তার নিত্য আবশ্যক। জ্ঞানকে যদি বলি আলো আর আনন্দকে রস তাহলে আলো আর রস মানুষেরও নিত্য আবশ্যক।

মানুষের মন যেন আকাশের দিকে উন্মুখ হয়ে আছে, আলোর জন্যে, জ্ঞানের জন্যে। আকাশেরও সীমা নেই, আলোরও অবধি নেই। আবিষ্কারের পর আবিষ্কার মানুষের জ্ঞানের পিপাসা তৃপ্ত করছেও বটে, বৃদ্ধি করছেও বটে। এমনি করে মানুষ মনের দিক থেকে বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে পশু থেকে মানুষ হয়েছে, মানুষ থেকে সভ্য শিক্ষিত মানুষ।

তেমনি মানুষের হৃদয় যেন ধরিত্রীর বুকে মুখ রেখে স্তন্য অন্বেষণ করছে, রস অন্বেষণ করছে। অন্বেষণ করছে আনন্দ, কখনো-বা তার নাম বেদনা। পার্থিব জীবন তাকে নিত্য অভিষিক্ত করছে নানা বিচিত্র রসে। তৃপ্ত করছে তার তৃষা, অতৃপ্ত রাখছেও। অনুভূতির গাঢ়তা, গভীরতা ও বিচিত্রতা তাকে সহৃদয় করে, নতুবা সেহৃদয়হীন হয়, অসাড় হয়। পাষাণ হয়ে যায়। মানব রূপধারী জীবন্ত পাষাণকে মানুষ বলিনে। জড়পদার্থ বলি। হৃদয়ের দিক থেকে নীরস যারা তারা সভ্য শিক্ষিত হলেও অমানুষ। তাদের চেয়ে অসভ্য অশিক্ষিত ভালো, যদি সহৃদয় হয়, স-রস হয়। ধরিত্রীর স্নেহের দুলাল এরা। এরাই জানে বাঁচতে।

মানুষের রসের পিপাসা অনাদি কালের। প্রকৃতির কাছে পৃথিবীর কাছে পার্থিব জীবনের কাছে মানুষ যে রস পায় তাতেও সেতুষ্ট নয়। তাকে তুষ্ট করার ভার নিয়েছে কবি সংগীতকার ভাস্কর চিত্রকর নর্তকী ও নট। এরা দিচ্ছে এদের হৃদয়ের রস, দিচ্ছে কাব্য সংগীত ভাস্কর্যরূপে, নৃত্য নাটক চিত্ররূপে। আরও অনেক রূপ আছে। সব রূপই হৃদয়রসের রূপ। সব রূপই মানবহৃদয়ের সৃষ্টি। অনুভূতির তুলি দিয়ে আঁকা, অনুভূতির লেখনী দিয়ে লেখা। একের অনুভূতি এমনি করে অপরের হয়। কবির অনুভূতি পাঠকের, গায়কের অনুভূতি শ্রোতার, ভাস্করের অনুভূতি দর্শকের। জীবনের কাছে সরাসরি যা পায় পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শক তাই যথেষ্ট মনে করে না, আরও চাই আর্টের মাধ্যমে। আর্ট তাকে এনে দেয় এমন একটা রস যেটা তার অনাস্বাদিত। অথবা এমন একটা রস যেটা আস্বাদিত হলেও আবার আস্বাদন করতে সাধ যায়। পরের অনুভূতির সঙ্গে নিজের অনুভূতি মিলে গেলেও আনন্দ, না মিললেও আনন্দ। তারপর যে অনুভূতি নিজে প্রকাশ করতে পারছিনে অপরে তা প্রকাশ করলেও আনন্দ।

আর্ট হল রসের যমুনা। আর বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস অর্থনীতি হল আলোর আকাশগঙ্গা। আলোর জন্যে আমরা আকাশগঙ্গার পথে ঘুরি। রসের জন্যে ফিরি যমুনাপুলিনে। রসের জন্যে বললে ঠিক বলা হয় না। বলতে হয় রূপঘন রসের জন্যে। বা রসঘন রূপের জন্যে। যে রসের রূপ নির্দিষ্ট হয়নি তা আর্ট হয়ে ওঠেনি। তার জন্যে যমুনার কূলে না ফিরে সোজাসুজি সাগরজলে ঝাঁপ দেওয়া ভালো। জীবনের সাগরজলে।

আর্ট হচ্ছে রসাত্মক রূপ বা রূপাত্মক রস। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। যেখানে রূপ নেই সেখানে আর্ট নেই। যেখানে রস নেই সেখানে তো নেই-ই। কূল আর জল দুই নিয়েই নদী। রূপ আর রস দুই নিয়েই আর্ট। দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতির এমন কোনো বন্ধন বা বাঁধ নেই, আলোকে ধরে রাখতে পারে এমন কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই। দর্শন বিজ্ঞানের ভাষা রূপহীন, অলংকারহীন। পক্ষান্তরে সাহিত্যের ভাষা রূপবান, সালংকার। ভাষা যেক্ষেত্রে রূপহীন ভাবও সেক্ষেত্রে রূপহীন, কারণ ভাব ও ভাষা অভিন্ন। দর্শন আমাদের আলোর দর্শন দেয়, বিজ্ঞান দেয় আলোর স্পর্শন। কিন্তু কোথাও তাকে ধরে রাখতে বেঁধে রাখতে গেলে দেখি সেধরাছোঁয়ার বাইরে। তাকে একটা চিহ্ন দিয়ে প্রতীক দিয়ে সাংকেতিক ভাষায় বোঝাতে হয়।

সেক্ষেত্রে রূপসৃষ্টির চেষ্টা করা বৃথা। করলে সেটা সায়েন্স না হয়ে পপুলার সায়েন্স হবে। সূর্যের আলো নয়, চাঁদের আলো।

আলোর ধর্ম এই, সেবাক্যে ধরা দেয় না। বাক্য তাকে প্রকাশ করতে পারে না। যদি-বা কোনোমতে প্রকাশ করে তো আভাসে ইঙ্গিতে সংকেতে। সেইজন্যে আলো নিয়ে আর্ট হয় না। যদি হয় তবে তা সূর্যের আলো নয়, চাঁদের আলো। ইন্টেলেকচুয়াল উপন্যাস লিখতে গিয়ে দেখেছি সূর্যের আলোকে আকার দেওয়া যায় না। বড়োজোর মেঘের আড়াল দেওয়া যায়, আড়াল থেকে তাকে বিচিত্র দেখায়, আড়ালটাও বিচিত্র রূপ নেয়। তাতে মনের ক্ষুধা মেটে না। মন চায় মুক্ত আকাশ যার কোথাও কোনো ঝাপসা বা মেঘলা নেই, গোধূলি বা রাত্রি নেই। যার সবটাই আলো। নগ্ন আলো। আর্ট কি কখনো মেটাতে পারে এ ক্ষুধা? আর্ট বড়োজোর মানুষের আড়াল দিয়ে মানুষের উপর আলোর ক্রিয়া কেমনতরো তারই একটা বিবরণ বা বর্ণনা দিতে পারে। সেটার বিচিত্রতাই আর্টের আলোকসাধনার সীমা। তরুর আলোকসাধনা যেমন পত্রের শ্যামলতায় পর্যবসিত।

তা বলে তরু তার আলোকসাধনায় নিবৃত্ত হতে পারে না। আর্টকেও করতে হয় আলোর সাধনা আপন শক্তির সীমা কতটুকু তা জেনে ও মেনে। এমন কোনো মহাকাব্য নেই যাতে কেবল রসই আছে, আলো নেই। হৃদয়ের ভোজ্যই আছে, মনের ভোজ্য নেই। কাব্য প্রধানত রসাত্মক বটে, কিন্তু উপরন্তু জ্যোতির্ময় না হলে মহাকাব্য হতে পারে না। তমসো মা জ্যোতির্গময় মানবমনের এ আকিঞ্চন কি কেবল দার্শনিকের, বৈজ্ঞানিকের? এ কি শিল্পীরও নয়? রসিকেরও নয়? আর্টের যমুনার সঙ্গে বিজ্ঞান দর্শনের জাহ্নবী যদি যুক্ত হয় তো সেই যুক্তবেণী আর্টের মহিমা ক্ষুণ্ণ করে না, বৃদ্ধি করে বরং। যদি-না রূপ তার দ্বারা মগ্ন হয়, বাঁধ তার দ্বারা ভগ্ন হয়। আর্টের আত্মার সঙ্গে দর্শন বিজ্ঞানের আত্মা মিলিত হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু তনু যেন আর্টের থাকে; নইলে ক্ষতি। মহাকাব্য যদি অঙ্গহীন বা রূপহীন হয় তবে তা মহা অকাব্য। তখন তার কোনোখানে স্থান নেই। না দর্শন বিজ্ঞানের রাজ্যে। না আর্টের রাজ্যে। প্রথমে তাকে কাব্য হতে হবে, তারপরে সেমহান হতেও পারে না-হতেও পারে। কিন্তু মহান হতে গিয়ে কাব্য যদি না হয় তো মহত্ত্ব তাকে রক্ষা করবে না। কাব্যকে রক্ষা করে রস। মহান করে আলো। শিকড় আর পাতা এ দুয়ের মধ্যে শিকড়টাই আসল। কিন্তু পাতাটাও দামি। এ ভিন্ন আরও একটা জিনিস আছে, সেটা আকৃতি। তাইতেই চিনিয়ে দেয় যে এটা গাছ না আগাছা না পরগাছা না পানা। সেটা আগাগোড়া দরকারি।

রস যাকে বলা হচ্ছে সেও সত্য। আলো যাকে বলা হচ্ছে সেও। এক সত্য মনের গোচর। আরেক সত্য হৃদয়ের। উভয়ের মধ্যে বিরোধ বা বিচ্ছেদ নেই, কারণ হৃদয় যার আছে মনও আছে তার। একসঙ্গেই আছে। সত্য কথা বলতে কী, সত্য এক ও অবিভাজ্য। কিন্তু পূর্ণসত্য কেবলমাত্র মনের বা কেবলমাত্র হৃদয়ের ধারণাতীত। কিছু আমরা হৃদয় দিয়ে পাই, কিছু পাই মন দিয়ে। কিছু ইন্দ্রিয় দিয়ে, কিছু আত্মা দিয়ে। সমগ্রকে পাই সমগ্র সত্তা দিয়ে। আর্ট কিংবা বিজ্ঞান সমগ্রের বার্তা বহন করে না, করতে পারে না। তাদের কারও কাছে সমগ্র সত্য প্রত্যাশা করা যায় না। যার যত দূর দৌড় সেতত দূরের বার্তা বয়ে আনে, সেই পর্যন্ত তার স্বরাজ্য বা স্বধর্ম। তার ওপারে পররাজ্য বা পরধর্ম। হৃদয়গ্রাহ্য সত্য নিয়েই আর্টের দৌড়ঝাঁপ। মানসগ্রাহ্য সত্য নিয়ে দর্শন বিজ্ঞানের বিরোধের অবসর নেই। বিচ্ছেদেরও না। রস আর আলো পরস্পরবিরোধী বা পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের হৃদয় ও মন তাদের একাধারে বিধৃত করতে যত্নবান। সেইজন্যে আর্টের রাজ্যে রস যদিও রাজা আলো তার মন্ত্রী। দর্শন বিজ্ঞানের রাজ্যে আলো যদিও রাজা রস একেবারে অজানা নয়। দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদেরও হৃদয় আছে, অনুভূতি আছে। তাঁদের সত্যান্বেষণ যদি আনন্দরঞ্জিত বা বেদনালাঞ্ছিত হয় তাঁদের সিদ্ধান্ত বা আবিষ্কার কি তার প্রভাব এড়াতে পারে?

তা ছাড়া কল্পনা যাকে বলি সেরস ও আলো উভয়ের রাজ্যে আনাগোনা করে। কবিদের মতো বিজ্ঞানীরাও কল্পনাপ্রবণ। কল্পনার সাহায্য না নিলে বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক বেশি দূর অগ্রসর হতে পারতেন কি না সন্দেহ। বড়ো বড়ো কবিদের আকাশচারী কল্পনা তাঁদের অনেক দূর অগ্রসর করে দেয়। এমনি করে আর্ট আর জ্ঞান-

বিজ্ঞান উভয়েরই অগ্রগতি ঘটে। তারপর কল্পনার দ্বারা আর একটি কাজ হয়। আলো পরিণত হয় রসে। মানসগ্রাহ্য সত্য হৃদয়গ্রাহ্য সত্যে রূপান্তরিত হয়। আমি বিজ্ঞানী নই, তাই জোর করে বলতে পারছিনে, হয়তো রস পরিণত হয় আলোয়। হয়তো হৃদয়গ্রাহ্য সত্য মানসগ্রাহ্য সত্যে রূপান্তরিত হয়।

এটা সত্য, ওটা কল্পনা, প্রায়ই আমরা বলে থাকি। যেন সত্যের অভাবটাই কল্পনা। কিংবা কল্পনার অভাবটাই সত্য। কিন্তু কল্পনার পক্ষীরাজ না হলে সত্যের অন্বেষণ সুদূরপরাহত। তা সেহৃদয়ের সত্যই হোক আর মনের সত্যই হোক। রস আর আলো উভয়ের মাঝখানে যোজকের কাজ করে কল্পনা। শুধু যোজক নয়, যাদুকরও বটে। রূপান্তর ঘটায়। যেসব ব্যাপার নিতান্তই মানসিক বা মনস্তত্ত্বের এলাকাভুক্ত, নিপুণ সাহিত্যিকের হাতে কল্পনার ভোজবাজিতে সেসব ব্যাপার হৃদয়ের ভোজ্যরূপে পরিবেশিত হয়, অনুভূতির অধিকারে আসে। রসের প্রজা হয় আলো। তখন তাকে আলো বলে চেনা যায় না। সেও রস। সত্যকে আমরা অবিভাজ্য রূপে পাই, যদি কল্পনার আশ্রয় নিই। কল্পনা সত্যের অভাব নয়। সত্যের একত্ববিধায়ক।

তারপরে শিল্পী যখন রসকে রূপদান করে তখনও কল্পনার সহায়তা নিতে হয়। রস থেকে রূপে পৌঁছোতে হলে কল্পনাকে করতে হয় পথপ্রদর্শিকা তারা।

রস আর রূপ

প্রথমে আসে রসের উপলব্ধি, তারপরে রূপের উপলব্ধি। আমি যখন একটি কবিতা বা গল্প লিখে শেষ করি তখন কবিতাটির বা গল্পটির রূপ দর্শন করি। তার আগে ঘটে গেছে রসোপলব্ধি। রসোপলব্ধি যদি আপনাতে আপনি পরিসমাপ্ত হত তাহলে কবিতা বা গল্প লেখা হত না, রূপোপলব্ধি হত না। রূপোপলব্ধি না হলে আমি রসিক হতুম, কিন্তু রূপকার হতুম না। আমি যে রসিক তার প্রমাণ আমার রসোপলব্ধি। আমি যে রূপকার তার প্রমাণ আমার রূপোপলব্ধি। শিল্পীমাত্রেই একাধারে রসিক ও রূপকার।

বললুম বটে কবিতাটির রূপ, গল্পটির রূপ। বলতে পারতুম রসের রূপ। রস যখন একের অন্তর থেকে অপরের অন্তরে যায় তখন রূপ ধরে যায়। কবিতারূপ, কাহিনিরূপ, চিত্ররূপ, নৃত্যরূপ, এমনি কতরকম রূপ। আমি যখন রসদান করি তখন রূপদান করি। নইলে দান করা অসম্ভব হত। রস দিতে হলে রূপ দিতে হয়। রূপ না দিলে রস দেওয়া হয় না। অন্তরের রস অন্তরেই আবদ্ধ থাকে। মুক্তি পায় না। শিল্পীর মুক্তি নির্ভর করে রসের মুক্তির উপর। আর রসের মুক্তি নির্ভর করে রূপের সৃষ্টির উপর। সৃষ্টি মানেই রূপসৃষ্টি।

রূপসৃষ্টি থেকে মনে হতে পারে রূপ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। কিন্তু তা নয়। রূপ হচ্ছে রসের পরিসমাপ্তি। যেখানে রস নেই সেখানে রূপ নেই, যদি থাকে তবে তা প্রাণহীন রূপ। যেমন মূলহীন ফুল। যারা বিশুদ্ধ রূপের পূজারি তারা স্রষ্টা নয়, কারণ সৃষ্টির শেষ কথা যদিও রূপ, সার কথা হচ্ছে রস। পক্ষান্তরে যারা বিশুদ্ধ রসের উপাসক তারাও স্রষ্টা নয়, কারণ সৃষ্টি যেমন মূলহীন ফুল নয় তেমনি ফুলহীন মূল নয়। সাকার ও নিরাকার, রূপ ও রস উভয়বিধ সাধনাই শিল্পীর সাধনা। শিল্পীর অন্য নাম স্রষ্টা।

রস জিনিসটার সংজ্ঞা দেওয়া শক্ত। কেননা রস একটা জিনিসই নয়। যারা বস্তুবাদী রস তাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সুতরাং রসের সাধনা যে তারা স্বীকার করবে এ কখনো আশা করা যায় না। যারা বস্তুবাদী নয় অথচ পদে পদে ইন্টেলেকটের হাত ধরে চলে তারা বিশ্লেষণধর্মী। বিশ্লেষণ করে কেউ কোনোদিন রসের আস্বাদন পায়নি। একটা অখন্ড অনুভূতিকে খন্ড খন্ড করলে তার অখন্ডত্ব হারিয়ে যায়। প্রাণ যদি চলে যায় তো দেহ ভাগ করে কী হবে! ওটা ভোগের উপায় হয়।

রসের সংজ্ঞা জানিনে। শুধু এই জানি যে রস একটা অখন্ড উপভোগ, একটা পরম উপভোগ, অনেকের জীবনে একটা দুর্লভ উপভোগ। সেইজন্যে রসের এত মূল্য। যার মূল্য যত বেশি তার নকল তত বেশি, বিকার তত বেশি। রসাভাব ও রসবিকার দিয়ে কত লোক তাদের রসপিপাসা মেটায়। যেমন ঘোল দিয়ে মেটায় দুধের সাধ। রস এত দুর্লভ বলে রসের সাধকও দুর্লভ। রসের সাধনা হচ্ছে দুর্লভের সাধনা। রসের উপভোগ যাদের জীবনে ঘটেছে তারা অপরকে চায় সেই উপভোগের ভাগ দিতে। ভাগ দিতে গিয়ে দেখে নিজেদের ভাগ তাতে কমে না, বরং বাড়ে। কারণ রস দিতে গেলেই রূপ দিতে হয়। আর রূপদান হচ্ছে রূপভোগ। এটাও একটা উপভোগ। রসের উপভোগ বহুধাবিভক্ত হলে তার সঙ্গে যুক্ত হয় রূপের উপভোগ। কিন্তু এর জন্যেও সাধনা করতে হয়। রসের সাধনার উপর রূপের সাধনা।

রূপের সাধনাও দুর্লভের সাধনা। সকলে তার মূল্য দিতে পারে না বলে তার বিকৃতি অথবা অনুকৃতি এত বেশি। একটি রূপবান কবিতা বা গল্প লিখতে পারা বহু ভাগ্যে ঘটে। কবি কিটস ছিলেন ভাগ্যবান পুরুষ। অকালমরণে তাঁর তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। হত না রবীন্দ্রনাথেরও। রসভোগ ও রূপভোগ দ্বিবিধ উপভোগ এঁদের জীবনে ঘটেছিল অদীর্ঘ সাধনায়। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য তাঁকে শেষবয়সেও পরিত্যাগ করেনি, কারণ দ্বিবিধ সাধনাকে তিনি শেষবয়সেও পরিত্যাগ করেননি। এ সাধনা কালসাপেক্ষ নয়, কিন্তু নিষ্ঠাসাপেক্ষ। নিষ্ঠা

যেখানে দুর্বল সিদ্ধি সেখানে সুদূর। সেইজন্যে সারাজীবনেও কেউ কেউ রস থেকে রূপে, রসলোক থেকে রূপলোকে উপনীত হয় না।

আগে রসলোক, তার পরে রূপলোক। এই অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞানটাও কারো কারো থাকে না। তারা চায় রসলোকের পাশ কাটিয়ে রূপলোকে পৌঁছোতে। আকাশে উড়ে নদী পার হতে। কিন্তু জলে না নেমে হাবুডুবু না খেয়ে পাড়ে যারা যায় তারা একটা পরম উপভোগ হারায়। রসের উপভোগ যাদের হয়নি তারা কীসের ভাগ দিতে যাবে, কেনই-বা যাবে! কে তাদের ডাকছে! দান করবার মতো রস যার হাতে নেই দান করবার মতো রূপও কি তার হাতে আছে? নিষ্ফল রূপচর্চার নাম রূপভোগ নয়। রসহীন কবিতা বা গল্প রূপবান হতে পারে না। হয়তো তাকে রূপবানের মতো দেখায়। সেটা দৃষ্টিবিভ্রম।

রসের জন্যে সাধারণ মানুষের চিত্তে শাশ্বত পিপাসা। তাই এত নৃত্যগীত অভিনয় চিত্র ভাস্কর্য গাথা গল্প। এ পিপাসা কি নিছক রূপ দিয়ে মিটতে পারে! যে রূপ রসের রূপ তার জন্যেও পিপাসা জাগে। সেপিপাসাও শাশ্বত। কিন্তু রসবিরহিত রূপের জন্যে তো পিপাসা নেই। যে রূপ আত্মসর্বস্ব তার যদি কোনো আদর থাকে তো সেটা পিপাসাতৃপ্তির পরে। সেটা হল সাজসজ্জার সামগ্রী। প্রসাধনের অঙ্গ। অলংকার। নিশ্চয় তার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। কিন্তু পিপাসুর কাছে নয়, পিপাসামুক্তের কাছে। যে দেশে রসসমন্বিত রূপের অভাব নেই সেদেশে রসবিরহিত রূপের আদর স্বাভাবিক। কিন্তু যে দেশে রস বিরহিত রূপ ভিন্ন আর রূপ নেই সেদেশে তার আদর যেন অনাবৃষ্টির দেশে গোলাপজলের আদর।

অন্ন মানুষের চাই-ই চাই, অন্নের দুর্ভিক্ষ যে কেমন তা আমরা পঞ্চাশের মন্বন্তরে প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু মানুষের তো কেবল অন্নের ক্ষুধা নয়, অমৃতের তৃষ্ণাও আছে। অমৃতের তৃষ্ণা আছে বলেই *কোরান বাইবেল উপনিষদ* আছে ও থাকবে। এসব যদি যায় তো এসবের স্থান নেবে এই জাতীয় আর কোনো উৎস, জল যার অফুরন্ত। অমৃতের তৃষ্ণা অমৃতেই মিটবে, অন্নে মিটবে না। ভোগোপকরণ হয়তো একদিন সব মানুষের সমান প্রচুর হবে, এবং সেদিন হয়তো অদূরে। কিন্তু অমৃতের পিয়াস তো অমৃত বিনা তৃপ্ত হবে না। ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।

অমৃতের পিয়াস যাকে বললুম রসের পিপাসা ঠিক সেই জাতীয় না হলেও তারই সঙ্গে তুলনীয়। *মেঘদূত* ঠিক উপনিষদ বর্গীয় নয়, হ্যামলেট বা টেমপ্লেট নয় *বাইবেল* বর্গীয়। কিন্তু তার সঙ্গে তুলনার যোগ্য এইজন্যে যে মেঘদূত বা হ্যামলেটের রস বহুকাল ধরে বহু মানবের চিত্ত সরস করেছে ও করবে। সাহিত্য বা সংগীত একটা বিলাস বা মন্ডন নয়। তাকে বাদ দিলে মানুষের একটা পরম উপভোগ বাদ পড়ে। তার থেকে বঞ্চিত হলে মানুষ কী নিয়ে তৃপ্ত হবে! তার স্থান পূরণ করতে পারে কী এমন আছে! ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।

রস আমাদের চাই-ই চাই এবং অন্য কিছুতেই রসের তৃষ্ণা মিটবে না, সুতরাং রসই দিতে হবে মানুষকে, যদি অন্তরে রসের উপলব্ধি ঘটে থাকে। এটা একটা কর্তব্য। ধর্মও বটে। রসের উপলব্ধি যাতে অবারিত হয় তার জন্যে রসের সাধনা আমাদের নিত্যকৃত্য। কেবল রসের সাধনাই যথেষ্ট নয়। রূপের সাধনাও আবশ্যিক। কিন্তু রস বিরহিত রূপের সাধনা নয়। রসের উপলব্ধি দূরে থাক, রূপের উপলব্ধিও নেই তাতে। কারণ রূপ তো রস থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। যাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব তার নাম রূপ নয়, আবরণ না আভরণ। তারও প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে-প্রয়োজন প্রাথমিক নয়, সে-প্রয়োজন প্রাথমিক পরিপূরক বা পরিসমাপক নয়। সেটা অতিরিক্ত বা উদবৃত্ত। সেও একপ্রকার উপভোগ, কিন্তু পরম বা চরম উপভোগ নয়। সেইজন্যে তাকে আমি উপলব্ধির কোঠায় ফেলিনে। তবে আমি একথাও মানি যে মানুষের যেমন দেহ আছে তার জন্যে চাই অন্ন, মানুষের যেমন মন আছে তার জন্যে চাই আলো, মানুষের যেমন আত্মা আছে তার জন্য চাই অমৃত, মানুষের যেমন হৃদয় আছে তার জন্যে চাই রস, মানুষের যেমন ইন্দ্রিয় আছে তার জন্যে চাই রূপ— মানুষের তেমনি রুচি আছে তার জন্যে চাই আবরণ বা আভরণ। কারুশিল্পের উদ্ভব হয়েছে মানুষের রুচির দাবি মেটাতে।

কারুশিল্পকে কেন আর্ট বলা হয় না তার কারণ তার সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক গৌণ! রুচির সম্পর্কই মুখ্য। সোনার হার বা চুড়ি কার-না ভালো লাগে! কিন্তু সেই ভালো লাগাটা রসোপলব্ধি নয়, সেইজন্যে কারুশিল্পকে চারুশিল্পের আদর্শ দেওয়া হয় না। তা হলেও কারুশিল্পও তো শিল্প। বৃহত্তর অর্থে আর্ট বলতে দোষ কী? স্বর্ণকারের অন্তরে যে রস আছে সে-রস তো রূপায়ণের আর কোনো উপায় পাচ্ছে না। স্বর্ণকার যদি ওই সোনার অলংকারের সঙ্গে তার হৃদয়রস সংমিশ্রণ করে তো সেরূপ স্থলে তাকে স্রষ্টা বলতে ও তার নির্মিতিকে সৃষ্টি বলতে আপত্তি কী? ক্রাফট সেরূপ ক্ষেত্রে আর্ট নয় কেন? গ্রিসদেশীয় পাত্র দেখে কিটসের মনে যে আনন্দ তা কি কেবল ক্রাফট দেখে না ক্রাফটের মধ্যে আর্ট দেখে? কারুশিল্প ও চারুশিল্প বিভিন্নও বটে। ওটা নির্ভর করে হৃদয়রসের যোগ-বিয়োগের উপরে। সেই অনুসারে ওদের রূপও বিভিন্ন বা অভিন্ন। একটা হল রসের রূপ, অপরটির রুচির রূপ। রসরূপ ও রুচিরূপ একাধারে বিধৃত হলে আমরা খুশি হয়ে বলি, এই আর্টিস্ট একজন ক্রাফটসম্যান, এই ক্রাফটসম্যান একজন আর্টিস্ট।

অন্তঃসার

জীবন যেন একটা বহতা নদী আর আমরা শিল্পীরা যেন তাতে ডুব দিয়ে যে যার গাগরি ভরিয়ে ঘরে ফিরি। যে যার গাগরি উপুড় করে বলি, আমার কিছু দেবার ছিল, যা একান্ত আমারই। কথাটা মিথ্যা নয়, কেননা ডুব তো আমি সত্যই দিয়েছি, গাগরি আমি সত্যই ভরিয়েছি। অথচ যাতে ডুব দিয়েছি, যার জল দিয়ে গাগরি ভরিয়েছি তা আমার নয়, তা নিখিলবিশ্বের নিত্য প্রবাহিত জীবন-যমুনা। যে রস আমি দিয়ে যাচ্ছি সেও কি আমার! হায়! আমার বলতে ওই গাগরিটি। ওই মানবহৃদয়টি।

শিল্পীর হৃদয় ভরে রয়েছে জীবনের কাছে পাওয়া কটুতিক্ত অম্লমধুর নানা অব্যক্ত অভিজ্ঞতায়। তার লেখনী বা তুলি বা সেতার দিয়ে সেব্যক্ত করতে চাইছে সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ব্যক্ত করতে পারলেই হালকা হয় তার হৃদয়। তারপর তার হৃদয়ের রস হয় অপরের, হয় সকলের। ব্যক্ত করতে করতে ছড়িয়ে দিতে দিতে যা একের অন্তর হতে অন্যের অন্তরে উপনীত হয় আর্টের অন্তঃসার সেই জীবন-যমুনার জল, সেই হৃদয়গাগরির রস। যার নাম জীবনের সত্য সেই হয় হৃদয়ের সত্য। সেই সত্যই ব্যক্ত হতে হতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তখন তাকে বলি আর্টের সত্য। জীবন থেকে হৃদয়ে, হৃদয় থেকে হৃদয়ান্তরে তার যাত্রা। এই যাত্রা যেখানে শেষ হয়েছে আর্ট সেখানে অস্তিত্ব পেয়েছে।

জীবনের সত্য কি আর্টের সত্য? হ্যাঁ এবং না। 'হ্যাঁ' এইজন্যে যে গোড়ায় ওটা একই বস্তু। 'না' এইজন্যে যে মাঝখানে আছে মানবহৃদয়। হৃদয়ের ভিতর দিয়ে না গেলে জীবনের সত্য আর্টের সত্য হয় না। হতে পারে বিজ্ঞানের সত্য, দর্শনের সত্য, কিন্তু আর্টের সত্য হৃদয়নিরপেক্ষ নয়। ওই যে গাগরিটি ওটি না থাকলে নাগরী হয় না। জীবন-যমুনার জল আনতে হয় নাগরীকে গাগরি ভরিয়ে। শিল্পীকে হৃদয় ভরিয়ে। হৃদয় না থাকলে শিল্পী হয় না।

হৃদয় যেন মধুচক্র। সেখানে সঞ্চিত হয় নানা ফুলের মধু। কিন্তু তোমার সঞ্চিত মধুর আস্বাদ যদি আর কেউ না পায় তা হলে তোমার মধুসঞ্চয় কোনোদিন আর্টের পর্যায়ে উঠবে না। হৃদয় না থাকলে শিল্পী হয় না। কিন্তু হৃদয় থাকলেও শিল্পী হয় না, যদি-না তার সঙ্গে থাকে উজাড় করে বিলিয়ে দেবার ইচ্ছা, ক্ষমতা ও কৌশল। যাতে শিল্পীর সঞ্চয় রসিকের উপভোগ্য হয়। রসের সঙ্গে রূপ যোগ করতে পারলে তবেই রসিকজন উপভোগ করেন, রূপভোগ করেন।

রস যখন রূপান্বিত হয়, রূপান্তরিত হয় তখনই তা আস্বাদনযোগ্য হয়। তখনই তা হয় বাক্য বা সংগীত, চিত্র বা অভিনয়। রস বলতে বুঝি হৃদয়রস, কিন্তু তার পূর্বে সেটা জীবন-যমুনার জল। হৃদয়রস যদি হয় মানবহৃদয়ের অভিজ্ঞতা তবে জীবন-যমুনার জল হবে রিয়্যালিটি, মানবহৃদয়কে যে ভরে দিচ্ছে অভিজ্ঞতায়। অভিজ্ঞতার পূর্বে সেটা রিয়্যালিটির খন্ড। শিল্পের মূল রিয়্যালিটি, মাঝখানে রিয়্যালিটির অভিজ্ঞতা, উপরের দিকে অভিজ্ঞতার রূপান্বয় বা রূপান্তর। ফুল সকলে দেখতে পায়, কিন্তু মূল দেখতে যায় কজন! আর কান্ড, তাই-বা কজন দেখতে চায়! শিল্প শেখানোর জন্যে যেসব স্কুল কলেজ হয়েছে সেখানে রিয়্যালিটির খোঁজখবর কেউ রাখে না, মানবহৃদয়ের নাড়িনক্ষত্র জানে না, কলাবিদ্যাই সেখানকার একমাত্র পাঠ। সেখান থেকে উতরে আসা রীতিনিপুণদের কাছে বিশ্বরহস্য বা হৃদয়রহস্য একটা কথার কথা। একমাত্র সত্য হচ্ছে রূপ।

কিন্তু কীসের রূপ? রূপের পশ্চাতে কী আছে? অভ্যন্তরে কী আছে? এর উত্তরে কেউ বলবে কিছুই নেই, না থাকলেও চলে। কেউ বলবে আছে একটা বিষয়, কিন্তু সেটা ইন্দ্রিয়ের গোচর, তার সঙ্গে হৃদয়ের কী সম্পর্ক তা জানিনে। চোখ দিয়ে দেখেছি, হৃদয় দিয়ে দেখিনি, কান দিয়ে শুনেছি, প্রাণ দিয়ে শুনিনি, হাত দিয়ে ছুঁয়েছি, চেতনা দিয়ে ছুঁইনি। দরকার আছে বলে মনে হয়নি।

রূপভোগ যে কেন রসভোগ নয় তার কারণ নিহিত রয়েছে এই উত্তরে। আর্ট বলে সাধারণত যার পরিচয় তার রূপ আছে, কিন্তু সৌন্দর্য নেই। সৌন্দর্য অনেক গভীর স্তরের ব্যাপার। মানবহৃদয়ের গাগরি কাঁখে নিয়ে জীবন-যমুনার সলিলে অবতরণ করলে, নিমগ্ন হলে তবেই তুমি তার সন্ধান পাবে। আগে সন্ধান পেলে পরে সন্ধান দেবে। তখন তোমার রূপসৃষ্টি হবে সৌন্দর্যসৃষ্টি। সত্যই সৌন্দর্য, সৌন্দর্যই সত্য, কবি কিটসের এই আপ্তবাক্য তখন অর্থবান হবে।

আর্টের অন্তঃসার তা হলে জীবনের সত্য, জীবনের সৌন্দর্য। তোমার অন্তরের অন্তঃসার হয়েই তা আর্টের অন্তঃসার। আর্টের প্রতিষ্ঠা সত্যের শৈলের উপরে। অতি কঠোর ভিত্তি। অতি সুদৃঢ় ভিত্তি। তবে মানবহৃদয়ের নরম মাটি ও কচি ঘাসপাতা দিয়ে ঢাকা। সত্যিকারের আর্ট কখনো অসত্য হতে পারে না। তবে মানুষের সুখ-দুঃখ তাকে রসালো করে। তারপর সেই রসালো সত্যকে রূপান্তরিত করে কলাবিদের কলাবিদ্যা, মায়াবীর মায়াদন্ড। সত্যের অঙ্গে মায়া মাখানো হয়। তখন তাকে মায়া বলে ভ্রম জন্মায়। তবু আসলে সেসত্যই। সত্যই আর্টের অন্তঃসার। আর্ট দাঁড়িয়ে থাকে সত্যের জোরে। এবং সত্যের জোর হচ্ছে সৌন্দর্যের শক্তি। সত্যই সৌন্দর্য, সৌন্দর্যই সত্য। এখানে যে সৌন্দর্যের কথা হচ্ছে তা শিল্পীর সৃষ্ট নয়, তা শিল্পীর দৃষ্ট।

কিন্তু একথাও ঠিক যে সত্যকে বা সৌন্দর্যকে আমরা শিল্পীরা যেমনটি দেখি তেমনটি দেখাইনে। কারণ আমরা তো কেবল দ্রষ্টা নই, আমরা স্রষ্টা। স্রষ্টা মাত্রেরই অধিকার আছে সৃষ্টিকে তার মনোমতো করবার। মনোমতো না হলে ভেঙে চুরমার করবার। বিশ্বস্রষ্টা প্রতিনিয়ত এই কর্ম করছেন। আমরাও করে থাকি। একটি গল্প বা একখানি উপন্যাস শেষপর্যন্ত যে আকার নেয় তা আমাদের নিজেদেরই স্বপ্নাতীত। জানার সঙ্গে অজানাকে মিলিয়ে ঘটনার সঙ্গে কল্পনাকে জুড়ে, কত বাদসাদ দিয়ে, কত অদলবদল করে অবশেষে যা গড়ে তুলি তা জীবনের মতো নয়, তা মনের মতো। হয়তো মনের মতোও নয়, নিজের মতো। গল্প তার নিজের নিয়মে চলে, লেখকের শাসন মানে না, এমনও তো দেখেছি। সেই অবাধ্য ঘোড়ার পিঠে চড়লে সেযেকোনো তেপান্তরের মাঠে নিয়ে যায়, কোন খালে বিলে কন্দরে, তা সে-ই জানে। স্রষ্টার অধিকার খাটাতে গিয়ে দেখি সৃষ্টির স্বকীয় একটা অধিকার আছে, বেশি রাশ টানতে পারিনে। বিশ্বস্রষ্টার দশাটাও বোধ করি আমাদেরই মতো।

মোটের উপর যা হয়ে ওঠে তার সমস্ত স্খলন পতন সত্ত্বেও স্থিতি সত্যের উপর। সত্যের অভিজ্ঞতার উপর। সেইজন্যে সেবিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে তুলনীয়। শুধু তাই নয়, সেবিশ্বসৃষ্টির অঙ্গ। তাকে ছেড়ে বিশ্বসৃষ্টি নয়। আমরা যখন সত্যিকারের শিল্পসৃষ্টি করি তখন বিধাতার সঙ্গে যোগ দিয়ে বিশ্বসৃষ্টি করি। বিধাতার সৃষ্টি যদি নিরর্থক না হয় আমাদের সৃষ্টিও নিরর্থক নয়। এর সার্থকতা এর অন্তর্গূঢ় সত্যে। সত্যের সাক্ষাৎকার যদি না পেয়ে থাকি তবে অবশ্য অন্য কথা। তা হলে ব্যর্থতা ঢাকবার উপায় নেই। কানা চোখ, চশমায় ঢাকলে কী হবে! হলেই-বা সোনার চশমা! সৃষ্টি সেখানে অনাসৃষ্টি। কারণ অন্তঃসারশূন্য। আর্টের চরম বিচার তার অন্তঃসার দিয়ে। রূপ বা রীতি দিয়ে নয়। আর্ট যেন একপ্রকার সাক্ষ্য। যদি সত্য না হয় তবে বিচারক তাকে নাকচ করেন।

কিন্তু আমাদের সত্য আদালতের সত্য নয়। জীবনের তথা হৃদয়ের সত্য। এর বয়ানের ধারাও একরকম নয়। এর প্রতি অঙ্গে মায়া-মাখানো, সেইজন্যে একে মিথ্যা বলে মনে হতে পারে। শিল্পীকে সামাজিক কাঠগড়ায় দাঁড় করালে তার মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে আসে তা নিরেট বাস্তব সত্য নয়, মায়াময় রসালো সত্য। সংসারী লোকের মুখে শুনে ধাঁধা লাগে। তারা বুঝতে না পেরে মাথা নাড়ে আর বলে, রবিঠাকুর হেঁয়ালি লিখেছেন।

সত্যের বিচার ওভাবে হয় না। হয় সহজ বোধ দিয়ে। ঘণ্টা যেমন বাজে সত্যও তেমনি। কথাটা কি সত্যের মতো বাজছে? যদি সত্যের মতো বাজে তাহলেও ওটা সত্যই। গল্পটা কি সত্যের মতো বাজছে? না, বাজছে না। তা হলে ওটা সত্য নয়। অনেক জাগতিক ঘটনা সত্যের মতো বাজে না, যদিও লোকের চোখে দেখা। আবার কাল্পনিক ঘটনাও সত্যের মতো বাজে। যদিও কেউ চোখে দেখেনি। মানুষের চোখের আড়ালেও

কত কী ঘটছে, ভিতরে ভিতরে মন দেওয়া-নেওয়া হয়ে যাচ্ছে, একজন আরেক জনকে টানছে, কিংবা ঠেলছে, দূরে সরে যাচ্ছে বা সরিয়ে দিচ্ছে, এসবের সত্যতা কি চোখে দেখা ঘটনার চেয়ে কম? লোকে হয়তো বোঝে না, সরল করে বোঝানোও যায় না, পাঠকের ও লেখকের উভয়ের অক্ষমতার দরুন সত্যের প্রতি সংশয় জাগে।

সত্যকে উপলব্ধি করতে হয়। যে লিখবে সেও উপলব্ধি করবে। যে পড়বে সেও। উপলব্ধির অভাব আর কিছু দিয়ে ভরে না। এর জন্যে ডুব দিতে হয় জীবন-যমুনায়। সেটা একটা কাটা খাল নয় যে তোমার ইচ্ছা খাটবে তার উপর। কোথায় যে তার আদি তা কেউ বলতে পারে না, কোথায় যে তার অন্ত তাও কেউ জানে না। কবিত্ব করে যমুনা বলেছি বটে, কিন্তু জীবনের দিকে তাকাতে ভয় করে। ডুব দিতে গিয়ে কত লোক তলিয়ে গেছে অতলে। জীবন একেবারেই সহজ ব্যাপার নয়, তার পদে পদে দুঃখ দৈন্য দ্বন্দ্ব। পদে পদে স্নেহ প্রীতি করুণাও আছে। নইলে চলা কবে থেমে যেত। মানুষের চলার কথা বলছি। জীবনের চলা কি থামতে পারে! জীবন নিত্য চলমান। মানুষ না থাকলেও সেচলত, না থাকলেও চলবে। মানুষকে বাদ দিয়ে ভাবলে দুঃখ দৈন্য স্নেহ প্রীতি ইত্যাদির অর্থ হয় না। মানুষিক ভাবনার ঊর্ধ্বে উঠলে এ সকলের প্রকৃত অর্থ জানা যায়। কিন্তু এ কাজ শিল্পীর নয়, দার্শনিকের। তবে যিনি শিল্পী তিনি দার্শনিকও হতে পারেন, তাঁর শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে তাঁর বিশ্বসৃষ্টি একাকার হতে পারে। বড়ো বড়ো কবির বেলা এরকম ঘটেছে। দান্তে, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথের বেলা।

অন্তঃসৌন্দর্য

দার্শনিক বলো, বৈজ্ঞানিক বলো, ধার্মিক বলো, শিল্পী বলো, সকলের মনে এই একই ভাবনা যে সত্যকে দেখতে হবে, ছুঁতে হবে, ধরতে হবে, পেতে হবে, দিতে হবে। এ ভাবনা যার নেই সেদার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক নয়, ধার্মিক বা শিল্পী নয়। যাদৃশী ভাবনা তাদৃশী সিদ্ধি। সত্যকে যারা চায় সত্য তাদের নিরাশ করে না।

কিন্তু শিল্পীর ভাবনা কেবল সত্যের ভাবনা নয়। সৌন্দর্যের ভাবনাও বটে। এ ভাবনা দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ধার্মিককে কাঁদায় না, কাঁদালে কাঁদায় মরমিকে মিস্টিককে। অথচ শিল্পী মাত্রেরই এ কাঁদন কপালে লেখা। সৌন্দর্য বিশেষ করে শিল্পীরই দায়। শিল্পী, অথচ সৌন্দর্যের দায় নেই, এমনটি দেখা যায় না। সমাজের দায় নিয়ে যারা কাতর তাদেরও কি সৌন্দর্যের দায় নেই? হয়তো গৌণ, তবু আছে। না থাকলে তাদের শিল্পী না বলাই সঙ্গত। শিল্প তাদের কাছে সামাজিক উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্তমাত্র।

সত্য আর সৌন্দর্য এ দুটির একটি বেছে নিতে বললে শিল্পী বেছে নেবে সৌন্দর্য। দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ধার্মিক বেছে নেবে সত্য। তবে ধার্মিকের পক্ষে বেছে নেওয়া শক্ত। সত্য আর সৌন্দর্য এ দুটির দ্বিতীয়টি না থাকলে দর্শনের চলে, বিজ্ঞানের চলে, ধর্মেরও হয়তো চলে, কিন্তু শিল্পের বেলা অচল। অবশ্য বেছে নিতে কেউ বলেও না, কেউ চায়ও না। শিল্পের রাজ্যে সত্য ও সৌন্দর্য উভয়ের সমান গুরুত্ব—অন্তত উনিশ-বিশ।

সৃষ্টি যদি সত্যের শৈলের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত না হয় তা হলে তা অচিরস্থায়ী। নিছক সৌন্দর্যের সাহায্যে কালজয়ী হওয়া যায় না। সৌন্দর্যকে তার জন্যে সত্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে। কিংবা হতে হবে সত্যের সমার্থক। কিটসের ভাষায়। শিল্পীকে ভাবতে হবে সত্যের ভাবনা, তথা সৌন্দর্যের ভাবনা। একাধারে উভয়ের। সত্যকে গৌণ করা চলবে না। সৌন্দর্যকে মুখ্য না করাও চলবে না। চলতে পারে উভয়ের উনিশ-বিশ।

শিল্পীরা মনে মনে এর একটা নিষ্পত্তি করে নেয়। সত্য বলে, সুন্দর করে বলে। বলার ভঙ্গি বা পদ্ধতি বা ঢং বা ঠাট বা ধরনটা সুন্দর। শৈলী সুন্দর। আঙ্গিক সুন্দর। অলংকার সুন্দর। রূপ সুন্দর। কিন্তু বলার কথাটা হয়তো অসুন্দর। অসুন্দর সত্য। বিষয়টা হয়তো সৌন্দর্য বিরহিত, অথচ সত্যসমন্বিত। শিল্পীরা সত্যের সঙ্গে অসুন্দরকে জুড়ে তার উপর কারিগরি ফলিয়ে তাকে সুন্দর করে তোলে। মনে করে বহি:সৌন্দর্যই যথেষ্ট।

কিন্তু বহি:সৌন্দর্যই যথেষ্ট নয়। ভিতরে থাকবে সুন্দর মন সুন্দর আত্মা। অন্তঃসৌন্দর্য। অসংখ্য তথ্য পরিবৃত হয়ে আমাদের জীবনযাত্রা। কোথায় তার অন্তর্নিহিত সত্য তার উপর যদি হাতের মুঠো শক্ত হয় তবেই সার্থকতা। এক হাতের মুঠো। আরেক হাতের মুঠো শক্ত হবে যার উপর তার নাম অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য। সৃষ্টির বাইরেটা যদি সুন্দর নাও হয় তবু তার অন্তঃসৌন্দর্য তার ভিতর থেকে ফুটে বেরোবে।

জীবনকে কেউ কোনোদিন সরল করতে পারেনি। বড়োজোর আপনার জীবনযাত্রাকে সরলতর করতে গিয়ে সাধুসন্ন্যাসীর মতো হয়েছে। জীবন চিরদিন জটিল ছিল, জটিলই থাকবে চিরদিন। সেই জটিলতার গ্লানি মোচন করে উদ্ধার করতে হবে প্রকৃত সত্য। তেমনি আবিলতার ভিতর থেকে অনাবিল সৌন্দর্য। যার দুই হাত এই নিয়ে ব্যাপৃত তার সাধনা সংসারী বা সন্ন্যাসী কারও সঙ্গে মিলবে না। শিল্পীকে তার আপনার মতো করে বাঁচতে দিতে হবে, নইলে মানুষটা হয়তো বাঁচবে, কিন্তু তার শিল্পীত্ব হয়তো বাঁচবে না। শিল্পকে মূল্য দিলে শিল্পীপ্রকৃতিকেও মূল্য দিতে হয়।

অপরে যা এড়াতে পারে শিল্পী তা এড়াতে পারে না। তাকে পাঁকে নামতে হয়, খাদে নামতে হয়। এমন সব লোকের সঙ্গে মিলতে ও মিশতে হয় যারা পাপী আর দাগি আর পতিত আর পীড়িত। লাইব্রেরি বা ল্যাবরেটরিতে বসে, মঠে বা মন্দিরে বসে শিল্পী তার সত্যের সাক্ষাৎ চায় না কিংবা পায় না। কখনো সেযুদ্ধবিগ্রহের রক্ততরল আবর্তে খড়কুটোর মতো অসহায়, কখনো হাসপাতালে যমে-মানুষে টানাটানির

নীরব সাক্ষী। কখনো ধূর্ত শৃগালদের বেচা-কেনার বাজারে হাজির, কখনো ফন্দিবাজ পায়রাদের পলিটিকসের আসরে উপস্থিত। উৎসবে ব্যসনে রাজদ্বারে শ্মশানে কোথাও সেঅনধিকারী বা অশোভন নয়। যেখানেই মানুষ সেখানেই শিল্পী।

আবার যেখানে জনমানব নেই, আছে কেবল প্রকৃতি, সেখানেও শিল্পী আছে তার সত্যজিজ্ঞাসা নিয়ে, তার সৌন্দর্যতৃষ্ণা নিয়ে। সেখানেও সেএকা নয়, প্রকৃতি তার সঙ্গিনী। সঙ্গিনী কখনো দক্ষিণা, কখনো করালী। কিন্তু প্রতিদিন বিচিত্ররূপিণী। শিল্পী যদি মানুষকে এড়ায়, প্রকৃতিকে না এড়ায়, তা হলেও তার অভিজ্ঞতার ভান্ডার ভরে ওঠে। আর যদি প্রকৃতিকেও এড়ায়, অন্তর্জীবনের রহস্য ভেদ করতে এক কোণে বসে যদি ধ্যান করে, তা হলেও তার উপলব্ধি সুপ্রচুর হতে পারে।

অজস্র অভিজ্ঞতা অসীম উপলব্ধি ক্রমে শিল্পে রূপান্তরিত হয়। যখন হয় তখন তার মূল্য নির্ধারণ করা হয় তার অন্তর্নিহিত সত্য দিয়ে, অন্তঃসৌন্দর্য দিয়ে। কেবল একরাশ তথ্য থাকলেই চলবে না, কেবল মনোজ্ঞ ভঙ্গি বা মনোহর শব্দবিন্যাস থাকলেই চলবে না, আরও গভীরে যেতে হবে সত্যের উপলব্ধি করতে ও করাতে, আরও আড়ালে যেতে হবে সৌন্দর্যের অবগুণ্ঠন খুলে দেখতে ও দেখাতে। তথ্যের অরণ্যের ভিতরে সত্যের সাক্ষাৎ। এমন দৃষ্টি চাই যা সব ছদ্মবেশের অন্তরালে সত্যকে দেখতে পায়। চিনতে পারে। তেমনি সৌন্দর্যকেও।

অন্তর্নিহিত সত্য কেবল বস্তুগত নয়। মুখ দেখে মানুষ চেনা যায় না। তবে কি তা ব্যবহারগত? না, কেবল তাও নয়। কাজ থেকেও চেনা যায় না মানুষকে। বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হতে হয়, আপনাকে মিলিয়ে দিতে হয়, বিলীন করে দিতে হয়। তবেই চেনা যায় তাকে, চেনা যায় মানুষকে। তেমনি অন্তঃসৌন্দর্য কেবল সুন্দর ভাষা বা ছন্দ নয়, আঙ্গিক বা অলংকার নয়। তাদের যা সৌন্দর্য তা অন্তঃসৌন্দর্যের বহি:প্রকাশ হতেও পারে, না হতেও পারে। যদি হয় তবেই তারা অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনাময়।

রূপ মাত্রেরই বিকার ঘটে, তা বাসি হয়ে যায়, ম্লান হয়ে যায়, শুকিয়ে ঝরে পড়ে। কিন্তু যেখানে অন্তঃসৌন্দর্য বিকশিত হয়েছে সেখানে রূপ আর শুধু রূপ নয়, তার চেয়ে বেশি। সেফুল শুকিয়ে ঝরে পড়বার মতো নয়, সেচিরমন্দার। তেমন রূপের জন্যে প্রসাধনের দরকার হয় না। অবশ্য প্রসাধনেরও একটা মূল্য আছে। তাতে রূপ আরও খোলে। কিন্তু যেখানে অন্তঃসৌন্দর্যেরই অভাব সেখানে প্রসাধনের জাদুকরি সাধারণের মনোহরণ করতে পারলেও মহাকালের মনোহরণে অক্ষম।

সমস্ত প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই জগতের অন্তর সৌন্দর্য দিয়ে ভরা। সেই অব্যক্ত সৌন্দর্যই রূপে রূপে ব্যক্ত হচ্ছে। রূপ ফুরিয়ে গেলেও সৌন্দর্য ফুরিয়ে যাচ্ছে না। সেনিয়ত পূর্ণ। পূর্ণতা থেকে আসছে তার বিচিত্র প্রকাশ। যেন পূর্ণতার ফোয়ারা থেকে উপচে ওঠা রস। যা সুন্দর নয় তাকেও সেসৌন্দর্যের রসায়নে রূপান্তরিত করে। অসুন্দরের উপর সুন্দরের প্রভাব পড়ে। সুন্দরেরই ক্ষমতা বেশি।

এ জগতে অসুন্দর আগে, কোনো সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু আর্ট এই অবধি এসে থেমে যায় না। সেযখন এর থেকে কিছু দূর এগিয়ে যায় তখন তার সঙ্গে চলতে চলতে অসুন্দরও সুন্দর হয়ে যায়। বিজ্ঞানীর কাছে যেটা তথ্য শিল্পীর কাছে সেটা উপাদান। উপাদানকে সুন্দরের প্রভাবে সুন্দর করে তোলা যায়। তখন অসুন্দরের তুলনায় সুন্দরের সীমানা বেড়ে যায়। বলা বাহুল্য বস্তুগত কোনো পরিবর্তনের কথা হচ্ছে না। বস্তু যেখানকার সেখানে সেঅসুন্দর হতে পারে, কিন্তু আর্টের উপাদান হয়ে চিত্রের বা ভাস্কর্যের বা কাব্যের বা নাট্যের সামিল হলে তারপর সেসুন্দর হয়ে ওঠে।

বাহির ও ভিতর

সদরমহলে সারাদিন কাটানোর পরে স্বভাবতই মন চায় অন্দরমহলে যেতে। বাইরের সঙ্গে তো পরিচয় ঘটল, এবার দেখতে হবে ভিতরে কী আছে।

রূপ রস গন্ধের জগৎ, ঘটনার পর ঘটনার জগৎ, তথ্যের ও যুক্তির জগৎ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ —এর কি কোথাও শেষ আছে না সীমা আছে? হয়তো আছে, কিন্তু সেই সব নয়। জানতে ইচ্ছা করে এর আড়ালে কী আছে, ভিতরে কী আছে? হয়তো কিছুই নেই, কিন্তু কোন অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে বলব যে নেই! সদরমহল থেকে অন্দরমহলের আন্দাজ করা যায় না। ভিতরে না ঢুকে ভিতরের সত্য উপলব্ধি করা যায় না।

বিজ্ঞান যেখানে গিয়ে আর এগোতে পারে না, ইন্টেলেকট যেখানে গিয়ে আর কুল পায় না, শিল্পীর ইনটুইশন সেখানকার রহস্য ভেদ করতে পারে। শিল্পীর দৃষ্টি কেবল বহির্দৃষ্টি নয়, বহির্দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তার পরিপূরক অন্তর্দৃষ্টি।

শুধু অন্তর্দৃষ্টিও নয়। সেটা হয়তো যোগী ঋষির। তাঁদের চোখ মেলে তাকাতে হয় না। তাঁরা ধ্যানেই বহির্বিশ্ব দেখতে পান। কিন্তু শিল্পী সেকথা বলতে পারে না। তার চোখ-কান সবসময় খোলা। বহির্বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে তার চোখ-কান সৃষ্টি করা হয়েছে। তার বহির্দৃষ্টিতে সব কিছুই পড়ে। অধিকন্তু তার অন্তর্দৃষ্টিও আছে। তা দিয়ে সেবহির্জগতের সীমানা ছাড়িয়ে যায়।

সে-জগৎ থেকে ফিরে এসে যে ভাষায় সেকথা বলে সে-ভাষা রূপকথার ভাষা, রূপকের ভাষা, সাংকেতিক কাব্যের ভাষা, অ্যাবসার্ড নাটকের ভাষা। এমনও হতে পারে যে তার মুখে কথাটি নেই, সেশুধু আভাসে-ইঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করে সেকী দেখেছে, কী জেনেছে। কোনো মানবিক শব্দই তার বাহন হবার যোগ্য নয়।

যুগপৎ সদরে ও অন্দরে যার চলাফেরা সেমানবিক শব্দ পরিহার করতে পারে না। তাকে দুই ভাষায় কথা বলতে হয়। সেইজন্যে তার সৃষ্টি অমন দুর্বোধ্য মনে হয়। কতক বুঝি, কতক বুঝিনে। ভাবি অভিধানের সাহায্যে বুঝতে পারব। কিন্তু অভিধানের সহজতম শব্দও দুর্বোধ্য হতে পারে। অনুভূতিটাই দুরূহ।

ভাষা আসলে তৈরি হয়েছে বহির্জগতের প্রয়োজনে, তার ঘটনা ও তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে। একই ভাষায় অন্তর্জগতের প্রয়োজন মেটানো যায় না, অথচ সেই চেষ্টাই করতে হয়। আরেক সেট শব্দ খুশিমতো বানানো যদি-বা সম্ভব হয় তবে সাধারণ সেটা নেয় না, তার পরমায়ু বেশিদিন নয়। শব্দের জন্যে যেতে হয় সাধারণের ভান্ডারে। নতুন অর্থ দিয়ে তাকে ভান্ডারে ফেরত পাঠাতে হয়।

যতক্ষণ বহির্জগতের কথা হচ্ছে ততক্ষণ শব্দের একপ্রকার অর্থ, চেনা অর্থ। বহুজনের ব্যবহৃত অর্থ। কিন্তু অন্দরমহলের কথা বলতে গেলে অর্থান্তর ঘটে, অচেনা অর্থ উড়ে আসে, বহুজনের ব্যবহারে দোলা লাগে। ক্রমে সেটাও গা-সওয়া হয়ে যায়।

বাইরের জগতে জরা আছে, ব্যাধি আছে, মরণ আছে। আছে অন্যায় ও অপরাধ ও পাপ। অসত্য ও হিংসা। কতরকম দুঃখ আর দুর্দৈব। প্রকৃতির কত-না উৎপাত, মানুষের কত-না স্খলন পতন। তেমনি এর প্রত্যেকটির বিপরীত বা সংশোধন বা ক্ষতিপূরণও আছে। যৌবন আর স্বাস্থ্য আর পরমায়ু। ন্যায় আর পুণ্য, সত্য আর প্রেম। প্রকৃতির রাজ্যে কীসের অভাব? মৃত্যুও প্রাণের অভাব নয়। প্রকৃতির রাজ্যে যদি কোনো কিছুর অভাব থাকেও বিধাতার রাজ্যে নেই। সেখানে চির পরিপূর্ণতা। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

শিল্পীরা সুন্দরের ঘরানা, তাদের কারবার সৌন্দর্য নিয়ে। কিন্তু অন্দরমহলের বাইরে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য কোথায়? বহি:সৌন্দর্যের উপর দৃষ্টিপাত করলেই সেইসঙ্গে অসুন্দরের উপরেও দৃষ্টি পড়ে। সেই ভয়ে যদি দৃষ্টি রুদ্ধ করি তবে সুন্দরকেও দেখা হয় না। অসুন্দরকে এড়াতে গেলে সুন্দরকেও এড়াতে হয়। এমন কোনো কৌশল কি কেউ জানে যা দিয়ে পানি না ছুঁয়েও মাছ ধরা যায়, পাঁক না ছুঁয়েও পদ্ম তুলে আনতে পারা যায়?

অন্দরমহলে সুন্দর ছাড়া আর কেউ নেই। মাঝে মাঝে সেখানে যাওয়া যায়, কিন্তু দিনরাত সেখানে থাকতে পারা যায় না। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য যেন বিশুদ্ধ আত্মা। আমরা দেহও চাই, দেহসুখও চাই। সুখের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ আসে। জন্মালেই মরতে হয়। যৌবনের সূর্যাস্ত জরা। একটাকে চাইলে আরেকটাকেও চাওয়া হয়ে যায়। দেহ যার আছে তাকে দেহের সুন্দর-অসুন্দর মেনে নিতে হয়। তেমনি বহির্জগতের সুন্দর-অসুন্দর। সুন্দরের কারবারিকে অসুন্দরের ব্যাপার করতে হয়, করতে না হোক বুঝতে হয়। শিল্পীর মার্গ ছুঁতমার্গ নয়। যেটা তোমার ভালো লাগে না সেটার অস্তিত্ব তা বলে নাস্তিত্ব হয়ে যায় না। সাদা আছে, কালো আছে, তাতে আরও কতরকম রং। তোমার যেটা ভালো লাগে না অপরের হয়তো সেটা ভালো লাগে, অন্তত সত্যের খাতিরে ভালো লাগে। সমগ্রকে নিয়েই সত্য। সমগ্র নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ প্রীতিকর নয়। তা বলে নিছক প্রীতিকরকে নিয়ে সৃষ্টি চলে না। না বিধাতার সৃষ্টি, না প্রকৃতির সৃষ্টি, না মানুষের সৃষ্টি। তেমনি নিছক অপ্রীতিকরকে নিয়েও সৃষ্টি নয়। যদিও সেটাই হালফ্যাশন।

বৈজ্ঞানিক তাঁর ল্যাবরেটরিতে গিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেন। কবির তেমন কোনো গবেষণাগার নেই। কিন্তু কবির আছে অন্দরমহল। সেখানে গিয়ে তিনি চিরসুন্দরের সঙ্গে মিলিত হন, অন্তঃসৌন্দর্যর সঙ্গে বহি:সৌন্দর্যকে মিলিয়ে নেন, যাচাই করেন। এই যে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর অন্তঃপুরে যাওয়া ও প্রবেশ পাওয়া এ এক দুর্লভ সৌভাগ্য। কারো কারো জীবনে এ সৌভাগ্য আপনি আসে। অন্যদের এর জন্যে সাধনা করতে হয়। ইন্টেলেকটের বিকাশ না হলে যেমন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হওয়া যায় না তেমনি কবি বা চিত্রকর হওয়া যায় না ইনটুইশনের বিকাশ না হলে।

সূর্যের আলোর মতো আরও একরকম আলও আছে যার উদয় পুব আকাশে নয়, চিদগগনে। কবিদের সেআলোর জন্যে প্রতীক্ষা করতে হয়, তার জন্যে প্রস্তুত হতে হয়। সূর্যের আলো যেমন পৃথিবীর বাইরে থেকে আসে তেমনি যে আলোর কথা বলছি সে-আলো আসে সদরমহলের বাইরে থেকে। আমাদের সাধারণ জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার উপর সে-আলো যখন পড়ে তখন সব পরিষ্কার হয়ে যায়। যা দেখেছি অথচ দেখিনি তা যেন নতুন চোখে দেখি, নতুন আলোয় দেখি। আর এই যে নতুন আলোয় দেখা একে দেখানোও হয় আমাদের কাজ, আমাদের সৃষ্টিকর্ম। একের সৃষ্টি অপরকে দৃষ্টিদান করে।

কবিদের যে দ্রষ্টা বলা হয় সেটা এই কারণেই। দ্রষ্টা, অপিচ দৃষ্টিদাতা। বলা বাহুল্য নিছক বহুদর্শিতার জন্যে কেউ দ্রষ্টা বা দৃষ্টিদাতা বলে অভিহিত হন না। নিছক বহুদর্শিতারও মূল্য আছে নিশ্চয়। কবিরাও কবিরাজের মতো বহুদর্শী হলে অভিজ্ঞতাসম্পদে সমৃদ্ধ হন। কিন্তু কোন আলোয় দেখেছেন তারই উপর নির্ভর করে অন্তিম মূল্য। দেওয়ালি রাতে হাজার হাজার পিদিমের আলোয় আমরা বহুদর্শী হতে পারি, কিন্তু তার পরের দিন সূর্যের আলোয় যা হই তার নাম দ্রষ্টা। একই দৃশ্য দিনের আলোয় দেখতে আরেকরকম।

জীবনটা এত ছোটো যে সদরমহলের সব ক-টা ঘর এক জীবনে দেখা হয়ে ওঠে না। শতবর্ষ পরমায়ুও তার জন্যে যথেষ্ট নয়। আমাদের সকলেরই দৌড় পরিমিত। কিন্তু অন্দরমহলে যাবার দুয়ার সব বয়সেই খোলা থাকে। কিশোরবয়সিও হয়তো বর্ষীয়ানের আগে সেখানে প্রবেশ পায়। পঁচিশ বছরের কিটস যা দেখেছেন তার তুলনা তাঁর দ্বিগুণবয়সিদের অনেকের জীবনে নেই। কিটসের গৌরব শুধু তাঁর অনবদ্য কাব্যদেহের জন্যে নয়। তাঁর কবিচিত্ত কোন সুদূরের সৌরালোকে উদ্ভাসিত! সুদূরের হয়েও তা ভিতরের।

বাইরের রিয়্যালিটির মতো ভিতরের রিয়্যালিটিও আছে। চোখ খুলে গেলে ইনার রিয়্যালিটির দর্শন মেলে। তখন সৃষ্টিলীলা প্রত্যক্ষ হয়। কবি তখন তাঁর নিজের সৃষ্টিলীলাকেও বিধাতার সৃষ্টিলীলার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারলে বাঁচেন।

বাইরের রিয়্যালিটিকে আমি মায়া বলিনে। তা যদি বলতুম তবে সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতি সবই মায়া। কিন্তু ইনার রিয়্যালিটির আলোয় না দেখলে, না দেখতে জানলে, দেখার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তার ফলে সৃষ্টিকর্মেও অসম্পূর্ণতা আসে। একরাশ লিখলে কী হবে, দৃষ্টি যে অসম্পূর্ণ। পক্ষান্তরে একটি কবিতাই যথেষ্ট হতে পারে। সে-কবিতা এতটুকুও হতে পারে। কী দেখলুম তা দেখানোর জন্যে মহাকাব্য লিখতে হয় না প্রত্যেক কবিকে। মহাকাল তেমন কোনো দাবিও করেন না কালজয়ীর কাছে। দু-চার পঙক্তিও কালজয়ী হয়েছে।

সদরমহলে যেমন সুন্দরের সঙ্গে অসুন্দরও আছে অন্দর মহলে তেমন নয়। সদরমহলে যেমন শিবের সঙ্গে অশিবও আছে অন্দরমহলে তেমন নয়। সদরমহলে যেমন আনন্দের সঙ্গে নিরানন্দও আছে অন্দর মহলে তেমন নয়। সদর মহলে যেমন প্রেমের সঙ্গে অপ্রেমও আছে, সত্যের সঙ্গে অসত্যও আছে, অন্দরমহলে তেমন নয়। সদরমহলে যেমন জীবনের সঙ্গে মৃত্যুও আছে, যৌবনের সঙ্গে জরাও আছে, অন্দরমহলে তেমন নয়। একদিক থেকে অন্দরমহল বৈচিত্র্যহীন। মানুষ বৈচিত্র্য চায়। তাই অন্দরমহলে চিরবসন্ত উপভোগ করতে রাজি নয়। সেমুখে যা-ই বলুক-না কেন, সদরমহলের বৈচিত্র্য ছেড়ে অন্দরমহলে বৈকুণ্ঠসুখ চায় না।

হাসি আর কান্না, জন্ম আর মরণ, পাপ আর পুণ্য, মিলন আর বিরোধ, সুন্দর আর অসুন্দর, ভালো আর মন্দ এই নিয়ে বাইরের রিয়্যালিটি। এর বৈচিত্র্যের শেষ নেই। সেইজন্যে সাহিত্যেরও শেষ নেই, সংগীতেরও শেষ নেই, ললিতকলারও শেষ নেই। একদল বিদায় হবার আগে আরেক দল এসে হাজির হয়। সৃষ্টির কাজ চালিয়ে নিয়ে যায়। সৃষ্টিপ্রবাহ বহতা থাকে। সদরমহলে লোকারণ্য। তারই মাঝখানে দু-চার জনকে দেখি যাঁরা ভিতরের রিয়্যালিটির সন্ধান রাখেন। তারই আলোয় পথ চলেন। তাঁদের সৃষ্টি আভ্যন্তরিক আলোকে উদভাসিত।

না, দু-চার জন নয়। অনেকেই মাঝে মাঝে ভিতরের বার্তা পান, মুহূর্তের জন্যে অন্দরে উঁকি মেরে আসেন, ইনার রিয়্যালিটির আভাস বয়ে আনেন। কিন্তু বাইরের রিয়্যালিটি তাঁদের অভিভূত করে রাখে। যেমন অভিভূত করে অফিস বা দোকান। দোকানদারের কাছে দোকানই পরম সত্য আর অফিসওয়ালার কাছে অফিস। যদি নিজের দোকান বা নিজের অফিস হয়ে থাকে।

অন্দরমহলের তাতে কিছুই আসে-যায় না। সেতার চিরবসন্ত নিয়ে অপেক্ষা করে। যে চায় সেপায়। আর যে পায় সেতার প্রাপ্তিসৌরভ বিতরণ করে।

অখন্ডদৃষ্টি

সূর্যের আলো যেখানে জন্ম নেয় সেইখানেই আবদ্ধ থাকে না, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কত কোটি কোটি যোজন দূরে তার গতি, তেমনি কবির বাক্য সংস্কৃত বা গ্রিক বা চৈনিক ভাষায় জন্ম নিলেও সেই ভাষা যে-দেশের ভাষা সেই দেশেই নিবদ্ধ রয় না। অনুবাদের সাহায্যে দেশে দেশে সঞ্চারিত হয়।

তেমনি যুগে যুগে। বিংশ শতাব্দীতে যার জন্ম সেত্রিংশ শতাব্দীতেও জীবিত থাকতে পারে। এ সম্ভাবনা কবিদের প্রত্যেকের বাক্যে নিহিত। 'সম্ভাবনা' বলেছি। 'সম্ভবপরতা' বলিনি। যা প্রত্যেকের বেলা সম্ভব তা অত্যল্পের বেলা সম্ভবপর। ডাকা হয় অনেক জনকে, বেছে নেওয়া হয় কয়েক জনকে। কারা সেই ভাগ্যবান তা মহাকালই জানেন।

আর্ট দেশ ও কালে জন্ম নিলেও তার জীবন দেশ ও কালে সীমিত নয়। নিখিল বিশ্ব ও নিরবধি কাল তার স্বদেশ ও স্বকাল। সেইজন্যে আর্টের মূল্য নিশ্চয়ই এক দেশের হয়েও সব দেশের, এক যুগের হয়েও সব যুগের। স্বাদেশিক হয়েও বিশ্বজনীন, ইদানীন্তন হয়েও চিরন্তন। যেক্ষেত্রে নিতান্তই একদেশি বা একযুগী সেক্ষেত্রে আর্ট হয়ে থাকে সংকীর্ণ, প্রাদেশিক, সাময়িক ও কোনো একটা উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়। সেউদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক-না কেন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জিনিসটাই এমন যে আর্টকে তার বাহন করতে গেলে আর্ট খাটো হয়ে যাবেই। গঙ্গার মতো নদী—যাকে দেবী বলে লোকে পূজা করে—যদি জলবিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যে যন্ত্ররাজ বিভূতির দ্বারা শৃঙ্খলিত হয় তবে তার মুক্তধারার জন্যে যারা পিপাসিত তারা বিদ্রোহ করবেই।

আজকের জগতে সাহিত্য হয়েছে নানা বিচিত্র উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়। অথবা একান্ত প্রাদেশিক বা সামাজিক, সাময়িক বা ক্ষণিক। সাহিত্য যে একটা গোষ্ঠীর সামগ্রী হবে না, হবে জনগণের; এটা একটা বড়ো কথা। কথাটা এই যুগেই শোনা যাচ্ছে সুতরাং এ যুগের মনের কথা। কিন্তু তার আগে তাকে সাহিত্য হতে হবে। সাহিত্য নামধেয় হলেই হবে না। সাহিত্য থেকে যদি সাহিত্যরস চলে যায় তা হলে সেই নীরস পদার্থকে সাহিত্য নামে ডাকলেই কি তা সাহিত্যের মতো সুগন্ধ বিতরণ করবে? জনগণের তৃষ্ণা যদি সাহিত্যের অপেক্ষা রাখে তবে তাদের জন্যে পরিবেশিত সাহিত্যেও থাকবে সাহিত্যের রস, সাহিত্যের সত্য; কেবল কতকগুলি তত্ত্ব বা তথ্য নয়। যা দিয়ে হয়তো সামাজিক প্রগতি বা কল্যাণ হবে, ব্যক্তিগত তৃষাহরণ নয়।

সেরস, সেসত্য বিশ্বজনীন তথা চিরন্তন বলেই মহামূল্য। নয়তো মূল্যহীন বা স্বল্পমূল্য। নিকৃষ্ট পদার্থও রস বলে বিকোতে পারে। সুধাও রস, আবার সুরাও রস, সোমরস। বিষও রস হতে পারে। দশ-বিশ লক্ষ পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শক ভোট দিয়ে নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট করতে পারে না। তাদের অনাদর উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্ট করতে পারে না। তার যে মহিমা তা লোকগণনার ঊর্ধ্বে। পুরস্কার বা তিরস্কারের দ্বারা তার ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। সেস্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তাকে মহামূল্য করে দেশাতীত ও কালাতীত মূল্য। সত্য শিব সুন্দর।

আর্টের সত্য শিব সুন্দর ঠিক সমাজের সত্য শিব সুন্দর নয়। সামাজিক বিচার ব্যক্তিগত বিচারের মতো ভুলভ্রান্তিতে ভরা, হ্রস্বদৃষ্টি ও অনুদার হতে পারে। প্রায়ই হয়ে থাকে। ধার্মিকরা তো সত্য শিব সুন্দরকে ধর্মীয় ব্যাখ্যা দেবেনই। একালের এক-একটা ইডিয়োলজির প্রভাব এক-একটা ধর্মের মতো। তাদের সত্য শিব সুন্দরকে তারা আর্টের উপর আরোপ করতে চায়। যদি আদৌ মানে। সামাজিক, ধার্মিক বা ইডিয়োলজিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আর্টিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় মেলে না, মিললেও হুবহু মেলে না। আর্টিস্টের আর এক জোড়া চোখ আছে। তা দিয়ে সেসত্য শিব সুন্দরকে নিরন্তর দেখছে। কিন্তু অপরের দেখার সঙ্গে তার দেখার এমন কিছু তফাত আছে যার জন্যে সেআর্টিস্ট।

প্রেম, করুণা ইত্যাদি হৃদয়ভাব—কোনো কোনোটা সুনীতির পর্যায়ে পড়ে না, যেমন হিংসাদ্বেষ নিয়ে সাহিত্যের কারবার। শেক্সপিয়রের নাটকে না আছে কী! সমস্তই কি সাধুসম্মত হৃদয়ভাব! না। মানুষের হৃদয়ে যদি হিংসা দ্বেষ থাকে তবে সাহিত্যেও তা থাকবে। তার পরিণাম যদি ভয়ংকর হয় তবে সে-ভয়ংকরও থাকবে। বহুক্ষেত্রে নিরীহ নির্দোষ যারা তাদেরই যত দুঃখ। দুরাত্মার দন্ড নেই এমনও তো দেখা যায়। সাহিত্য কেমন করে সব ক্ষেত্রে দন্ডদান করবে? জীবনের প্রতি সত্যনিষ্ঠ যে সাহিত্য সেজীবনের অন্তরালে কোনো নৈতিক বিধান কাজ করছে কি না তার অনুসন্ধান করে, কিন্তু যতক্ষণ না তার খোঁজ পাচ্ছে ততক্ষণ গতানুগতিকভাবে পাপের সাজা বা পুণ্যের পুরস্কার দেখায় না। কারণ প্রতিক্ষেত্রে পাপের সাজা ও পুণ্যের পুরস্কার দেখা যায় না। জীবন যেমন তাকে তেমনিটি দেখাতে হবে। তবে সরল দৃষ্টিতে নয়, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে। অন্তরালে গিয়ে, গভীরে নেমে। আজকালকার জীবন এমন বিপর্যস্ত যে সাধারণত অশিবেরই জয়, শিবের পরাজয়, অসুন্দরেরই প্রতাপ, সুন্দরের দুর্বলতা চোখে পড়ে। সেইজন্যে আরও গভীরে নামতে হবে, অন্তরালে যেতে হবে, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখতে হবে, নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে হবে, দিব্যদৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করতে হবে, চোখ বুজে ধ্যান করতে হবে। তা হলেই পাওয়া যাবে সত্যের দর্শন—শিবেরও। সাহিত্যিকের দৃষ্টি নিছক প্রত্যক্ষদর্শী নাগরিকের নয়, অপরপক্ষে নীতিনিপুণের বা ধার্মিকেরও নয়, সমাজপতির তো নয়ই।

জীবন একালে এমন ভাঙাচোরা খন্ডবিখন্ড যে এর একটি সমগ্র রূপ কোথাও দেখবার জো নেই। না শহরে না গ্রামে না প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে না মধ্য আফ্রিকার অরণ্যে না হিমালয়ের গুহায়। ভাঙা কাচের টুকরোগুলোকে একত্র জুড়লে তা সমগ্র হয় না। প্রাচীনরা জীবনের সমগ্র রূপ কোথাও-না-কোথাও দেখতে পেয়েছিলেন বলে তাঁদের মধ্যে একটা প্রশান্তি ছিল। যদিও তাঁদের সকলে কিছু গভীরে যাননি, অন্তরালে যাননি, ধ্যানী ছিলেন না, সূক্ষ্ম দৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি লাভ করেননি। আধুনিকরা জীবনের সমগ্র রূপ কোথাও দেখতে পাচ্ছেন না। হয় তাঁদের এটা জুড়ে জুড়ে তৈরি করতে হবে—যা কখনো সমগ্রতার আবিষ্কারের আনন্দ দেয় না—নয় সমগ্রকে সাধনার দ্বারা আবিষ্কার করতে হবে। যাঁরা এর কোনোটাই করেন না তাঁরা নিছক প্রত্যক্ষদর্শী বা পর্যবেক্ষক হয়েই ক্ষান্ত হবেন। কেউ কেউ ধর্মজ্ঞ বা নীতিজ্ঞ হবেন। বহুসংখ্যক হবেন সমাজহিতৈষী, গণহিতৈষী। দু-চার জন তত্ত্বজ্ঞও হবেন। কিন্তু রসজ্ঞ একজনও না। কারণ রসের সাধনা সমগ্রের আবিষ্কারের সাধনা। হৃদয় দিয়ে আবিষ্কারের। সেসমগ্র হয়তো ভান্ডারের মধ্যে ব্রহ্মান্ডের মতো স্থিত। একটি মুহূর্তের মধ্যে অনন্তকালের মতো।

অবচেতন বা অচেতন স্তরের অস্তিত্ব এ যুগের মস্তবড়ো এক আবিষ্কার। সাধারণ চেতনা দিয়ে সব কিছু জানা যায় না। সাধারণ চেতনার আড়ালে কত কী কাজ করছে। সাহিত্যে ও চিত্রকলায় তাকেও ধরতে ছুঁতে হবে। তাকেও ঠাঁই দিতে হবে। বিংশ শতাব্দীর কবি ও চিত্রীদের অনেকেই একপ্রকার স্বপ্নলোকের বার্তা বয়ে নিয়ে আসছেন যেখানকার ধরনধারণ স্বপ্নের মতো খামখেয়ালি বা হেঁয়ালি, অশাসিত, অনিয়ন্ত্রিত, অটোমেটিক, পারম্পর্যহীন, যুক্তিহীন, অর্থহীন। এটা একটা বৈপ্লবিক বিকাশ কিন্তু স্বাধীন বিকাশ নয়। মনোবিজ্ঞানের বিকাশ থেকেই এটার উদ্ভব। চাঁদের আলোর মতো এটা প্রতিফলিত আলোক। তা বলে কম সত্য নয়।

কিন্তু এহো বাহ্য। একে জুড়ে জুড়েও সমগ্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না। এও একরকম খন্ডদর্শন। অখন্ডদর্শন নয়। মানুষ নিশ্চয় এর চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক বেশি জটিল। জগৎটা নিরালম্ব স্বপ্নলোক নয়। সেটার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও সেঅস্তিত্ব সমগ্রের একটি ভগ্নাংশ মাত্র। সমগ্রের উপর দৃষ্টি থাকলে সেঅস্তিত্বেরও অর্থভেদ হতে পারে। বৃহত্তর যুক্তির অঙ্গীভূত হলে অযৌক্তিক আর অযৌক্তিক নয়। যেটা বল্গাহীন, অটোমেটিক, নিরঙ্কুশ সেটাও প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা শাসিত। আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলার আয়ত্তাধীন। বিজ্ঞানীরা ততদূর না গেলেও শিল্পীরা ততদূর যেতে পারেন, যদি স্বাধীনভাবে যাত্রা করেন। এই যে বিজ্ঞানের

আঁচল ধরে চলার মতো স্বাধীনতার অন্তরায়। আর স্বাধীন না হলে শিল্পী তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে পারে না। গতানুগতিকের অনুসরণ করে।

প্রাচীন কালে বা মধ্যযুগে বিজ্ঞানের এমন জয়জয়কার ছিল না। বিজ্ঞানের দৌলতে আজ মানুষ কেবলমাত্র আকাশে আকাশে উড়তে পারছে তাই নয়, মহাশূন্যেও বিহার করছে, ডেরা বাঁধার কৌশল ফাঁদছে। একদিন চাঁদেও পৌঁছে যাবে। এর ফলে বিজ্ঞানের গৌরব আর্টের গৌরবকে নিষ্প্রভ করছে। তাতেও কিছু এসে যেত না। কিন্তু অনেকেই প্রত্যাশা করছেন যে নাটক উপন্যাসও বিজ্ঞানের মতো অবজেক্টিভ হবে। সব কিছু মাপাজোখা, যথাযথ, তথ্যসিদ্ধ, দলিলবদ্ধ। কিন্তু হাজার অবজেক্টিভ হলেও তা আনরিয়্যাল হতে পারে। কারণ যেসব সত্য নিয়ে নাটক উপন্যাসের কারবার সেসব স্রষ্টার অনুভূতিও কল্পনাকে বাদ দিয়ে নয়। বিজ্ঞানীর পক্ষে যেটা গুণ নয় দোষ, শিল্পীর পক্ষে সেইটেই গুণ, দোষ নয়। *বাল্মীকি* যদি ক্রৌঞ্চনিধনে শোক পেয়ে শ্লোক রচনা করা ছেড়ে দিয়ে পাখিটাকে ব্যবচ্ছেদ করে পক্ষিতত্ত্বের সন্দর্ভ লিখতেন, তা হলে সেটা অবজেক্টিভ হত সন্দেহ নেই। কিন্তু কাব্য হত না, নি:সন্দেহ।

একালে যদি কোনো বাল্মীকি থাকেন তাঁর হৃদয় হবে সংবেদনশীল, অপরের দুঃখ দেখে তিনি দুঃখ অনুভব করবেন, তেমনি সুখ দেখে সুখীও হবেন। তিনি অসংকোচে হৃদয়চর্চা করবেন। ট্র্যাজেডির দিকে কমেডির দিকে তাঁর চোখ খোলা থাকবে, দিল খোলা থাকবে। সাধারণের অনুভূতির চেয়ে তাঁর অনুভূতি হবে বহুগুণ প্রখর ও গভীর। অনুভূতির সঙ্গে থাকবে কল্পনা। অনুভূতি শোক পায়। আর কল্পনা তাকে নিয়ে শ্লোক বানায়। একটিকে ছেড়ে আরেকটি বেশিদূর যেতে পারে না।

তা হলে কি নাটক উপন্যাস অবজেক্টিভ হবে না? যথাসম্ভব হবে। না হলেও ক্ষতি নেই। হলে আরও ভালো হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলাফল এখন হোমারের ইলিয়াডের সমর্থন করছে। ট্রয়ের যুদ্ধ নিছক কবিকল্পনা নয়। *কুরুক্ষেত্র* খনন করলে একদিন হয়তো মহাভারতের সমর্থন পাওয়া যাবে। তা বলে *ইলিয়াডকে* বা *মহাভারতকে* কোনো ঐতিহাসিক ইতিহাস বলে স্বীকার করেন না। *ইলিয়াড* বা মহাভারতের রস ইতিহাসের রস নয়, সুতরাং ঐতিহাসিকদের উপর নির্ভর করছে না তার মূল্য। অথচ যথাসম্ভব অবজেক্টিভ বলে তার মর্যাদাও মানতে হবে। সমসাময়িক জীবনের সঙ্গে নিবিড়তম পরিচয় অখন্ডদৃষ্টির সহায়ক। গ্যেটে তো একই কালে বৈজ্ঞানিকও ছিলেন। বৈজ্ঞানিক তাঁর বেলা শিল্পীর সহযোগী। সহযোগী না হয়ে প্রভু বা গুরু হতে চাইলে মুশকিল। তা হলে আবার সেই ধর্মেও প্রভুত্বের বা গুরুগিরির মতো ব্যাপার হবে। আর্টের ও সাহিত্যের ইতিহাসে যা বার বার হয়েছে।

অখন্ডদৃষ্টির জন্যে সকলের সাহায্য নিতে হবে। বিজ্ঞানের, ধর্মের, নীতির, দর্শনের। কিন্তু শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি যেন আচ্ছন্ন বা বিভক্ত না হয়।

গতি ও স্থিতি

জীবনযাত্রা পরিবর্তনশীল। জীবন তা নয়। সেই জন্ম সেই মৃত্যু, সেই জরা সেই ব্যাধি, সেই যন্ত্রণা সেই বেদনা, সেই শোক সেই দুর্ভোগ। আবার সেই কামনা সেই বাসনা, সেই প্রেম সেই প্রীতি, সেই বিরহ সেই মিলন, সেই মমতা সেই মায়া।

সাহিত্য যদি পরিবর্তনশীলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে তাহলে সাহিত্যে আর সাংবাদিকতায় প্রভেদ থাকে না। সাহিত্যের গাঁটছড়া জীবনযাত্রার সঙ্গে নয়, জীবনের সঙ্গে। তা বলে সাহিত্যে পরিবর্তনের প্রতিফলন থাকবে না তা নয়। তার সমালোচনা থাকবে না তা নয়। পরিবর্তনের সঙ্গে তার বিরোধও নেই। সেনিজেও তো যুগে যুগে বদলে যায়। বদলাতে বদলাতে সাহিত্যই থাকে।

মানুষের জীবনযাত্রা কোনোদিনই অপরিবর্তনীয় ছিল না। যুগে যুগে পরিবর্তিত হতে হতে দু-তিনশো বছর আগে সব দেশেই মোটের উপর একই রূপ ধারণ করেছিল। অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী, কারুশিল্পজীবী। গ্রামেই তাদের বসতি। অল্পলোকের বাস শহরে। তারা বাণিজ্য করে, রাজ্য চালায়। সংস্কৃতিও তাদেরই সঙ্গে জড়িত। যদি না হয় লোকসংগীত বা রূপকথা বা ছড়া।

তারপর এই দু-তিনশো বছরে জীবনযাত্রার রূপ সব দেশেই কম-বেশি বদলে গেছে, বদলে গিয়ে একই রূপ হয়েছে বা হতে চলেছে। সর্বত্র গ্রাম হটে যাচ্ছে, কৃষি হটে যাচ্ছে, কারুশিল্প হটে যাচ্ছে, শহর বেড়ে যাচ্ছে, তার বহর বেড়ে যাচ্ছে, তার আকর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে, বাণিজ্য ফেঁপে উঠছে, যন্ত্রশিল্প বলে একটা নতুন জিনিস ভুঁই ফুঁড়ে উঠছে, মানুষ এখন আকাশে উড়ছে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে উড়ে যেতেও পারবে। যদি নিজের তৈরি পারমাণবিক অস্ত্রে নিজেকেই ধ্বংস না করে।

এই যে রূপান্তর, এর কোথাও পুরাতন স্বাভাবিক ছন্দ নেই, মন্থর গতি নেই। সর্বত্র তোলপাড়, বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয়। কোথাও বেশি, কোথাও কম। ইংল্যাণ্ডে যা হতে দেড়শো বছর লেগেছে, রুশ দেশে পঞ্চাশ বছর, ভারত হয়তো তাকে ত্রিশ বছরে নিষ্পন্ন করবে। করতে গিয়ে বিপর্যস্ত হবে। খুব কম সময়ের মধ্যে খুব বেশি অদলবদলের যে গতিবেগ তা মানুষের জীবনযাত্রাকে লন্ডভন্ড করে। ধনতন্ত্রের জায়গায় সমাজতন্ত্র বললেও গতিবেগের ইতরবিশেষ হয় না। অস্থিরতা লেগেই থাকে।

আলোড়নের ফলে ক্ষুণ্ণ হয় পূর্বপুরুষেও ধর্ম, সমাজব্যবস্থা, পরিবারের গড়ন, রীতিনীতির প্রবর্তন হয়। এসব পরিবর্তনের তলে তলে কাজ করছে কয়েকটি আইডিয়া ও আইডিয়াল। মানুষ ইচ্ছা করলে বিশ্বনিয়ন্তা হতে পারে, প্রকৃতির নিয়ন্তাও হতে পারে। ব্যক্তি হিসাবে সেযতই দুর্বল হোক-না কেন সমষ্টি হিসাবে সেপ্রবলপ্রতাপ। সকলের সব দুঃখ দূর হওয়া সম্ভব। জগৎটা মায়া নয়। মর্ত থেকে স্বর্গে যাবার স্বপ্ন না দেখে স্বর্গকেই মর্তে নামিয়ে আনা যায়। সব মানুষই সমান। সব মানুষই স্বাধীন। মৈত্রীই কাম্য, তবে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকাই সুবুদ্ধি। মানবিক ব্যাপারে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতের স্থান নেই। যুক্তি আর বিবেক হবে চিন্তা ও কর্মের নিয়ামক। ভগবান থাকতেও পারেন না-থাকতেও পারেন, কিন্তু মানুষ তো আছে। সেযদি ইচ্ছা করে ও সাধনা করে তবে অতিমানব হতে পারে। পারফেকশন লাভ করতে পারে। মৃত্যুকে জয় করতে না পারলেও ব্যাধিকে ও জরাকে জয় করতে পারে।

গত দুই মহাযুদ্ধে মানবিকবাদীদের মানবের উপর বিশ্বাস মানবভাগ্যের উপর বিশ্বাস গুরুতর ধাক্কা খেয়েছে। প্রকৃতির হাতে নয়, ভগবানের হাতে নয়, মানুষেরই হাতে। সেইজন্যে ধাক্কা সামলে নেওয়াটাই আপাতত প্রাথমিক কাজ। তার জন্যে বেশ কিছুকাল শান্তি। গত শতাব্দীটা মোটের উপর শান্তিতে কেটেছিল

বলেই মানুষ ইহলোকেই স্বর্গসুখের কল্পনা করতে পেরেছিল। কিন্তু একটার পর একটা মহাযুদ্ধ ঘটবার পর মানুষ আর সহজে বিশ্বাস করতে পারছে না যে মহাযুদ্ধের দিন গেছে, সম্মুখে মহাশান্তি।

গত শতাব্দীর ফ্রি উইলের সেপ্রতিপত্তি আর নেই। একজন কি দুজন মানুষের বুদ্ধির দোষে বা ভুলে বা আকস্মিকভাবে যেকোনো দিন একটা মহামারি বেঁধে যেতে পারে। কেই-বা বেঁচে থাকবে যে সেই একজন বা দুজনকে দায় করবে বা সেই আকস্মিকতাকে আয়ত্তে আনবে। এটা যদি সাধারণ মানুষের হাতে না হয় তবে ফ্রি উইলের তাৎপর্য কী? তা হলে ডিটারমিনিজমের উপরে ছেড়ে দিতে হয়। মানুষ নিমিত্তমাত্র। ঐতিহাসিক শক্তির দ্বন্দ্বে সেসতরঞ্চের বোড়ে। তার ধারণা সে-ই চালক। ধারণাটা ফাঁপা।

সাধারণ মানুষ ইচ্ছা করলে আত্মাহুতি দিতে পারে। সেইভাবে ফ্রি উইলকে জিতিয়ে দিতে পারে। ডিটারমিনিজমকে অস্বীকার করতে পারে। 'না' বলার ক্ষমতা এখনও সাধারণ মানুষের হাতে। যেকোনো মানুষের হাতে। কোনো মানুষই সম্পূর্ণ অসহায় নয়। দুর্বলতম মানুষেরও আত্মিক বল আছে। কিন্তু তা হলে মধ্যযুগের সন্তদের মতো আগুনে পুড়ে আত্মিক বলের সাক্ষ্য দিতে হয়। সেদিক থেকে তিনশো বছর পেছিয়ে যেতে হয়। পেছিয়ে যাওয়া ও এগিয়ে যাওয়া দুই-ই কেমন করে হতে পারে? আর পেছিয়ে গেলে গ্রামে ফিরে যেতে হয়, সরলতর জীবনে ফিরে যেতে হয়। জটিলতর সভ্যতার থেকে পিছু হটা কি মুখের কথা! যখন দেখা যাচ্ছে শহরের দিকেই ঐশ্বর্যের দিকেই গড্ডালিকাপ্রবাহ।

যার চোখ আছে সে-ই দেখছে যে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে এক বিরাট নাটকের অভিনয় চলেছে। তার কয়েক অঙ্ক শেষ হয়েছে, কয়েক অঙ্ক এখনও বাকি। এটা ইন্টারভ্যাল। পরাক্রান্ত ঐতিহাসিক ও নৈতিক শক্তিসমূহ লীলা করছে।

সঙ্গে সঙ্গে এও দেখতে পাচ্ছে যে একে একে নিবিছে দেউটি। মানুষের প্রাণ এখন কীটপতঙ্গের মতো মূল্যহীন। সেনারীই হোক আর শিশুই হোক তার প্রাণ থাকা-না-থাকা সমান। যুদ্ধে যেটুকু দয়ামায়া ছিল এখন সেটুকু উঠে গেছে। সেটা এখন ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য। যেমন হৃদয়বত্তার স্থান নেই তেমনি বিবেকেরও স্থান নেই। ন্যায়-অন্যায় বিবেচনাও দুর্বলচিত্ততা। বিজ্ঞান মানুষকে যতই শক্তিমান করছে ততই দেখা যাচ্ছে সেহৃদয়হীন বিবেকহীন প্রাণ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাহীন মারণযন্ত্রে পরিণত হচ্ছে। মানুষের পক্ষে এটা গৌরবের কথা নয়।

পক্ষান্তরে মারণাস্ত্রের মার খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ও লড়তে থাকাও কম গৌরবের কথা নয়। অতি সাধারণ মানুষও অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছে, হার মানছে না, আত্মসমর্পণ করছে না। এটাও তো গণনার মধ্যে আনতে হবে। মানবাত্মা যতদিন অপরাজিত থাকবে ততদিন মানবের উপর বিশ্বাসও থাকবে। একটা দেশ হয়তো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েও প্রমাণ করে যাবে যে সেঅপরাজিত ও অনবরত। পরিণামে অন্তঃপরিবর্তন ঘটবে। আর সব পরিবর্তন বাহ্য। অন্তঃপরিবর্তনই সবচেয়ে মূল্যবান। আমাদের যুগ তার জন্যেই প্রতীক্ষমাণ।

সাহিত্যিক এখন কী করবে? একে তো জীবন থেকে মহত্ত্ব চলে যাচ্ছে, হৃদয় থেকে করুণা, প্রাণ থেকে প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধা, চরিত্র থেকে ন্যায়-অন্যায় বোধ। এই অমানবিকতার উপর কোনো বড়ো সাহিত্য দাঁড়াতে পারে না। সাহিত্যিকের কাছে এর মতো প্রতিবন্ধক আর কী আছে? অবশ্য সব প্রতিবন্ধকের পাশ কাটিয়ে যাবার কৌশল খুঁজলেই মেলে। তা হলেও মানতে হবে সেসাহিত্য কখনো মহৎ হতে পারে না, যদি জীবন থেকে মহত্ত্ব চলে যায়; জীবনের কোনো একটি কোণে যদি-না একটুখানি মহত্ত্বের সলতে জ্বলতে থাকে; যার আলো সাহিত্যের উপরেও পড়বে।

দেউটি যদি একবার নিবে যায় তো বহু শতাব্দীর জন্যে নিবে যাবে। এমনি করেই এক-একটা সভ্যতা দেউলে হয়ে গেছে। মূল্যগুলোই হচ্ছে দীপ। মূল্য চলে গেলে দীপ নিবে যায়। আমরা যেন একটা অন্ধকার হতে থাকা প্রেক্ষাগৃহে বসে নাটকের অভিনয় দেখছি আর সেনাটক ক্রমশ ক্লাইম্যাক্সের দিকে চলেছে। ট্র্যাজিক ক্লাইম্যাক্স। অবশ্য মন্দের ভিতর থেকে ভালো আসবে; অন্তঃপরিবর্তন এই যা সান্ত্বনা। আরেক সান্ত্বনা এই যে নাটকটা চিত্তাকর্ষক।

সাহিত্যিককে আত্মরক্ষা করতে হবে। রক্ষা করতে হবে তার আপনার আত্মাকে। সেনিজে অমানবিক হবে না। অপ্রমত্ত থাকবে। বিবেকহীন হবে না। হৃদয়বান হবে। শাশ্বত মূল্যরাজি অবিকৃত থাকবে। চিরন্তন সত্য শিব সৌন্দর্যকে, প্রেম মৈত্রী করুণাকে সযত্নে পাহারা দেবে। এর জন্যে যদি দুঃখ পেতে হয় দুঃখ পাবে। যদি প্রাণে মরতে হয় তাও শ্রেয়।

তারপর এই অন্ধকারের মধ্যে আলো খুঁজতে হবে। আলো যে কোনোখানেই নেই তা নয়। প্রত্যেক মেঘের রুপালি পাড় থাকে। অন্ধকারের ছিদ্রে ছিদ্রে আলোক প্রবেশ করে। সাহিত্যিকের দৃষ্টি অন্ধকারেও অন্ধ হয়ে যায় না। তার চোখ সব অবস্থায় খোলা থাকে। আলোর রেখা সে-ই সর্বপ্রথম দেখতে পায়।

রিয়্যালিটির অভ্যন্তরে যেতে হলে আরও এক জোড়া চোখ চাই। নাটক দেখতেও তো অপেরা গ্লাস লাগে। অনেকসময় চোখ বুজে দেখাই আসল দেখা। দৃশ্যমান জগতের পিছনে যে সত্য আছে তাকে উদ্ধার করতে হলে চাই ধ্যানদৃষ্টি।

স্থিতি একটা জায়গায় আছেই, যেখানে এ জগৎ স্থিত। কেউ একে ধ্বংস করতে পারবে না। তেমনি মানুষকেও, তার সত্যকেও। সত্যিকার জীবনকেও। গতি যেখানেই নিয়ে যাক স্থিতি সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আকাশের ধ্রুবতারার মতো। শাশ্বত মূল্যরাজি নির্বাপিত হবে না, হতে পারে না। যখন মনে হবে যে নিবে গেছে তখনও জ্বলতে থাকবে।

আর্ট কি স্বাধীন

আমাদের দেশের অজানা গুহাচিত্রের চেয়ে বহুগুণ প্রাচীন গুহাচিত্র অন্যান্য দেশে আবিষ্কৃত হয়েছে বলে শুনি। মানুষের সেই আদিম স্বাক্ষরের সমানবয়সি সমাজ বা ধর্ম ইতিমধ্যে অন্তর্হিত হয়েছে। কারা এঁকেছিল, কাদের জন্যে এঁকেছিল, কেন এঁকেছিল এসব প্রশ্নের উত্তর মেলে না। হাজার হাজার বছর কোথায় তলিয়ে গেছে। মাটির উপর দিয়ে বয়ে গেছে জলস্রোতের মতো জনস্রোত। অনধিগম্য বলে কাল এতদিন ধ্বনি করেনি। হয়তো একালের মানুষই হাজার হাজার বছরের অদেখা অজানা গুহাচিত্রের দ্বিতীয় সাক্ষী।

এর থেকে কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় যে সমাজের চেয়ে ধর্মমতের চেয়ে আর্ট আরও বেশি দিন বাঁচে; যদি সুযোগ পায়। তেমন সুযোগ সকলের বরাতে জোটে না। কিন্তু জুটলে বোঝা যেত যে আর্টের জীবনীশক্তি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। আর তার সেই জীবনীশক্তির মূলে তার স্বকীয় সত্তা।

হাঁ, আর্ট একটি সত্তা। একটি অস্তিত্ব। যেমন আলো হাওয়া জল মাটি বিদ্যুৎ। তফাতের মধ্যে এটা মানুষের সৃষ্টি। প্রকৃতির সৃষ্টি নয়। যেটা প্রকৃতির সৃষ্টি সেটা আগে এসেছে, যেটা মানুষের সৃষ্টি সেটা পরে। কিন্তু পরে বলেই সেটা কম অস্তিত্ববান নয়। সেকালের নদনদীও তো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রকৃতির সৃষ্টিও চিরদিন থাকে না। কিন্তু যতদিন থাকে ততদিন তাদের জীবনীশক্তির মূলে থাকে তাদের স্বকীয় সত্তা।

আর্ট আছে, আর আছে তার স্বকীয়তা। এই পর্যন্ত মেনে নিতে বাধা নেই। বাধা আসে স্বাধীনতার বেলা। আর্ট কি স্বাধীন?

স্বাধীন সত্তা নিয়েই আর্ট একদা আবির্ভূত হয়েছিল। মানুষ তার আপন কীর্তি দেখে অবাক। সেযেন এক বিশ্ব আবিষ্কার। সেদিন যা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত তাই ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয় ও তার সঙ্গে জড়িয়ে যায় রকমারি পাশ। সমাজের দাবি, ধর্মের অনুশাসন, রাজার ফরমাশ, রাজ্যের আইন। উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন উঠে সৃষ্টির প্রেরণাকে নিয়ন্ত্রিত করে। কোথায় আর্টের স্বাধীনতা? তার জায়গা নেয় ঐতিহ্য। ধারাবাহিকতা। সামাজিক প্রয়োজন। লোকহিত। একটা-না-একটা মতবাদ। যা আর্টের নিজের ঘরের নয়, বাইরের দুনিয়ার।

ধর্মের দিক থেকে বলা হয় যে জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগ ধর্মের আমলে আসবে ও ধর্মের আজ্ঞাবহ হবে। শিল্প মাত্রেই হবে ধর্মীয় শিল্প। নয়তো তাকে বর্জন করা হবে, অপাঙক্তেয় করা হবে। এ মনোভাব আজকের দিনেও কাজ করছে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। তবে সভ্যজগতে আর কেউ ধর্মের এই সর্বব্যাপিতায় বিশ্বাস করে না। গত শতাব্দীতে ধর্মের বদলে নীতির তরফ থেকে উঠেছিল ওই একই দাবি। জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগ নীতির আমলে আসবে, আর্টও বাদ যাবে না। যা নীতিহীন তা অপাঙক্তেয়। এ মনোভাব আজও এখানে-ওখানে কাজ করছে। কিন্তু সভ্যজগৎ মোটের উপর একমত যে নীতি না থাকলেও আর্ট থাকে, কিন্তু রস না থাকলে আর্ট থাকে না, রূপ না থাকলে আর্ট থাকে না।

তা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদীরা, সমাজতন্ত্রবাদীরা, সাম্যবাদীরা বর্তমান শতাব্দীর বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষত যুদ্ধকালে বা বিপ্লবকালে আর্টের কাছে আনুগত্য চেয়েছেন ও পেয়েছেন। ন্যাশনাল আর্ট, সোশ্যাল রিয়্যালিজম ইত্যাদি বয়ান বার বার উচ্চারিত হয়েছে। ধর্ম বা নীতি যা করতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছে, দেশপ্রেম বা সমাজপ্রীতি তাই করতে কোমর বেঁধেছে। পারবেও, কিন্তু কদিনের জন্যে? একদিন নাচার হয়ে মানতে হবে যে শিল্পীদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া যত সহজ শিল্পের আপনার স্বাধীনতা হরণ করা তত সহজ নয়।

শিল্পীরা যতক্ষণ সৃষ্টি করে ততক্ষণ অসাধারণ। তারপরে আর সকলের মতো নিতান্ত সাধারণ মানুষ। তাদেরই মতো ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, অভাবে অনটনে জর্জর, লোভে নষ্ট, উচ্চাভিলাষে ভ্রষ্ট। তাদের দিয়ে

লিখিয়ে নেওয়া বা আঁকিয়ে নেওয়া চিরকাল চলে এসেছে, চিরকাল চলবে। অতীতে এই কাজটি করাতেন রাজন্যবর্গ বা পুরোহিতকুল। ইদানীং করাচ্ছেন বণিক বা কমিশনার মন্ডলী।

কিন্তু শিল্পী স্বাধীন না হলেও শিল্প স্বাধীন ছিল ও থাকবে। কাব্য বা নাট্য বা সংগীত বা নৃত্য যে সমাজের বা সমষ্টির বা রাষ্ট্রের বা ধর্মসংঘের অনুগত হতে বাধ্য এটা কেউ কোনোদিন মন থেকে স্বীকার করেনি ও করবে না। রসের ও রূপের জগৎ একটা স্বতন্ত্র জগৎ। সেজগতে যাদের প্রবেশ আছে তারাই শিল্পী। যাদের নেই তারা বাইরের লোক। বাইরের লোকের অধিকার উপভোগে। তারা উপভোগ করেই সুখী হোক। তা না করে তারা যাবে শিল্পীর হাত ধরে লেখাতে বা আঁকাতে। ফলে যা আকার ধারণ করে তা আর্ট নয় বা আর্ট হিসাবে নিরেস।

আর্ট নিরাকার ব্রহ্ম নয়। আকার ধারণ করেই তাকে অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে হয়। যার হাত দিয়ে কণ্ঠ দিয়ে বা অঙ্গ দিয়ে সাকার হয় তারই নাম শিল্পী। শিল্পী পরাধীন হতে পারে। শিল্প কিন্তু স্বাধীন। আর শিল্পের সেই স্বাধীনতাই শিল্পীকে মর্যাদা দেয়। স্বাধীনতা বিনা মর্যাদা নেই। স্বাধীনতা বিনা সৃষ্টিও কি আছে? নব নব উন্মেষের জন্যেও চাই স্বাধীনতা। ধর্ম বা সমাজ বা রাষ্ট্র আপনার জন্যে যে স্বাধীনতা দাবি করে আর্টের বেলা সে-স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেই শিল্পের তথা শিল্পীর স্ফূর্তি। তারপরে কেউ যদি স্বাধীনতা পেয়েও তার অপব্যবহার করে সেভিন্ন কথা।

বলা বাহুল্য স্বাধীনতা যদিও অনন্যনির্ভর তবু অনন্যনিরপেক্ষ নয়। আর্টের স্বাধীনতা বলতে ধর্মের থেকে বা নীতির থেকে বিচ্ছিন্নতা বোঝায় না। সব ক-টি জগৎই পরস্পর প্রবিষ্ট। আর্টের ভিতরে সমাজের অনুপ্রবেশ তেমনি সত্য যেমন সত্য সমাজের ভিতরে আর্টের অনুপ্রবেশ। লোকনৃত্যে বা লোকসংগীতে যোগ দেয় সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতা। এই যে হোলি আসছে, এটি তেমনি একটি উৎসবরূপে কল্পিত হয়েছিল। এর অনুরূপ ছিল প্রাচীন গ্রিসে। প্রাচীনদের মধ্যে লোকের সঙ্গে শিল্পের বিচ্ছেদ তেমন ঘটেনি যেমন ঘটেছে আধুনিকদের মধ্যে। যেসব সমাজ এখনও ট্রাইবাল যুগে বাস করছে সেসব সমাজেও বিচ্ছেদ ঘটেনি।

আধুনিক কালের এটাও একটা সমস্যা, কেমন করে আর্টের সঙ্গে সমাজের তথা ধর্মের তথা নীতির বিচ্ছেদ বা ব্যবধান পরিহার করা যায়, ঘটে থাকলে দূর করা যায় বা হ্রাস করা যায়। যতদিন না এটা সম্ভব হচ্ছে ততদিন মানুষের জীবন খন্ডিত হবেই। সেটা কম দুঃখের নয়। তা বলে তো আর্টের স্বাধীনতাকে খর্ব করা যায় না। সেপথে সমস্যার সমাধান নেই। স্বাধীনতাকে গোড়ায় স্বীকার করে নিয়ে তারপরে পরস্পর নির্ভরতার সন্ধান করতে হবে।

এখানে কথা উঠবে যে, গুহাচিত্রের যুগেও কি স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পর নির্ভরতা ছিল? সেযুগেও কি ধর্ম আর সমাজ শিল্পকর্মের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল? না রূপদক্ষ জনের অবাধ স্বাধীনতার জন্যে গুহাভিন্ন আর কোনো গোপনীয় আশ্রয় ছিল না? তাই যদি হয়ে থাকে তবে সমস্যাটা কেবল আধুনিক মানবের নয়, এটা আদিতম মানবেরও সমস্যা। সেকালেও শিল্পীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ঘটে থাকতে পারে, শিল্পের স্বাধীনতা ব্যাহত হয়ে থাকতে পারে, ইচ্ছামতো সৃষ্টি করতে পারা যাচ্ছে না দেখে রূপদক্ষরা গুহার নির্জনতা বরণ করে নিয়ে থাকতে পারে। এতকাল পরে কেউ জোর করে বলতে পারে না প্রকৃত ব্যাপারটা কী। গুহা হয়তো পলাতকদের গজদন্তের গম্বুজ ছিল।

আমরা শুধু আমাদের সমসাময়িকদের সম্বন্ধেই জোর করে বলতে পারি। এর জন্যে দু-চার শতাব্দী পেছিয়ে যাওয়া যদি দরকার হয় তাও করতে পারি। আধুনিক যুগের প্রসঙ্গে মধ্যযুগের প্রসঙ্গও ওঠে।

এমন দেশ নেই যে-দেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সেনসরশিপ নেই। তুমি লিখতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের ভয়ে বা ধর্মসংঘের ভয়ে বা সমাজের ভয়ে সম্পাদক তা মঞ্জুর করবেন না, প্রকাশক তা প্রত্যাখ্যান করবেন, মুদ্রাকর তা ছাপবেন না। সাজা হয়তো একজন কি আধজন পান, কিন্তু সাজার ভয়ে বেশিরভাগ লোক তটস্থ। অবশেষে লেখকেরও হাত-পা অবশ হয়ে যায়। তার হাত দিয়ে সাহসের কাজ হয় না। যেটা হয় সেটা নিরীহ

নিষ্পাপ ভালোমানুষি। তার সঙ্গে সৌন্দর্য থাকে বলেই তা উত্তীর্ণ হয়। যেখানে সত্য বা সৌন্দর্য কোনোটারই মর্যাদা নেই সেখানে কেউ মনে রাখে না।

আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের বার বার বিদ্রোহ করতে ও কতৃপক্ষের রোষে পড়তে হয়েছে। এটাও একপ্রকার সত্যাগ্রহ। এর ফলে সাহিত্যের রাজপথ এখন জনপথে পরিণত হয়েছে। বহুজন যে স্বাধীনভাবে লিখতে পারছেন এটা দেশ-বিদেশের অসংখ্য সত্যাগ্রহীর শৌর্যের ও দুঃখভোগের নিট ফল। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এখনও করায়ত্ত হয়নি। যদি হয়ে থাকে তবে ফ্রান্সে বা ইংল্যাণ্ডে বা আমেরিকায়। যেসব দেশে সাহিত্যিক সত্যাগ্রহের ঐতিহ্য দুই শত বর্ষব্যাপী। আমরা তাদের সাধনার শরিক না হয়েও তাদের সিদ্ধির অংশভাগী হয়েছি।

না, সেসব দেশেও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা করায়ত্ত হয়নি। তবে নিষিদ্ধ দ্বার একে একে খুলে যাচ্ছে। যেখানে প্রবেশ মানা ছিল সেখানে ঢুকতে বাধা নেই। নিষিদ্ধ গ্রন্থের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হচ্ছে। নিষিদ্ধ নাটক দেখানো হচ্ছে। তাতে যে এমন কিছু অনিষ্ট হচ্ছে তাও নয়। আসলে সেসব দেশের বনিয়াদ এমন মজবুত যে সহজে চৌচির হতে পারে না। দুটো-একটা দেয়াল কি থাম ধসে-পড়া বিচিত্র নয়। আর্টের মুখ চেয়ে তেমন ঝুঁকি নেওয়া যায়। সভ্যতার বা সংস্কৃতির পরখ সেইখানে।

অথচ মধ্যযুগে এরকম ছিল না। তার কারণ সেনয় যে মধ্যযুগের ফিউডাল ব্যবস্থা কম সুদৃঢ় ছিল। তার হেতু জীবনজিজ্ঞাসায় গতানুগতিক ঔদাসীন্য। সব উত্তর *বেদ বাইবেল কোরানে* লেখা আছে, নতুন কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না। জানতে চাও তো গুরু ধরো। নিজের চেষ্টায় কিছু হবে না। আঁকতে চাও তো অনুকরণ করো। বিষয়গুলোও বাঁধাধরা। মধ্যযুগে সৌন্দর্যসৃষ্টিও অপ্রতুল ছিল না, কিন্তু পদে পদে সীমার বাঁধন। আধুনিক যুগ বেপরোয়া। রেনেসাঁস তাকে অসীমের ইঙ্গিত দিয়েছে। মানুষ তার জিজ্ঞাসার উত্তর পাক না পাক জিজ্ঞাসায় উদাসীন নয়। সেইজন্যে প্রতি দশ-বিশ বছর অন্তর অন্তর আর্টের জগতে ইজম বদলে যায়। গতানুগতিককে কেউ আমল দিতে চায় না।

সৃষ্টির স্বাধীনতা

শিল্প সব অবস্থায় স্বাধীন, সবসময় স্বাধীন। কিন্তু শিল্পী তা নয়। শিল্পীকে তার দেশকাল যতটুকু বা যতখানি স্বাধীনতা দেয় ততটুকুই বা ততখানিই সেস্বাধীন। স্বাধীনতার সীমা বাড়িয়ে নেবার জন্যে, স্বাধীনতাকে অর্থপূর্ণ করার জন্যে, সৃষ্টিকর্মে নিরঙ্কুশ হবার জন্যে শিল্পীরা যুগে যুগে ও দেশে দেশে কম চেষ্টা করেননি। বহু আয়াসে যা অর্জিত হয়েছে তার সংরক্ষণের জন্যেও সজাগ থাকতে হয়।

সৃষ্টির পূর্ণতার জন্যেই সৃষ্টিকরের স্বাধীনতা চাই। নইলে যা সৃষ্ট হবে তাতে জীবনের সর্বাঙ্গীণতা থাকবে না। কতক অঙ্গ অন্ধকারে গোপন রয়ে যাবে। অন্ধকারের বন্ধ কারা থেকে সেকি কোনোকালেই ছাড়া পাবে না? প্রাচীর ভেঙে তাকে উদ্ধার করে আনবে কে? শিল্পী ছাড়া কার উপরে এ দায়িত্ব?

মধ্যযুগের আলকেমিস্টরা যা ভয়ে ভয়ে করতেন আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকরা তা বুক ফুলিয়ে করছেন। বৈজ্ঞানিকদের স্বাধীনতা অঙ্কুশমুক্ত হওয়ায় জীবনও বহু পরিমাণে অন্ধকারমুক্ত হয়েছে। বিজ্ঞান, বিশেষত মনোবিজ্ঞান শত শত বন্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছে। সেইসব অন্ধকূপে আবদ্ধ সত্য এতকাল পরে বাইরে আসতে পেরেছে।

কিন্তু সৌন্দর্যের মহলে বৈজ্ঞানিকের প্রবেশ নেই। আর সত্যেরও একটা অন্দরমহল আছে যেখানে শুধু শিল্পীজনেরই প্রবেশ। অথচ বৈজ্ঞানিকদের অনুরূপ স্বাধীনতা শিল্পীদের বেলা স্বীকৃত হয় না। পাছে স্বাধীনতার অপব্যবহার হয় ও উন্মার্গগামী শিল্পীরা সমাজকেও উন্মার্গগামী করেন। লোকের ধারণা স্বাধীনতার অপব্যবহার বৈজ্ঞানিকরা করেন না, রাজনীতিকরা করেন না, আর কেউ করেন না—করেন শুধু শিল্পীরাই।

সমষ্টিকে উন্মার্গগামী করার জন্যে এতরকম ও এতগুলো শক্তি কাজ করছে যে শিল্পীরা যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকেন তা হলেও উন্মার্গযাত্রার বিরাম হবে না। হতে পারে উনিশ-বিশ। বরঞ্চ শিল্পীরা যদি স্বাধীনভাবে সক্রিয় থাকেন তবে শিল্পের আয়নায় আপনার মুখ দেখে সমাজ শিউরে উঠবে, হুঁশিয়ার হবে, রাশ টেনে ধরবে আশা করা যেতে পারে।

প্রাচীনরা দেবতা ও দানব কল্পনা করে জীবনের একটা ব্যাখ্যা পেয়েছিলেন। তেমনি স্বর্গ ও নরক কল্পনা করে মানুষের নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিকরা দেখছেন মানুষই দেবতা, মানুষই রাক্ষস, মানুষের অন্তরেই স্বর্গ আর নরক, বাইরেও তাই। এখন একথা শিল্পীরা যদি না বলেন তো বলবে কে? বলতে হলে খোলাখুলিই বলতে হয়। সবটাই বলতে হয়। ঠারেঠোরে আভাসে ইঙ্গিতে নয়।

মানুষের স্বার্থেই মানুষকে বলার দরকার যে, জীবনটা যেন একটা ভাসমান তুষারশৈল। সমুদ্রের উপরে তার চূড়াটুকুই দৃশ্যমান। আর সব জাহাজের লোকের অগোচর। যাত্রীরা তো পরম উল্লাসে নাচ গান হল্লা করছে আর নাবিকরাও পরম নির্ভয়ে দুর্বার বেগে ইঞ্জিন ছুটিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ ও কী! কই, টাইটানিক কোথায়! টাইটানিক চলে গেছে আটলান্টিক মহাদেশের সন্ধানে। কয়েকটি নারী ও শিশুকে লাইফবোটে নামিয়ে দিয়ে।

মানুষকে বোঝানোর দরকার যে, তুষারশৈলের দৃশ্যমান অংশটুকুই জীবন নয়। যা তার দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে তা যদি আমি দেখতে পাই তো আমার মানবিক কর্তব্য তাকে দেখানো। তাতে হয়তো সেএমন শক পাবে যে মিথ্যাবাদী বলে আমাকেই এক ঘা কষিয়ে দেবে। কিন্তু সেআপনি বাঁচবে কোন জাদুবলে! সত্যই তাকে বাঁচাতে পারে। পূর্ণ সত্য।

আধুনিক সাহিত্যিকের আসল জোর এইখানেই। আধুনিক সাহিত্যিক অনুসন্ধিৎসু। সেধরে নেয় না যে যত কিছু জানবার সব জানা হয়ে গেছে বা যত কিছু বলবার সব বলা হয়ে গেছে। সেধরে নেয় না যে নাবিকরা

সবজান্তা, ক্যাপটেন অভ্রান্ত। সেঅন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে হুল্লোড় করবার মতো নিরুদবিগ্ন নয়। তার নিজস্ব একটা যন্ত্র আছে, যা দিয়ে সেতুষারশৈলের মগ্ন অধোভাগ দেখতে পায়। যা দেখেছে তার কথা যদি সেনা বলে তো কে বলবে? বলতে তাকে হবেই। সেটাই তার মানবিক কর্তব্য।

অখন্ড জীবনের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া ও দেওয়া, এই হচ্ছে একালের সাহিত্যিকদের সাধনা ও সাধ্য। এই তাঁদের লক্ষ্য ও মোক্ষ। বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে না গেলে, বিচিত্র আস্বাদন না পেলে কেউ পরিণত বা পরিপক্ক হয় না। তেমনি ভাষা বা রূপ নিয়ে বিচিত্র পরীক্ষানিরীক্ষা বিনা কেউ সুদক্ষ হয় না। শতমারি ভবেৎ বৈদ্য, শিল্পেও এই নিয়ম খাটে। বার বার ব্যর্থ হতে হতেই নিশানা অব্যর্থ হয়। শিল্পের বা সাহিত্যের আর কোনো রাজপথ নেই।

আদিরস আদিকাল হতেই জীবনের তথা সাহিত্যের অঙ্গ। তাকে বাদ দিয়ে বা তুচ্ছ করে জীবনও হয় না, সাহিত্যও হয় না। সব দেশেই সব যুগেই মোটামুটি এটা স্বীকৃত। আমাদের সমসাময়িক কালে নতুনের মধ্যে এই হয়েছে যে, মনোবিজ্ঞান ও মনোবিশ্লেষণ সাহিত্যকেও স্পর্শ করেছে। বদ্ধমূল সংস্কার বা ইনহিবিশন একে একে ভেঙে গেছে ও যাচ্ছে। আরও যাবে। সাহিত্যিকের সংস্কারমুক্তির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আরও দেখা দেবে। নইলে জীবনের রহস্যভেদ করা যাবে না। জীবনের ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে সেকালের সেই ধার্মিক ব্যাখ্যা বা গত শতকের সেই নৈতিক ভাষ্য কেউ মেনে নিতে রাজি নয়।

জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা একদা আমাদের দেশের একদল সাহিত্যিককে বসতি অভিমুখী করেছিল। চল্লিশ বছর পরে তেমনি আরেক দলকে মনোরাজ্যের আণ্ডারগ্রাউণ্ডের দিকে টানছে। তাঁরা যদি সেখান থেকে উদ্ধার করে আনতে পারেন এমন কোনো অবদমিত সত্য যা জেনে রাখবার আর মনে রাখবার মতো, তা হলে তাঁদের জীবনজিজ্ঞাসা অপরের জীবনজিজ্ঞাসার পরিপূরক হবে। সেইভাবে সাহিত্যের ভান্ডারে পরিপূর্ণতা আসবে।

মানুষ নামক সত্যটি পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের পূর্বে যে পরিমাণ সরল ছিল তার পরবর্তী অধ্যায়ে সেপরিমাণে নয়। দান্তে থেকে শেক্সপিয়র কতটুকু ব্যবধান! তবু জটিলতার দিক থেকে দুস্তর। তেমনি ফ্রয়েডের পূর্বে ও পরে। আধুনিকরা যদি মনের পাতালে নামতে ভয় পান তবে আমি আশ্চর্য হব না। কারণ আমি নিজেও নি:শঙ্ক নই। অবচেতনের কেঁচো খুঁড়তে কে জানে কখন কেউটের ছোবল খেতে হবে। কিন্তু কেউ যদি অগ্রণী হতে চান আমি তাঁকে পেছন থেকে আটকাব না। তবে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দেব যে, রোগ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হলে যেমন স্বাস্থ্যসম্পন্ন ডাক্তার হওয়া চাই তেমনি পাতালে পা দেবার আগে স্বর্গের থেকে শক্তি সংগ্রহ করা চাই। বিষের চিকিৎসায় অমৃত কাজে লাগে।

যাঁর আধ্যাত্মিক জীবন বলতে কিছু নেই, সে-জীবনে কিছু জমেনি, তাঁর পক্ষে ওসব বিপজ্জনক বিষয় নিয়ে কারবার করা সমীচীন নয়। তা বলে তাঁর স্বাধীনতায় বাদ সাধতে যাওয়া ঠিক নয়। কতক লোক অগ্রণী না হলে তো কোনোদিন কোনো নতুন সত্যই আবিষ্কৃত হত না। কোনো বন্ধ দুয়ারই খুলত না। সাহিত্যও আমাদের অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যের মতো কয়েকটা মামুলি ছন্দ নিয়ে পদচারণ করত। অথবা স্ত্রীপাঠ্য ও বিদ্যালয়পাঠ্য রচনায় নিবদ্ধ হত।

আধুনিক দর্শন যেমন আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে নিচ্ছে, আধুনিক সাহিত্যও তেমনি করে আপনাকে মিলিয়ে নেবে। জীবন যদি অবিভাজ্য হয়ে থাকে তবে তার সেই অবিভাজ্যতা দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতি ভাগ-বিভাগকেও প্রভাবিত করে একসূত্রে গাঁথবে। কিন্তু সাহিত্য তা বলে স্বধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে দর্শন বা বিজ্ঞান বনে যাবে না। সেতার পারম্পর্য রক্ষা করেই বিবর্তিত হবে।

যেসব কথা বিজ্ঞানের মুখে দিব্যি মানায় সেইসব কথাই সাহিত্যের মুখে শুনলে সমাজরক্ষীরা হইহই করে তেড়ে আসেন। বিজ্ঞানের বই হলে আদালত ছেড়ে দেন, কিন্তু একই বিষয়ে সাহিত্যের বই হলে সাজা দেন। ক্ষতি কি বিজ্ঞানের বই কিছু কম করে? জীবনের তথ্যগুলো বিজ্ঞানে শ্লীল আর সাহিত্যে অশ্লীল এটা কি একটা মান্য করবার মতো যুক্তি? এ যুক্তি পরিত্যক্ত না হলে সাহিত্যের বাড় থেমে যাবে।

'সত্য কখনো শ্লীল-অশ্লীল হতে পারে না। তবে তার পরিবেশন শ্লীল-অশ্লীল হতে পারে।' এ হল আমাদের স্বনামধন্য এক লেখিকার উক্তি। বিষয়ে তাঁর আপত্তি নয়, ভাষায় ও ভঙ্গিতে আপত্তি। এক্ষেত্রে আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারিনি। কারণ তা হলে জেমস জয়েস, ডি এইচ লরেন্স প্রমুখ যুগান্তকারীদের উপর নিষেধাজ্ঞা বা দন্ডাদেশ সমর্থন করতে হয়। পরবর্তীকালে তাঁদের দুষ্কৃতিই হয়েছে তাঁদের কীর্তি। সাহিত্যে কী ছিল না তাঁরাই প্রথম এনে দিলেন। কেন সত্যকে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে এলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ও আর সকলের মুক্তি ঘটালেন, ভাবীকালের পাঠক এই লাইনেই বিচার করবেন। পরিবেশনের স্বাধীনতায় আপত্তি করবেন না।

সাহিত্যে যাকে শ্লীল-অশ্লীল বলা হয়ে থাকে আসলে তা সাহিত্যের উপর সমাজনীতির আরোপ। সমাজের পক্ষে যা শুচি তারই নাম শ্লীল, যা অশুচি তারই নাম অশ্লীল। তার সঙ্গে কিছুটা রুচির প্রশ্নও জড়িয়ে থাকে। ভদ্র ও ভদ্রাদের রুচি। শিল্পীরাও সামাজিক মানুষ, তাঁদের রুচিও ভদ্রজনের রুচি, কিন্তু কীসের দাবিকে তাঁরা অগ্রাধিকার দেবেন? সত্যের দাবিকে না সমাজহিতের দাবিকে, সৌন্দর্যের দাবিকে না ভদ্ররুচির দাবিকে? নিশ্চয় সত্যের ও সৌন্দর্যের দাবিকে।

যেমন সাদা আর কালো বলে দুটি মাত্র রং নেই, মাঝখানে নীল লাল হলদে প্রভৃতি আরও অনেকগুলি রং বা শেড, তেমনি শুচি আর অশুচি, ভালো আর মন্দ, সুরুচিকর আর কুরুচিকর বলে দুটি মাত্র গুণ নেই, মাঝখানে আছে আরও কতরকম গুণ বা স্তর। পাপ-পুণ্যের মাঝখানেও তেমনি। আমরা যে জগতের বা যে জীবনের কথা বলি সে-জগৎ বা সে-জীবন দুটি মাত্র রং দিয়ে আঁকা যায় না। আঁকলে তার প্রতি সুবিচার করা হয় না। সমগ্রতার উপর নজর রেখে আঁকতে বসলে নীতিনিপুণ বা রুচিরোচন অঙ্কনরীতি পরিহার করতে হয়। তা বলে নীতির দাবি বা রুচির দাবি উড়িয়ে দেবার নয়। সামাজিক মানুষ হিসাবে আমরা নীতির দাবি মানতে বাধ্য। তেমনি ভদ্রজন হিসাবে রুচির দাবি। কিন্তু যখন আমরা স্রষ্টা তখন আমরা বিশ্বস্রষ্টার দোসর। তখন আমাদের সামনে আরও বড়ো দাবি।

তিরস্কার বা পুরস্কার, রাজদন্ড বা রাজপ্রাসাদ, স্রষ্টার কাছে এসব গণনা অবান্তর। এসব লোক কে-ই বা ক-দিন থাকবে! সৃষ্টির আয়ু আরও বেশি। আমাদের যে সৃষ্টির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এর যেন সদব্যবহার করতে পারি। নয়তো যিনি দিয়েছেন তিনিই কেড়ে নেবেন। আর্টের নিষ্ঠুরা দেবীর করুণা লাভ করা কি সহজ কথা! কে তাঁকে অশ্লীলতা দিয়ে ভোলাবে! আর কেই-বা শ্লীলতা দিয়ে!

নিষিদ্ধ সৃষ্টি

সভ্যসমাজে বাস করতে হলে সারাক্ষণ পোশাক পরে থাকতে হয়, যাতে নগ্নতা ঢাকে। যাতে দর্শকের দৃষ্টি পীড়িত না হয়। তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে। তাঁর মনে বিকার না জন্মায়। পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষকে অল্পসল্প অসংবৃত হতে দেওয়া হলেও নারীর বেলা সর্বাঙ্গ মুড়ে রাখাই বিধি।

গত শতাব্দীর ইউরোপে এ নিয়ে প্রতিবাদ ওঠে। বর্তমান শতাব্দীতে মেয়েদের পোশাক এত বেশি সংক্ষিপ্ত হয়েছে যে রানি ভিক্টোরিয়া দেখলে মূর্ছা যেতেন। তবে পুরুষদের পোশাক তার সঙ্গে পাল্লা রেখে বদলায়নি। শোধরানোর প্রস্তাব যত বারই উঠেছে রক্ষণশীলতা বাধা দিয়েছে। মেয়েদের তুলনায় ছেলেরাই এখন পর্দানশিন। অথচ প্রাচীন গ্রিকদের বেলা পুরুষরা ছিল অনেকটা মুক্তদেহ।

নগ্নতার সেই যে গ্রিক আদর্শ সেইটেই ইউরোপীয় শিল্পের মন জুড়ে রয়েছে। মাঝখানে খ্রিস্টান সাধুদের কবলে পড়ে শিল্পীরা গ্রিক আদর্শ ভুলেছিলেন। কিন্তু রেনেসাঁস এসে তাঁদের চোখের উপর থেকে পর্দা সরিয়ে দেয়। নগ্ন পুরুষমূর্তি গড়তে কারও বাধে না। দেখতে কারও আপত্তি খাটে না। কিন্তু নগ্ন নারীমূর্তি আঁকতে আরও তিন-চার শতাব্দী লেগে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিবসনা নারী আঁকার রেওয়াজ সেই যে শুরু হয় আজও তার বিরাম নেই।

তবে হ্যাঁ, দর্শকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে একটা ডুমুরের পাতার বা সেই জাতীয় আবরণের দরকার হয়। একখানা হাত দিয়ে হয়তো চাপা দেয়। তা সত্ত্বেও যা দেখবার তার কতক দেখা যায়। বড়ো বড়ো মিউজিয়ামে এসব চিত্র সযত্নে সংরক্ষিত হয়। লোকে দর্শনি দিয়ে প্রবেশ করে। লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে ধনীরা এসব কিনে ঘর সাজান। প্রখ্যাত শিল্পীরা সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্য মিশিয়ে যা গড়েন যা আঁকেন তাকে অশ্লীল বলে অভিযুক্ত করলেও সেঅভিযোগ ধোপে টেকে না। যেটা টেকে সেটা ওই সৃষ্টির হয়ে ওঠা। সভ্যতার পর সভ্যতা ফৌত হয়ে গেছে, তবু শিল্পসৃষ্টি এখনও অম্লান। কারণ সেযে কথা বলছে তা সভ্যতার চেয়েও গভীরতর স্তরের কথা।

সভ্যসমাজ মাত্রেই পোশাকি সমাজ। মানুষ রেখে-ঢেকে কথা বলে। রেখে-ঢেকে ব্যবহার করে। সবসময় সেজেগুজে থাকে। কেবল দেহের দিক থেকে নয়, মনের দিক থেকেও। এটাও একপ্রকার অভিনয়। এই যে কৃত্রিমতা, এরই উপর দাঁড়িয়ে আছে সভ্য মানুষের ব্যাবহারিক জীবন। তা হলে কি এই জীবনই হবে আর্টের জীবন?

সমাজ হয়তো এর উত্তর একভাবে দেবে। কিন্তু আর্ট সেইভাবে নাও দিতে পারে। সমাজ হয়তো বলবে সভ্যসমাজে বাস করতে হলে মিথ্যার সঙ্গে আপোশ করা চাই। নয়তো মরবে। কিন্তু আর্ট তেমন কথা বলতে রাজি নয়। বললে বাঁচবে না। তেমনি সৌন্দর্য সম্বন্ধে সমাজ হয়তো বলবে বসনভূষণ যত গুরুভার হয় তত সুন্দর দেখায়। আর্ট বলবে যত লঘুভার হয় তত মনোহর। নাচতে নাচতে সম্পূর্ণ নিরাভরণ ও নিরাবরণ হওয়াই সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা।

ব্যাবহারিক জীবনে লোকলজ্জা একটা প্রধান গণনা। কিন্তু আর্টের জীবনে তা নয়। আর্ট যদি লোকলজ্জার ভয়ে জড়সড় হয় তবে তার থেকে জীবনটাই বাদ পড়ে। একটা অলীক অবাস্তব সামাজিক ছলনা বা খেলা কখনো আর্টের জগতে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না। যা সমাজের চোখে রেসপেক্টেবল তা আর্টের চোখে সুন্দর বা সত্য হবে এটা দুরাশা। সমাজের চোখে যা শিব তা যে শিল্পীর চোখেও শিব এমন প্রত্যাশাও অত্যাশা।

আসলে এসব শিল্পীর সহজাত ইনটুইশনের উপর ছেড়ে দিলে ভালো হত। তাকেও ঘরসংসার করতে হয়। তাই সেও সব কথা খোলাখুলি বলে না। হাতে রেখে বলে। কিন্তু বলতে চাইলে বলার অধিকার তার আছে।

সমাজ হয়তো একদিন নগ্ন সত্য ও নগ্ন সৌন্দর্যকে স্বীকৃতি দিয়ে শিল্পীকে অভয় দেবে। হাজার হাজার বছর এখনও সামনে পড়ে আছে। সভ্যতা যদি পোশাক-পরিচ্ছদের বাহুল্য থেকে মুক্ত হয় তবে শিল্পও প্রকৃতির আরও নিকটবর্তী হবে।

আমাদের যুগে আর্টের উপর সভ্যতার কৃত্রিমতা চাপানোর বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ ধূমায়িত হচ্ছে। ইচ্ছে করেই এমন সব বিষয়ে লেখা হচ্ছে যা নিষিদ্ধ, এমন ভাষায় লেখা হচ্ছে যেটা ব্রাত্য। বিদ্রোহের মূলে যদি আমরা যাই ও বিদ্রোহের তাৎপর্য বুঝে তার বক্তব্য মেনে নিই তা হলে নৌকার পালের থেকে বাতাস কেড়ে নিতে পারব। যাঁদের অকারণে বীর বা শহিদ করে তোলা হচ্ছে তাঁরা 'না' কথাটার উত্তরে 'না' কথাটি বলছেন। প্রথম 'না'টি ফিরিয়ে নাও। তা হলে দ্বিতীয় 'না'টিও ফিরে যাবে।

তর্কটা অনেকটাই এইরূপ। 'তোমরা এসব কথা লিখতে পারবে না। এমন ভাষায় লিখতে পারবে না। খবরদার!'

'আমরা এইসব কথাই লিখব। এমনি ভাষাতেই লিখব। দেখি কতদিন ঠেকাতে পার!'

'সমাজের সর্বনাশ হবে। সাহিত্যের সপিন্ডীকরণ হবে।'

'সমাজ বলতে কতকগুলি নাবালক-নাবালিকা নয়। আর সাহিত্য অত ক্ষীণায়ু নয়।

'দাঁড়াও, পুলিশ ডাকছি। আদালতে নালিশ ঠুকছি।'

'সাহিত্যবিচার ওঁদের কর্ম নয়। ওঁরা বিচারের নামে অবিচারই করবেন।'

সাহিত্যের বা শিল্পের অন্তিম বিচার সরকার বা আদালতের হাতে নয়, পাঠকের বা দর্শকের হাতে। পাঠক যদি পড়তে চান কেউ তাঁকে নিরস্ত করতে পারেন না। তেমনি দর্শককে। একদিন-না-একদিন নিষিদ্ধ বই বা ছবির প্রচার হয়। বরঞ্চ নিষিদ্ধ বলেই একটু বেশি করেই হয়। নাবালক ও নাবালিকাদের রক্ষা করার জন্যে বালির বাঁধ তখন কোথায় ভেসে যায়। তা বলে কি তারা ডুবে মরে? তেমন কোনো দুর্ঘটনার খবর আমাদের জানা নেই।

কোন সৃষ্টি সত্যিকার সৃষ্টি আর কোন সৃষ্টি অনাসৃষ্টি তা বিষয় অনুসারে নির্দিষ্ট হতে পারে না। ভাষা অনুসারেও না। অনাসৃষ্টি আপনার কবর আপনি খোঁড়ে। তার জন্যে ঘটা করে কবর খুঁড়তে হয় না। আর সত্যিকার সৃষ্টি একটা-কিছু বলতে এসেছে। তাকে তার বক্তব্য বলতে না দিয়ে কণ্ঠরোধ করলে শ্রোতারাই একদিন তার পক্ষ নেবেন। জনমতই তার বাণী শুনতে চাইবে।

তা হলে কি অশ্লীলতারই জিত! না, জয়টা অশ্লীলতার নয়। জয়টা নবজাতকের। যার অঙ্গে হয়তো জন্মের আনুষঙ্গিক পঙ্ক। সেটা প্রকৃতির সঙ্গে মেলে। সভ্যতার সঙ্গে না মিলুক। সভ্যভব্য হতে গিয়ে প্রকৃতির কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়াই ভ্রান্তি। অমন করে কাগজের ফুল তৈরি হয়। মাটির ফুল ফোটানো যায় না। 'শুদ্ধি', 'শুদ্ধি' করে সৃষ্টির গায়ে হাত দিতে গেলে দশের লাভ হয়তো কিছু হবে, কিন্তু সৃষ্টির প্রতিভা যাঁদের নেই, সৃষ্টির মালিক যাঁরা নন, তাঁরা কি প্রকৃত অধিকারী না অনধিকারী? প্রকৃত অধিকার যাঁর তিনি হয়তো কিছু অনিষ্টই করবেন, কিন্তু অনধিকারীকে দিয়ে যা হবে তা সৃষ্টির উৎসমুখে জগদ্দল পাষাণ চাপানো।

ধর্মের নাম করে, নীতির নাম করে মধ্যযুগে এটা হয়েছে। এখন হচ্ছে সমাজের নাম করে, রুচির নাম করে। এতে সমাজ রক্ষা হয়, কিন্তু সৃষ্টি রক্ষা হয় না। আর আমাদের এই আধুনিক যুগে বলবার মতো কথা এত বেশি আর এতরকম যে কয়েকটি নীতিকথা বা তত্ত্বকথা যেমন সাহিত্যের বা আর্টের সম্বল হতে পারে না তেমনি কয়েকটি ধরাবাঁধা সামাজিক ধারণাকে 'শুদ্ধ' আর অবশিষ্টকে 'অশুদ্ধ' বলে সাহিত্যের বা আর্টের সীমা সংকুচিত করা সঙ্গত হবে না। আর ভাষা তো ভাবেরই উপযোগী হবে। অনুপযোগী হলে শুদ্ধ ভাষারই-বা মূল্য কী? অনেক ক্ষেত্রে অশ্লীল ভাষাই উপযোগী ভাষা।

পাঠকের হাতে একটা মোক্ষম অস্ত্র আছে। তিনি না পড়তে পারেন। সেই যে না-পড়া সেটাই লেখকের পক্ষে মারাত্মক। পাঠকরা যদি অমনোযোগী বা অসহযোগী হন তা হলে লেখকের উৎসাহ নিবে যায় ও তিনি পাঠকের সঙ্গে সন্ধি করতে উদ্যোগী হন। এমন লেখক নেই যিনি পাঠকদের বিতৃষ্ণাকে ভয় না করেন।

তবে এমন লেখকও আছেন যিনি বিশ্বাস করেন যে তাঁর বক্তব্য অবিকৃতভাবে ব্যক্ত করে যাওয়াই তাঁর কর্তব্য। এ যুগে কেউ কান না দিলেও পরবর্তী যুগে দিতে পারেন। লেখা তো কেবল আজকের জন্যেই নয়। কালকের জন্যেও। সেইজন্যে একালের পাঠকদের ওই যে মোক্ষম অস্ত্র তাতে তিনি ডরান না। অবশ্য তাঁর সাংসারিক ক্ষতি কিছু হয়। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির অঙ্গে আঁচড়টি লাগে না। যদি সত্যি তাঁর লেখায় সত্য থাকে, সৌন্দর্য থাকে।

সাধারণত আপত্তি যাঁরা করেন তাঁরা সত্যের দিক থেকে বা সৌন্দর্যের দিক থেকে করেন না। করেন শিবের দিক থেকে। অর্থাৎ সমাজের মঙ্গলের দিক থেকে। বহুজনের হিতের দিক থেকে। তাঁদের কেবলই ভয় আগুন লেগে কারও ঘর না পুড়ে যায়। কারও মাথা না বিগড়ে যায়। কিন্তু বাইবেল বা *পুরাণ* পড়েও কি কারও অধঃপতন ঘটে না? ঘটতে পারে না? আমার হাতের কাছে রয়েছে স্বর্গীয় সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের *পৌরাণিক অভিযান* আর স্মিথ রচিত *স্মলার ক্ল্যাসিকাল ডিকশনারি*। গ্রিক ও রোমক পুরাণের নির্যাস। দেব-দেবী, বীর-বীরাঙ্গনা, ঋষি-ঋষিপত্নী, রাজা-রানি, গন্ধর্ব অপ্সরা প্রভৃতি বিচিত্র চরিত্রচিত্র। তার মধ্যে ভালো-মন্দ দুই-ই আছে। মন্দকে বাদ দিয়ে ভালোটুকু পরিবেশন করা যেত নিশ্চয়, কিন্তু প্রাচীন কবিরা সেযুক্তি গ্রাহ্য করেননি। সেইজন্যে চরিত্রগুলি এমন জীবন্ত হয়েছে। কোনো একটি মানুষ নির্জলা মন্দও নয়, নিপাট ভালোও নয়। দেহ যখন আছে তখন দেহের আনুষঙ্গিক রিপুগুলোও আছে। তাদের বাদ দিয়ে শুদ্ধি ঘটানো যেন জীবনকে বাদ দিয়ে মৃত্যু ঘটানো।

সরকার বা স্মিথ তেমন শুদ্ধিকর্ম করতে যাননি। *পুরাণ*কর্তারা তো শুদ্ধিকর্মের কথা ভাবতেই পারেননি। *ইন্দ্র*, *চন্দ্র*, বৃহস্পতি, তারা, কেউ মৃত নন। জীবিত প্রাণীর মতোই তাঁদের জীবনেও প্রবৃত্তির তাড়না এসেছে, তাঁরা নিবৃত্ত হননি, যা করে বসেছেন তা অকরণীয়। কিন্তু অকরণীয় বলেই কি অকথনীয়? অপ্রকাশনীয়? নইলে সমাজের অহিত হবে? বালক-বালিকারা উৎসন্ন যাবে? লোকের পাপে মতি হবে?

লোকের যেমন পাপে মতি হতে পারে, তেমনি পুণ্যে মতি হতেও পারে। কারণ মহত্ত্বের কথাও তো বিস্তর বর্ণিত হয়েছে। পাপ যারা করেছে পুণ্যও তারা করেছে। আস্ত একটা চরিত্র ভালো-মন্দ দুই করে। ভালোর দিকটা যদি কেউ আদৌ না দেখেন বা না দেখান তবে তাঁর সেই ত্রুটি তাঁর সৃষ্টির অঙ্গহানি ঘটাবে। শিল্পী বা সাহিত্যিক হয়ে থাকলে তিনি তাঁর সৃষ্টির অঙ্গহানি কখনো পছন্দ করবেন না। নিজের ত্রুটি নিজেই সংশোধন করবেন। তাঁর ভুল যদি কোনোদিন না শোধরান তবে বুঝতে হবে তাঁর দৃষ্টিটাই ভ্রান্ত। তাঁর অনাসৃষ্টি কোথায় তলিয়ে যাবে।

সোনার জহুরি

বাউলদের মুখে শোনা যায়—

কমলবনে কে আসিল সোনার জহুরি
নিকষে কষয়ে কমল আ মরি আ মরি!

জহুরিও ভালো, নিকষও ভালো, কিন্তু কমলের পক্ষে নয়, সোনার পক্ষে। এই সামান্য কথাটা মনে থাকলে সোনার সমঝদার যিনি, তিনি কমলের সমঝদার হতে রাজি হতেন না। কিন্তু কথাটা তাঁরও মনে থাকে না, যাঁদের চোখে সোনার দামই বেশি তাঁরাও মনে করিয়ে দেন না। তাই অনেকসময় সোনার জহুরি এসে কমল পরীক্ষা করেন।

নীতির বেলা বা আইনের বেলা বা সাংসারিক লাভ-লোকসানের বেলা যাঁর বিচার শিরোধার্য, রুচির বেলা তাঁর রায় হয়তো নির্ভরযোগ্য নয়। আবার রুচির বেলা যাঁর অভিমত নির্ভরযোগ্য তিনিও হয়তো শিল্পকর্মের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্যক অবগত নন।

বিধাতা আমাকে যেমনটি করে গড়েছেন আমি তেমনিটি। তার চেয়ে ভালোও নই, তার চেয়ে খারাপও নই। আমি যদি আমার প্রকৃতির প্রতি সত্য হয়ে থাকি তবে আমি যা হবার তাই হয়েছি। আমাকে আরও ভালো করতে গিয়ে অসত্য করে তোলা বিধাতার অভিপ্রায় নয়। তা যদি হত তবে তিনি আমাকে না গড়ে আরেক জনকে গড়লেই পারতেন। আমাকে যারা চায় তারা আমার স্বকীয়কেই চায়, আমার উত্তমকে নয়।

উপরে যা বলা গেল তা যেমন প্রত্যেকটি মানুষের ক্ষেত্রে খাটে তেমনি প্রত্যেকটি শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে। কাব্য যদি তার প্রকৃতির প্রতি সত্য হয়ে থাকে তবে যা হবার তাই হয়েছে। তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ হয়ে থাকে তবে সেযেমনটি হয়েছে তেমনিটিই ভালো। চিত্র বা নৃত্য সম্বন্ধেও সেই কথা।

এক-একটি সৃষ্টি এক-একটি বিশেষ রূপধারণ করে আসে। সঞ্চার করতে আসে এক-একটি বিশেষ রস। বিশেষেরও একটা মূল্য আছে। সেইজন্যেই তার এত আদর। আর-সব গুণ বাড়তি গুণ। নীতির দিক থেকে রুচির দিক থেকে অনবদ্য হলে সেটা হবে বাড়তি গুণ। আইনের দিক থেকে, বাজারের দিক থেকে মার না খেলে সেটাও হবে তেমনি বাড়তি গুণ।

কিন্তু যেখানে বিশেষ বলে কোনো রস বা রূপ নেই সেখানে ভালো বলে একটি গুণ তার জায়গা নিতে পারে না। নীতিবোধ যাকে ভালো বলে রসবোধ বা রূপবোধ হয়তো তাকে নিয়ে কিছু-একটা সৃষ্টি করতে অক্ষম হয়।

সাহিত্যে ইতিপূর্বে এত বেশি নীতিমূলক কাহিনি বা কাব্য লেখা হয়ে গেছে যে নীতির গন্ধ পেলেই একালের পাঠকরা দৌড় দেন। তেমনি রুচিতেও অরুচি ধরে গেছে অনেকের। গুছিয়ে লেখা দেখলেই সন্দেহ হয় যে বানিয়ে লেখা। বানিয়ে লেখার উপরেও অনেকে ক্ষিপ্ত। জীবন যদি মসৃণ না হয় তো সাহিত্য মসৃণ হবে কী করে! এলোমেলো এবড়োখেবড়ো রচনাই তাঁদের পছন্দ। চেতনার স্রোত বলা হয়ে যাকে তার গতি আঁকাবাঁকা উলটোপালটা মাথামুন্ডুহীন।

এমনি করে এসেছে অ্যাবসার্ড নাটক। সোনার জহুরিদের সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। হাজার চেষ্টা করেও সেনাটকের সংস্কার ঘটানো যায় না। তাকে আরও ভালো বা কম মন্দ করা অসম্ভব। নাটকের সঙ্গে ঝগড়া করে কী হবে! জীবনটাই অ্যাবসার্ড। তার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাও তো করো গে।

অ্যাবসার্ড নাটকের একটা বিশেষ রস আছে। সেইজন্যে তো সাহিত্যের ঘরের জিনিস। তার বিচার হবে সাহিত্যের নিজস্ব নিকষে। সেটা দিয়ে শুধু সাহিত্যের পরীক্ষা হয়, সোনার পরীক্ষা হয় না। জীবনের এক

এক বিভাগের জন্যে এক এক নিকষ আছে। নীতির নিকষ বিজ্ঞানের অচল। বিজ্ঞানের নিকষ সাহিত্যে অচল।

কোথাও হয়তো একটা সবতাল চাবি আছে, যা দিয়ে সব ক-টা তালা খোলা যায়। জীবন যদিও বহুধাবিভক্ত তবু মূলে তো এক। নিকষও তাহলে একটাই হবে না কেন? কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা সেই সবতাল চাবির সন্ধান পাইনি। ধর্মকেই এককালে সর্বক্ষেত্রে উপযোগী নিকষ মনে করা হত। ধর্মের জহুরিদের বিচারই ছিল শেষ বিচার। কিন্তু মানব-ইতিহাসের সেই স্বর্ণযুগ এখন বহু পশ্চাতে পড়ে আছে।

মাঝখানে ধর্মের স্থান নিতে চেষ্টা করেছিল নীতি। কিন্তু নীতির জহুরিরাও বিকল্প কিছু সৃষ্টি করতে বা করাতে পারেননি। নেতি নেতি বলে তৈরি জিনিসকে বাতিল করা এক, ইতি ইতি বলে নতুন জিনিস তৈরি করে তোলা আরেক। নীতির বিচারে যেটা নিখুঁত বলে গণ্য হল লোকে তার দিকে ফিরেও তাকাল না। দেখা গেল পাপের উপরেই তাদের পক্ষপাত, অবশ্য পাপের জন্য অনুতাপ বা শাস্তিবিধান থাকারও তারা পক্ষপাতী। পাপ জিতে যাবে এটা তো তারা চায় না। পাপও থাকবে, পাপের পরাজয়ও থাকবে। আর নয়তো পাপের থেকে পরিত্রাণ।

টলস্টয় ডস্টয়েভস্কির যুগ ছাড়িয়ে আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। পাপ দেখতে চাইলে যতখুশি দেখাতে পারি, কিন্তু পাপের জন্যে অনুতাপ বা শাস্তিবিধান বা তার থেকে পরিত্রাণ কি জীবনে দেখতে পাই যে সাহিত্যে দেখাব? সেভার জীবনবিধাতার উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো। তিনি হয়তো একভাবে না একভাবে শাস্তি দেন, আমরা খোঁজ রাখিনে। পরিত্রাণও ঘটে হয়তো। আমরা খবর পাইনে। বাধ্য হয়ে মানতে হয় সেই দর্শন, যে বলে পাপই পাপের পরিণাম পুণ্যই পুণ্যের পুরস্কার।

পাপ-পুণ্যের মাঝখানে অনেকগুলি স্তর। যেমন সাদা-কালোর মাঝখানে অনেকগুলি রং। আধুনিক শিল্পী চরমপন্থী নন, তিনি মধ্যপন্থী। তিনি সহসা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হন না। শেষটা অনির্দিষ্ট রেখে দেন। ‘মরাল’ ও ‘ইমমরাল’ ছাড়া আরও একটা কথা আছে। তাকে বলে ‘আমরাল’। আজকালকার আর্টে ‘আমরাল’ চারদিকে ছড়ানো। কিন্তু তাকেই লোকে ভুল করে ঠাওরায় ‘ইমমরাল’। কারণ বহুদিন থেকে লোকের সংস্কার যা ভালো নয় তা মন্দ। ও ছাড়া যে আরও একটা কথা আছে এটা তাদের সংস্কারবিরুদ্ধ।

সমাজে যেমন কতকগুলি জাতকে যুগ যুগ ধরে অস্পৃশ্য ও অশুচি বলে বর্জন করা হয়ে এসেছে, সাহিত্যেও তেমনি কতকগুলি বিষয়কে ও শব্দকে। এসব বিষয়ে লেখা যায় না, এসব কথা লেখনীর মুখে আনা যায় না। এরা অবদ্য, এরা অনুচ্চারণীয়।

বিংশ শতাব্দীর সমাজভাবনা স্বীকার করে না যে হরিজনরা মন্দিরে প্রবেশ করলে মন্দির অপবিত্র হবে বা বিগ্রহকে স্পর্শ করলে বিগ্রহ অপবিত্র হবে। ওরাও তো মানুষ। এ কেমন মন্দির যে মানুষের দ্বারা অপবিত্র হয়! এ কেমন দেবতা যে মানুষ এঁকে অপবিত্র করতে পারে! উলটে পবিত্র করার সাধ্য কি মন্দিরেরও নেই! দেবতারও নেই!

সাহিত্যেরও সেই একই জিজ্ঞাসা। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের সদর দরজা দিয়ে এমন সব বিষয় আর শব্দ নিত্য প্রবেশ করছে যারা খিড়কি দিয়ে অনুপ্রবেশ করতেও সাহস পেত না। এখন কেউ অপাঙক্তেয় বলে সরাসরি বহিষ্কারযোগ্য নয়। সমাজভাবনার মতো সাহিত্যভাবনাও আজকের দিনে আর আচারসর্বস্ব নয়, সেও বিচারসম্পন্ন। বিচারও আর কাজির বিচার নয়, ইতিমধ্যে অনেকরকম সূক্ষ্ম প্রশ্ন উঠেছে। কাজিরাও ততটা নিশ্চিন্ত নন, যতটা আগে ছিলেন। এক দেশের কাজির রায় আরেক দেশের কাজি মানতে চান না। এক যুগের কাজির রায় আরেক যুগের কাজি রদবদল করেন।

ভগবান কারও মুখ চেয়ে সৃষ্টি করেননি। ধ্বংসও যখন করেন তখন কারও মুখ চেয়ে নয়। শিল্পীরাও যে যার আপন সীমানার মধ্যে সৃষ্টি করে থাকেন। বিশ্বের এক-একটি প্রকোষ্ঠে শিল্পীরাও স্রষ্টা। তাঁরাও কারও মুখ চেয়ে সৃষ্টি করার পাত্র নন। যাঁর পছন্দ হবে না তিনি পড়বেন না বা দেখবেন না। কিন্তু সাধারণত পাঠকের বা দর্শকের অভাব হয় না। বরঞ্চ তাঁদের ঠেকিয়ে রাখবার জন্যেই বই বাজেয়াপ্ত বা নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু

আখেরে ঠেকিয়ে রাখা যায় কি? পড়বার মতো হলে লোকে পড়বেই, দেখবার মতো হলে দেখবেই। হয়তো তারপর ফেলে দেবে। কিন্তু পরের কথায় ফেলে দেবে না।

মুসলমানদের মধ্যে একটা কথা আছে—

মিয়া বিবি রাজি
কী করবে কাজি?

লেখক ও পাঠক যদি একমত হন তাহলে সমালোচক বা বিচারক বা সরকার কীই-বা করতে পারেন! মিয়া আর বিবি যেমন বিয়ে করতে চাইলে বিয়ে করেন লেখকও তেমনি লেখেন, পাঠকও তেমনি পড়েন; কারও জন্যে কিছু আটকায় না।

লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার এখন ইংরেজরা লাখে লাখে পড়ছে। বখে যাবার ভয় ভেঙে গেছে। ভয়টা যে অমূলক ছিল তা আমি বলব না। কমবয়সিরা সত্যি বখে যেতে পারত। এখনও পারে। ভবিষ্যতেও পারবে। কিন্তু তা বলে প্রাচীন মূর্তির গায়ে তো কেউ ঘেরাটোপ জড়িয়ে রাখে না। সমাজকে ভয় অতিক্রমণের শক্তি অর্জন করতে হয়। এটা রসের খাতিরে, রূপের খাতিরে। নয়তো কোণার্ক বা খাজুরাহো আর কখনো গড়া হবে না।

লেডি চ্যাটার্লির কথাই ধরা যাক। ওর সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, ও-বই লেখার সত্যি কি কোনো দরকার ছিল? দরকার ছিল মেনে নিলে দ্বিতীয় প্রশ্ন ওঠে, ওভাবে না লিখে কি অন্যভাবে লেখা যেত না? ও-ভাষায় না লিখে অন্য ভাষায়? ওই যে প্রশ্ন দুটি ওদের উত্তর দিতে পারতেন একমাত্র লরেন্স। তাঁর অবর্তমানে দিতে পারেন লরেন্সের পক্ষপাতী পাঠক, যদি পাঠকদের পাঠ করার সুযোগ দেওয়া হয়। সুযোগ পাবার পর ইংল্যাণ্ডের পাঠকদের ব্যবহার দেখে মনে হয় তাঁরা প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, 'হ্যাঁ' আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে 'না।'

যেকোনো সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে ওই দুটি প্রশ্নই সত্যিকার প্রশ্ন। বিচারকরা যদি বিচারকের আসনে না বসে পাঠকের স্থানে বসেন তাহলে তাঁদের সেই পাঠকসত্তাই সত্যিকার উত্তর দেবে। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় তাঁরা সমাজের মুখ চেয়ে নীতিবোধের নিকষ হাতে নিয়ে রুচিবোধের দ্বারা চালিত হয়ে বিচার করেন। চূড়ান্ত মীমাংসার ভার কিন্তু কাজির উপর নয়, বিবির উপর। রসিকের উপর।

আর্টের উদ্দেশ্য

আর্টের উদ্দেশ্য কী?

এর পালটা প্রশ্ন, প্রকৃতির উদ্দেশ্য কী?

একমাত্র প্রকৃতির সঙ্গেই আর্টের প্রতিতুলনা। আর্টের কথা ভাবলে নেচারের কথা মনে আসে। আবার নেচারের কথা ভাবলে আর্টের কথা। মানুষ বলে আরেক জন না থাকলে প্রকৃতি একাই থাকত। এটা হত একমাত্র প্রকৃতির জগৎ। মানুষ এসেছে তার সৃষ্টির অমিত শক্তি নিয়ে। প্রকৃতির মতোই সেঅকৃপণ ও সর্বক্ষণ সক্রিয়। এটা তাই মানুষেরও জগৎ।

কিন্তু মানুষ যদি শ্রান্ত হয়ে ক্ষান্তি দেয় তাহলে আর মানুষেরও জগৎ বলে কিছু থাকবে না। থাকবে শুধু প্রকৃতির জগৎ। প্রকৃতির শ্রান্তি নেই, ক্ষান্তি নেই। মানুষ যদি প্রকৃতির কাছ থেকে প্রকৃতিরই মতো অশ্রান্ত অক্ষান্ত থাকার রহস্যটি আয়ত্ত করতে পারে তাহলে মানুষেরও শ্রান্তি নেই, ক্ষান্তি নেই। সেও অনন্তকাল সৃষ্টি করে যেতে পারবে।

প্রায় প্রত্যেক যুগসন্ধিতে একবার করে প্রকৃতির কাছে ফিরে চলার রব ওঠে। কিন্তু সভ্যতা মানুষকে এমন আষ্টেপৃষ্টে বেঁধেছে যে প্রকৃতির সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে নেবার সাধ্য তার ক্ষীণ। আরও প্রাকৃতিক না হয়ে সেতাই আরও সভ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সেটা যে আর্টের দিক থেকেও অগ্রগতি তা নয়। কারণ আর্টের দিক থেকে সেহয়তো ক্লান্ত বা নি:শেষিত। তখন তার নূতনত্ব সাধারণত পদ্ধতির বা ঘটনার। আর নয়তো বিকৃতির।

প্রকৃতির থেকে দূরে সরে গেলে আর্ট তার উদ্দেশ্য থেকেও দূরে সরে যায়। তখন আর্ট হয় উদ্দেশ্যহীন কেরামতি। প্রকৃতি তো কোনোদিন কেরামতির চেষ্টা করে না। প্রকৃতির রাজ্যে কেরামতি বলে কিছু নেই। প্রকৃতির সমস্তটাই লীলা। প্রকৃতির উদ্দেশ্য ওই এককথায় বলা যায়—লীলা।

তেমনি আর্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে লীলা।

যেকোনো একটি খেলার মতো তার নিয়মকানুন খুব কড়া। সেসব মেনে না নিলে খেলা জমে না। কিন্তু খেলার শেষে বোঝা যায় তার সার্থকতা আছে। খেলোয়াড়রা খেলায় সুখ পান নিয়মকানুন মেনে ও তার ঊর্ধ্বে উঠে। তেমনি লীলারও নিয়মকানুন আছে। সেসবও কম কড়া নয়। যদিও অনেক সময় আমরা না জেনেই মেনে চলি। লিখতে লিখতে লেখা আপনি নিখুঁত হয়।

লীলা তখনই সার্থক হয় যখন সৃষ্টি একটি পরিপূর্ণতায় এসে পৌঁছোয়। হয়তো চার লাইনের একটি কবিতা। চৌপদী যার নাম। জাপানি হাইকুর মতো সতেরো সিলেবলও হতে পারে। নির্দিষ্ট একটি সীমার মধ্যেই তার পরিপূর্ণতা। তার সেই সীমা মেনে নিয়ে সেযখন পরিপূর্ণতা পায় তখন তার আকৃতি তাকে আর্ট বলে চিনিয়ে দেয়। আকৃতি বিনা আর্ট নেই। আর্ট বিনা আকৃতি নেই।

আর্টের একদিকে যেমন প্রকৃতি আরেক দিকে তেমনি আকৃতি। প্রকৃতির প্রত্যেকটি সৃষ্টির নিজের একটি আকৃতি আছে। প্রকৃতি যত খুশি সৃষ্টি করে চললেও প্রত্যেকের জন্যে আলাদা একটা আকৃতি বরাদ্দ করতে ভোলে না। তেমনি শিল্পীরাও তাঁদের সৃষ্টির প্রত্যেকটি আকৃতি সম্বন্ধে সচেতন। কোনো সৃষ্টিই নিরবয়ব বা নিরাকার নয়। কিন্তু তা-ই যথেষ্ট নয়। আকারের সঙ্গে থাকবে আকৃতি।

নৈসর্গিক কবিপ্রতিভা সকলের নেই। কিন্তু আকৃতিজ্ঞান যেমন করে হোক অর্জন করতে হবে। নানা দেশের নানা যুগের সেরা কবিতা পড়তে পড়তে শুনতে শুনতে এ জ্ঞান জন্মাতে পারে। তেমনি ছবি দেখতে দেখতে চিত্রকরসুলভ আকৃতিজ্ঞান। গান শুনতে শুনতে সংগীত সম্পর্কিত আকৃতিজ্ঞান। মানুষকে জন্মসূত্রে যা দেওয়া

হয়েছে তার অভাব যদি কারও জীবনে দেখা যায় তবে তার অভাব পূরণ করে শিক্ষা। এইজন্যে শিক্ষার এত মূল্য। যারা জাতশিল্পী তাদেরও শিক্ষার দরকার হয়। ঐতিহ্য তো পড়ে পাওয়া যায় না। বড়ো বড়ো প্রতিভাকেও হাতেকলমে পূর্বসূরিদের কাছে শিখতে হয়।

ধারাবাহিকতা যেমন প্রকৃতির বেলা তেমনি আর্টের বেলাও সত্য। বহতা নদীর মতো এর আদি নেই অন্ত নেই। আছে শুধু ধারা। তোমার ইচ্ছা হলে তুমি ধারাভঙ্গ করতে পারো, কিন্তু তা হলেও একটি নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়। আর সে-ধারাকে আলাদা করে দেখলেও সেএকেবারে নি:সম্পর্কীয় নয়। যার থেকে সেপৃথক তার ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্র কোথাও এক জায়গায় রয়েছেই। শাখা অসংখ্য হলেও মূলস্রোত একই। ধারাভঙ্গ বার বার ঘটলেও ধারাবাহিকতা গঙ্গোত্রীর সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করে। ঐতিহ্য যেখানে হারিয়ে গেছে সেখানেও তার সঙ্গে সংযোগ ফিরে পাবার জন্য প্রাচীনের পুনরুদ্ধার করতে হয়।

কিন্তু পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে পুনরাবৃত্তি নয়। স্বদেশি আন্দোলনের দিনে যখন আমরা ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে নতুন করে সজাগ হই তখন অজন্তার সঙ্গে জোড় মিলিয়ে নেবার দরকার ছিল। কিন্তু পৌরাণিকের পুনরাবৃত্তি দু-দিনেই নি:শেষ হতে বাধ্য। কারণ স্বযুগটা পৌরাণিক নয়। ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের পরে আর পুনরাবৃত্তি নয়। নব নব কল্পনা ও নব নব আকৃতি আমাদের ঐশ্বর্যের পরিচায়ক।

দেশের মতো যুগেরও একটা মূলস্রোত আছে। তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে শুধুমাত্র দেশের ধারা বেশিদিন বিচিত্র থাকে না। ঊনবিংশ শতাব্দী আমাদের কবিদের গঙ্গাস্নানে অভ্যস্ত জীবনকে সমুদ্রস্নান করায়। সমুদ্রের জোয়ার ছুটে আসে গঙ্গার বুকে। তার ফলে যা ঘটে তার নাম আমাদের সাহিত্যের রেনেসাঁস। প্রয়াগের বা হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় বার বার গঙ্গাবগাহন করেও এ ফল লাভ হত না। আমাদের অনেকেই এ সত্য ইতিমধ্যে ভুলে গেছেন। কুম্ভমেলার সহস্র সহস্র বর্ষের পুনরাবৃত্তি পরম বিস্ময়ের বিষয় হলেও সমুদ্রের একদিনের একটা জোয়ার তার চেয়েও ফলপ্রসূ। তবে ফলপ্রসূ বলতে যাঁরা পরকালে বা পরলোকে ফলপ্রসূ বোঝেন তাঁদের কাছে এ যুক্তি নিষ্ফল।

এ যুগে বাস করলে এ যুগের মূলস্রোতে অবগাহন করতে হয়। সেই মূলস্রোত যদি জোয়ার হয়ে এদেশের নদীতে প্রবেশ করে তবে তা যদিও উলটো স্রোত তবু তার সঙ্গে স্বদেশের বহমান স্রোতকে মিলিয়ে নিতে হবে। এটা একপ্রকার সংস্কৃতি বিপ্লব। সারা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে এর সঙ্গে যোঝাযুঝি ও বোঝাবুঝি চলছে। বিংশ শতাব্দীতেও তার শেষ নিষ্পত্তি হয়নি। লক্ষণ দেখে মনে হয় সমুদ্র আমাদের পর আর গঙ্গা আমাদের আপনার; এই সংস্কার এখনও একান্ত প্রবল। রেনেসাঁস যদি ভঙ্গিসর্বস্ব হয় তবে তার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে বলতে হবে।

রেনেসাঁস হচ্ছে নতুন প্রাণশক্তির উত্তাল তরঙ্গ। তার রঙ্গ জীবনের অন্যান্য বিভাগের মতো আর্টকেও আন্দোলিত করে। যে তরুণী এতদিন নদীর জলে পাল তুলে ভেসেছিল সেএখন সমুদ্রের জলে দিশাহারা বোধ করে। মাথার উপরে ধ্রুবতারা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। হাতের কাছে থাকে কম্পাস। আকাশ যখন মেঘে ঢাকা তখনও তার দিকনির্ণয়ের ভুল হয় না। ঝড়ঝাপটায় কম্পাসও ভেঙে যেতে পারে। সে-সময় তাকে বাঁচাবে কে! সেইটেই বিংশ শতকের মধ্যভাগে যুদ্ধবিগ্রহের ও রাষ্ট্রবিপ্লবের মুখে পড়া তরুণীর প্রশ্ন। এ প্রশ্নে ইউরোপই এখন জর্জরিত। জীবন যদি লন্ডভন্ড হয় আর্ট কী করে আপনাকে নিয়ে আত্মসমাহিতভাবে বাঁচবে?

কবিদের কাছে জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা আসছে। তাঁদের নিজেদেরও জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা জমছে। এসব জিজ্ঞাসার উত্তর হোমর বাল্মীকি ভার্জিল কালিদাসের দিকে তাকালে পাওয়া যাবে না। ক্লাসিক এখানে নিরুত্তর। রেনেসাঁস যতগুলো ঢেউ তুলেছে ততগুলো ঢেউ ভাঙতে বা ঢেউয়ের পিঠে চড়তে শেখায়নি। সাহিত্য আজকাল সমস্যার অবতারণা করে, সমাধান বলে দেয় না—বলতে পারে না। সমাধানের জন্যে দ্বারস্থ হলে পাশ কাটিয়ে যায়। বলে, 'একালের সাহিত্য *বেদ বাইবেল কোরান* তো নয়ই, কার্ল মার্কসের *ডাস*

ক্যাপিটাল বা মাও-সে-তুং এর চিন্তাও নয়। কী জবাব দেবে? জবাব জানা থাকলে তো? আজকের যেটা দেবে কালকেই সেটা বাসি হয়ে যাবে। কাল যে কী ঘটবে কেউ তা বলতে পারে না। আমরা দিন আনি দিন খাই।'

কতক লোক যে ধর্মের শরণ নেবে এটা অস্বাভাবিক নয়, এটাই বরং স্বাভাবিক। তেমনি সংঘের শরণ নেওয়া, তা সেযেকোনো সংঘই হোক। বুদ্ধের স্থান নিয়েছেন রাজনীতির গণনায়করা। তাঁদের কাছেও লোকে শরণ পায়। কিন্তু আর্ট বা সাহিত্য কাউকে শরণ দিতে অক্ষম। ওই যে অক্ষমতা ওটা ইচ্ছাকৃত নয়। ধ্রুবতারা অদৃশ্য হলে, কম্পাস অচল হলে তরণী নিজেই দিশাহারা।

তা হলেও কেবল ভেসে বেড়ানো চলবে না। আপনার ভিতর থেকেই প্রত্যয় সংগ্রহ করতে হবে। আর্টের কাছে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর মিলবে না সেকথা ঠিক। কিন্তু আর্ট কেন মিথ্যার ব্যাপারী হবে? আর্টের কাজ সত্যের কাছে সত্যরক্ষা। আমার জীবনের যা সত্য, আমার যা সত্য, তাই আমার হাতে রূপ পাবে। কারও ভয়ে আমি যেন তাকে চেপে না রাখি বা অন্যরকম না করি।

সংকট যতই ঘনিয়ে আসুক-না কেন কবি বলে কেউ যদি বেঁচে থাকেন ও লেখনী তুলে ধরা যদি অসম্ভব না হয় তবে সত্যের কাছে সত্যরক্ষাই তাঁর কাজ। সেইভাবে কাব্যের মধুচক্রে যা জমবার তা জমবে। লোকে একদিন তার আস্বাদন নেবে, কিন্তু সদ্য সদ্য কোনো দুরূহ প্রশ্নের উত্তর পাবে কি না সন্দেহ।

সভ্যতা দিন দিন যেমন জটিল হচ্ছে তাকে সরল করে আনার কোনো উপায় যদি না থাকে তবে আর্ট তাকে কারও কাছে সরল করতে পারবে না। সরল করতে হলে বাদসাদ দিতে হয়, পরিহার করতে হয়। পপুলার সায়েন্সের মতো পপুলার আর্ট সৃষ্টি করতে হয়। তেমন করে আর্ট অগ্রসর হবে না।

যেটুকু আমার কাছে উপলব্ধ সত্য সেইটুকুতেই আমার অধিকার। আর্টের অতি সামান্য ভগ্নাংশ হলেও সত্যের দিক থেকে তা নিটোল। তেমনি রূপের দিক থেকেও নিখুঁত। হয়তো এক ফোঁটা চোখের জল, তবু আর্টের মধুচক্রে তারও ঠাঁই আছে। কোনো জিজ্ঞাসার উত্তর না হয়েও সেস্বত্ববান। সেঅস্তিত্ববান।

লীলা যাকে বলি তা এই অস্তিত্বের মধ্যে আপনাকে খুঁজে পাওয়া ও ধরে দেওয়া। কার কোন কাজে লাগবে জানিনে, তবে এ না হলে আমি বাঁচিনে। আর্ট আমাকে বাঁচায়।

আর্টের খাতিরে আর্ট

'আর্টের খাতিরে আর্ট' বলি যখন, তখন এই কথাটাই বোঝাতে চাই যে আর্ট নয় সামাজিক বা আধ্যাত্মিক বা নৈতিক বা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের উপায়। আর্ট হচ্ছে আপনি আপনার উদ্দেশ্য। আপনি আপনার উপায়।

এখানে সমাজ বা ধর্ম বা নীতি বা রাজনীতি বা অর্থনীতির গুরুত্ব অস্বীকার করা হচ্ছে না। এর কোনো একটিকে বাদ দিলে বা খাটো করলে সভ্যতা হয় না। কোনো একটির অভাব আর একটিকে দিয়ে পূরণ হয় না। মানবিক পরিপূর্ণতার শতদল প্রত্যেকটি দলের উন্মীলন চায়। তা বলে কোনো একটিকে আর-সকলের বা আর একটির উপায় করতে চাইবে কেন? সেও যে একপ্রকার খাটো করা।

আর্ট যদি অপরের বাঁক কাঁধে করে তবে তার নিজের বাঁকটি কাঁধে তুলে নেবে কে? অপরের বাঁক বইতে গিয়ে যদি তার কাঁধ বেঁকে যায় তবে তার গতি হবে কী করে? যাঁরা আর্টের উপর রাজ্যের দায় চাপাতে চান, তারা কি মনে করেন যে রসের দায় বা রূপের দায় বলে আর কোনো দায় নেই, থাকলে তার কোনো গুরুত্ব নেই?

অথচ দু-তিন হাজার বছর পরেও যা বেঁচে থাকে তা ওই আর্ট। তাই নিয়ে সভ্যতার গর্ব। বিংশ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থার বা তার ওলটপালটের গুরুত্ব ত্রিংশ শতাব্দীর লোক উপলব্ধি করবে না। কিন্তু চিত্রকলার বা সাহিত্যের গুরুত্ব যদি থাকে তবে তার দিকে দু-দন্ড ফিরে তাকাবে। সভ্যতারও নিরিখ হবে তাই।

এমন যে আর্ট তাকে অন্য কিছুর উপায়ে পরিণত করা হয়তো মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় দেয়, কিন্তু আর্টের নিজস্ব দায়কে খাটো করে। রসের দায় বা রূপের দায়কে লঘু করলে তার যথোচিত অনুশীলন হয় না। ফলে কীর্তি খর্ব হয়। আর্টকে তার রাজকীয় খাজনা দিয়ে হাতে যদি কিছু বাঁচে তবে সমাজকে বা ধর্মকে দিতে পারো, কিন্তু তার রাজমহিমা না মেনে তাকে দিয়ে ধর্মের বা সমাজের কর্ম করিয়ে নিলে তার রাজকোষে পড়বেই। শিল্পীর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তাকে দিয়ে একশোরকম কাজ করিয়ে নেওয়া যায়, যা প্রকৃতপক্ষে শিল্পের কাজ নয়। কিন্তু শিল্পী অসহায় হলেও শিল্প অসহায় নয়। শিল্প তার মর্যাদা দাবি করবেই, না পেলে তার অভাববোধ করিয়ে ছাড়বেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ঘুরে যাবে, স্মরণযোগ্য বা সংরক্ষণযোগ্য কিছু সৃষ্টি হবে না।

তা বলে কি আর্ট নি:সম্পর্কীয়? তার তিনকুলে কেউ নেই? না, সেবিচ্ছিন্ন বা নি:সঙ্গ নয়। জীবনের বিভিন্ন ও বিচিত্র বিভাগের সঙ্গে তার নিবিড় ও সানুরাগ সম্বন্ধ। *মহাভারত* এর মহত্তম দৃষ্টান্ত। যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে। কুরুক্ষেত্রের যুগের সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, রণনীতি প্রভৃতি সমস্তই রয়েছে মহাভারতে। যৌননীতিও। *মহাভারত*কারের দৃষ্টি সর্বব্যাপী ও সর্বত্র প্রবিষ্ট। কিন্তু তিনি মহাকাব্য বা মহান উপন্যাস রচনা করতে বসেছিলেন। দর্শন বা সমাজতত্ত্ব, ধর্মশাস্ত্র বা নীতিশাস্ত্র নয়। যৌনবিজ্ঞান বা যুদ্ধবিদ্যাও নয়। রাজনীতি তো নয়ই। আর্ট সবাইকে ঠাঁই দেয়, তবু সকলের ঊর্ধ্বে থাকে।

এর থেকে যেন এমন ধারণা কারও না জন্মায় যে জীবনের সমস্ত বিভাগ সম্বন্ধে অবহিত ও সংবেদনশীল হওয়া সকল শিল্পকর্মের আদর্শ। না, মহাভারতের আদর্শই একমাত্র আদর্শ নয়। রামায়ণে এতরকম এত কথা কই? আসলে মহাভারতের কোনো জুড়ি নেই। আড়াই হাজার বছর পরেও সেএকাই একশো। আড়াই হাজার বছরে জীবনের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা বাড়তে বাড়তে এমন বিপুল হয়েছে যে এখন আর মহাভারতের আয়তনেও কুলোবে না। যদি-বা লেখকের আয়ত্তে কুলোয়। যেটা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে নয় সেটা আমাদের আদর্শও নয়।

আদর্শ হচ্ছে আর্টের স্বকীয় দায় বহন করে জীবনের আর দশটা বিভাগের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ও জীবনের সমগ্রতার সঙ্গে পা মিলিয়ে নেওয়া। সব কিছু না দেখেও সব কিছু না চেখেও সমগ্রতার একটা মোটামুটি বোধ যদি থাকে তা হলেই হল। যেমন শেক্সপিয়রের বেলা। গ্যেটের বেলা। টলস্টয়ের বেলা।

এটাও কিছু কম কঠিন নয়। সেইজন্যে শিল্পী মাত্রেরই উপর শিল্প-সরস্বতীর তেমন কোনো বরাত নেই। যার পক্ষে যেটা সম্ভব, যতটা সম্ভব, তার পক্ষে সেটাই ও ততটাই যথেষ্ট। তার সৃষ্টি যদি সমগ্রের সঙ্গে না মেলে তবু একাংশের সঙ্গে মিলবে। সিন্ধুর সঙ্গে না মিলুক, শিশিরবিন্দুর সঙ্গেই মিলুক। তার পক্ষে ভান্ডই ব্রহ্মান্ড। চীন দেশের এক বিশিষ্ট শিল্পী শুনেছি শুধু চিংড়ি মাছই আঁকেন। আর তাঁর আঁকা চিংড়ি মাছ রসিকজনের কাছে মহামূল্য। জাপানের এক কবির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তিনি শুধু ব্যাং নিয়ে কবিতা লেখেন। মানুষও তাঁর চোখে ব্যাং ছাড়া কিছু নয়। এরও কি মূল্য নেই? আপাতদৃষ্টিতে যা তুচ্ছ শিল্পীর দৃষ্টিতে তাই হচ্ছে বৃহত্তর সত্যের প্রতীক। তুচ্ছই হোক আর মহৎই হোক প্রত্যেক শিল্পীকে তার সত্য বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিতে হবে। কার হাতে কোনটা কেমন ওতরায় তাই দিয়েই বিচার হবে। মহৎ বিষয়ে লিখলেই যে লেখা স্মরণীয় বা শাশ্বত হবে তা নয়। উচ্ছে দিয়েও উচ্চাঙ্গের সুক্তো হয়, তুচ্ছ দিয়েও উচ্চাঙ্গের নকশা হয়। দেশে-বিদেশে অসংখ্য ছড়া মুখে মুখে তৈরি হয়েছে, বেঁচে আছেও অনেকগুলি। ব্যালাড বা চারণগাথা না থাকলে সাহিত্যের একটা দিকই থাকে না। সাহিত্য কানা হয়ে যায় যদি হাস্যকৌতুক বা অশ্লীলতাপূর্ণ তামাশা বাদ যায়।

'আর্টের খাতিরে আর্ট' যদিও বলি, তবু একথা স্বীকার করি যে আর্টের ফল সুদূরপ্রসারী। তার প্রত্যক্ষ ফল রূপভোগ ও রসভোগ, কিন্তু পরোক্ষ ফল এমন সব পরিবর্তন যা সমাজনায়ক বা রাষ্ট্রনায়কদের স্বপ্ন। কথাটা যতদূর মনে পড়ে শেলির— 'কবিরা হচ্ছেন মানবজাতির অপরিজ্ঞাত বিধানদাতা।' হাতের কাছেই বঙ্কিমচন্দ্রের উদাহরণ রয়েছে। তাঁর 'বন্দে মাতরম' গান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে রচিত হয়নি, তা সত্ত্বেও তার দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন উদবুদ্ধ হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা নিকটতর হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য আমাদের অনেকের জীবনধারা বদলে দিয়েছে। শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন পড়ে একটি তরুণীর চৈতন্য হয়, সেইরাত্রেই তার কুলত্যাগের কথা ছিল।

অবশ্য এর বিপরীতটাও সত্য। উপন্যাস পড়ে বহু লোকের মাথা ঘুরে গেছে। তারা কাল্পনিক জগতে বিহার করতে গিয়ে বাস্তব জগতে হোঁচট খেয়েছে। এসব দেখেশুনে সমাজকর্তারা গল্প উপন্যাসের উপর খড়্গহস্ত হয়েছেন। তার মুখে বল্গা পরিয়েছেন। সেযাতে অহিত করতে না পারে তার জন্য তাকে খাসি বানিয়েছেন। সমাজের হিত হয়েছে হয়তো, কিন্তু সৃষ্টি নিষ্ফলা হয়েছে।

লেখক অনেকসময় জানে না সেকীসের জনক। কে তার জাতক। জাতকটি ভালো না মন্দ। মনোহর না ভয়ংকর। আমাদের ছেলেবেলায় প্রায়ই শোনা যেত যে জার্মান যুদ্ধের জন্যে দায়ী নিটশে। তিনিই সেই জাতকটির জনক। বেঁচে থাকলে ও সজ্ঞানে থাকলে তিনি হয়তো তার পিতৃত্ব অস্বীকার করতেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সাহিত্যকে বা দর্শনকে যুদ্ধের দিনে প্রেরণার্থে ব্যবহার করা হয়। যারা প্রচারকার্যের জন্যে লেখেননি তাঁদের রচনাকেও প্রচারের বাহন করে তার থেকে ফল আদায় করা হয়। দীর্ঘকাল যে বই ফলপ্রদ হয়নি, যার পাঠকসংখ্যা মুষ্টিমেয়, হঠাৎ তার উপরে নজর পড়ে। জাতকের জনক ঠাওরানো হয় তাকেই।

'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' যেমন একালের মানুষের অসহ্য তেমনি অসহ্য 'ফলার্থে ক্রিয়তে কাব্য'। পুত্রার্থের জায়গায় আমরা বসিয়ে দিই প্রেমার্থে। কিন্তু পুত্রকন্যা কি হয় না? না হলেই আশ্চর্য হতে হয়। প্রণয়লীলা যদিও প্রণয়লীলার জন্যেই তবু তার মধ্যে বংশরক্ষার সম্ভাব্যতাও থাকে। তেমনি কাব্যকেলির মধ্যেও থাকে সামাজিক বা ঐতিহাসিক ঘটনার সম্ভাব্যতা। যদিও কাব্যকেলি হচ্ছে কাব্যকেলির জন্যেই। যেখানে তেমন কোনো সম্ভাব্যতা নেই সেখানে বন্ধ্যাত্বের অনুযোগ উঠলে বিস্মিত হবার কী আছে? আর্ট যদিও আর্টের খাতিরেই সৃষ্টি হয় তবু সেই সৃষ্টির ভিতরে হয়তো একটা অরণ্য আত্মগোপন করে থাকে। উপযুক্ত দিনক্ষণ

এলে আবির্ভূত হয়। ততদিনে জনকের পঞ্চত্বলাভ হয়েছে। জাতকের আগমনের আভাসও পায়নি সে। কিংবা জীবিত থাকলেও তার পক্ষে কবুল করা শক্ত যে ওরকম কিছু তার কল্পনায় ছিল। যা ঘটে তা সকলের সব কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায়।

কখনো কখনো মনে হয় সৃষ্টির প্রেরণা কোন অনাদি উৎস থেকে আসে। কবিরা বা শিল্পীরা নিমিত্তমাত্র। প্রেমের প্রেরণার মতো আর্টের প্রেরণাও ব্যক্তির ভিতর দিয়ে কাজ করলেও নিখিল বিশ্বের আভ্যন্তরিক রহস্য। আমরা যারা লিখি তারা যেন স্বাধীন হয়েও স্বাধীন নই, কোনো এক বৃহত্তর সত্তার অধীন। সেতার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আমাদের এনেছে, আমাদের দিয়েছে, আমাদের কাছ থেকে নিচ্ছে, আমাদের বিদায় দেবে। যেটা থাকবে সেটার উপর আমাদের নামাঙ্কন থাকলেও সেটা আমাদের নয়, সেটা তার। নামাঙ্কন যে থাকবেই তেমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। রাজশাহি জেলার পথেঘাটে প্রাচীন শিলামূর্তি ছড়ানো দেখেছি। কেউ বলতে পারে না কার হাতে গড়া। হাজার বছর বয়স।

মহাকালের সোনার তরি ফসল তুলে নিয়ে চলে যায়, যার ফসল তাকে তুলে নেয় না। তার ফসলটাই আসল। সেআসল নয়। কেনই-বা তার নাম থাকবে! যদি থাকে তবে এমন অদৃশ্যভাবে থাকবে যে সহজে কারও চোখে পড়বে না। যেটা সৃষ্টি করা গেল বা আমাদের হাত দিয়ে সৃষ্ট হয়ে উঠল তার পরমায়ু যদি আমাদের পরমায়ুর থেকে বেশি হয় তা হলেই আমরা ধন্য। তাও যে সবসময় হয় না। সাধারণত যে বছরের ফসল সেই বছরই ভোগ হয়ে যায়। ক-খানা বই বিশ-ত্রিশ বছর সমান আনন্দ দেয়?

‘আর্টের খাতিরে আর্ট’ যখন বলি, তখন একথা মনে করেই বলি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা ক্ষণিক বা তাৎক্ষণিক তার উপরে সামাজিক বা নৈতিক দায়িত্বের গুরুভার চাপিয়ে দিয়ো না। ভারাক্রান্ত হলে সেযেটুকু আনন্দ দিতে পারত সেটুকু দিতে পারবে না। জীবনে অন্তত একটি বার তাকে গলা ছেড়ে গাইতে দাও। হয়তো একখানা গানই সেগাইতে এসেছে, গেয়ে বিদায় নেবে। যাবার সময় অনুরণন রেখে যাবে। হয়তো একটি ছোটো কবিতাই তার দেবার। হয়তো দুটি সার্থক পঙক্তি। *মহাভারত* বা *রামায়ণ* রচনা সকলের সাধ্য নয়। অথচ আর্ট যদি লঘুভার হয় তবে তা সকলের সাধ্য। তেমনি করে লোকসাহিত্য হয়েছে, লোকসংগীত হয়েছে। সকলের অন্তরে যে রূপকার ও রসিক রয়েছে তাকে যদি অন্তত একটি বার সৃষ্টির সুযোগ দিতে হয় তবে সেটা হোক সৃষ্টির খাতিরে সৃষ্টি।

বিশুদ্ধ আর্ট

ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে জল ফুটিয়ে খাওয়া হত না। স্বাস্থ্যরক্ষার বই পড়ে বাবাকে যখন বলি যে বিশুদ্ধ জল খেতে হলে ফুটিয়ে খেতে হয় তিনি ওকথা হেসে উড়িয়ে দেন। ফুটিয়ে খেলে কি জলের স্বাদ থাকে? যে জিনিসের যা স্বাদ।

কথাটা সত্যি। আমাদের কুয়োর জলে একটা প্রাণজুড়োনো স্বাদ ছিল। স্বাস্থ্যরক্ষার বই পড়ে ফুটিয়ে দেখি বিশুদ্ধ জল সেই বিশেষ কুয়োটির বিশেষ স্বাদে স্বাদু জল নয়। তা খেয়ে প্রাণ জুড়োয় না। বাড়িতে বিশুদ্ধ জলের প্রবর্তন সেইখানেই শেষ।

বড়ো হয়ে যখন সাহিত্যে আসি তখন বিশুদ্ধ জলের মতো বিশুদ্ধ আর্টের কথা শুনি। কথাটা মনে ধরে। তারপরে কত বার ওকথা শুনেছি ও বলেছি। কিন্তু বার বার লক্ষ করেছি প্রকৃতি যেমন বিশুদ্ধ জল বলে কিছু সৃষ্টি করেনি, করে থাকলে তার বিশুদ্ধি রক্ষা করতে পারেনি, যে জলই মুখে দেবে সেই জলই ধুলো কাদা ঝরা পাতা মেশানো অশুদ্ধ জল, মানুষও তেমনি বিশুদ্ধ আর্ট বলে কিছু সৃষ্টি করেনি, করে থাকলে তার বিশুদ্ধি রক্ষা করতে পারেনি, সেটাও একটা মিশ্র পদার্থ, সুতরাং অশুদ্ধ পদার্থ।

তারপর আরও লক্ষ করেছি যে আস্বাদনের দিক থেকে বিশুদ্ধের চেয়ে অশুদ্ধই শ্রেয়। শ্রেয় আর প্রেয় এ দুটির মধ্যে বেছে নিতে বললে অধিকাংশ সুজন প্রেয়কেই বরণ করবেন। কারণ তার একটা বিশেষ স্বাদ আছে, যা দিয়ে প্রাণ জুড়োয়।

তা ছাড়া শুদ্ধিকরণ ব্যাপারটাই বর্জনশীল। জলকে ফুটিয়ে খাওয়া মানে অনেকগুলি উপাদান বর্জন করে খাওয়া। উপাদানগুলির মধ্যে যেমন ব্যাধিবীজ লুকিয়ে থাকে তেমনি আরও কিছু থাকে যা স্বাস্থ্যপ্রদ ও হিতকর। একটা খারাপকে তাড়াতে গিয়ে তুমি একটা ভালোকেও তাড়ালে। তোমার শ্রেয়বুদ্ধি কি এই যুক্তি শুনে সন্তুষ্ট হয় যে, ভালো না থাকলেও ভালো, কিন্তু মন্দ থাকলেই মন্দ?

বাবা বোধ হয় আমাকে একথাও বুঝিয়েছিলেন যে কুয়োর জল ফুটিয়ে খেলে কতকগুলি উপাদান বাদ পড়ে, সেগুলি হিতকর। অসুখ যদি করে তাহলে কী হবে? এর উত্তরে বোধ হয় বলেছিলেন যে কুয়ো পরিষ্কার রাখতে হবে, ঘটি পরিষ্কার রাখতে হবে, গেলাস পরিষ্কার রাখতে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চয়ই দরকারি, কিন্তু বহিষ্কার তেমন অত্যাবশ্যক নয়।

বিশুদ্ধ আর্ট বলে যদি কোনো পদার্থ থাকে তবে বহিষ্কারনীতির আতিশয্য তাকে নীরক্ত ও নির্মাংস করে আস্বাদনের অযোগ্য করতে পারে। তখন সেই বর্জনশীলকে তার উপভোক্তারাই বর্জন করতে পারে। আর্টেও নীতি 'নেতি নেতি' নয়। আর্ট বরং বলে 'ইতি ইতি'।

সবরকম উপাদান নিয়েই আর্টের ঘরকন্না। কিন্তু কোন পদটি রাঁধতে গিয়ে কোন কোন উপাদান ব্যবহার করতে হবে সেটি তারই বিবেচনানির্ভর। কোনটার পরিমাণ কত হবে সেটাও তেমনি তারই বিবেচ্য। সমঝদার যাঁরা তাঁরা আস্বাদন করে তৃপ্ত হলেই সেকৃতার্থ। যদি কেউ মুখে না দেন, যদি পাতে পড়ে থাকে তবে আর রেঁধে কী সুখ! তা হলে অবশ্য সকলের স্বাস্থ্য ভালো থাকে, কারও অসুখবিসুখ করে না। অপঠিত গ্রন্থ বা অশ্রুত সংগীত যে কারও অহিত করতে পারে না এ তো স্বতঃসিদ্ধ।

আসলে বিশুদ্ধ আর্ট বলতে যা বোঝায় তা বর্জনশীল মনোভাবের ফসল নয়। বিশুদ্ধ আর্টের কথা তখনই ওঠে যখন আর্টের কাছে রকমারি প্রত্যাশা করা হয়। সেকালে যেমন ছিল ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়। পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি। একালে যেমন সমাজের পরিবর্তন বা বিপ্লব। রাজনৈতিক মতবাদের

প্রতিষ্ঠা বা প্রতিবাদ। প্রত্যাশার ফর্দ শুনে যখন উত্যক্ত হই তখন বলে উঠি, আমার হাত দিয়ে ওসব হবে না। আমার আরাধনার বস্তু বিশুদ্ধ আর্ট। আমার লক্ষ্য এস্থেটিক।

সাহিত্যিক বা চিত্রকরের লক্ষ্য যে এস্থেটিক হবে এটাও তো স্বতঃসিদ্ধ। তবু এ নিয়ে তর্কের অন্ত নেই। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র এটা মানবে না, কারণ সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজে সবাইকে হাত লাগাতে হবে, তুমি শিল্পী বলে তোমাকে ছাড় দেওয়া হবে না। ইসলামি রাষ্ট্র, ক্যাথলিক রাষ্ট্র, হিন্দু রাষ্ট্র প্রভৃতির দাবিও সেই-জাতীয়। পশ্চিম ইউরোপের রেনেসাঁস এসে আর্টের লক্ষ্য যে এস্থেটিক এরূপ একটি প্রত্যয়ের বীজ বুনেছিল। সেই বীজ থেকে যে চারাগাছ হয় তা নানা দেশে চালান হয়েছিল। কোথাও সেচারা অনুকূল মাটি জল আলো হাওয়া পায়, কোথাও শুকিয়ে যায়। কোনো কোনো দেশে পূর্বতন ঐতিহ্য ছিল এস্থেটিক। যেমন জাপানে। ধর্ম বা সমাজ সেখানে শিল্পীর পিঠে সওয়ার হয়ে বসেনি।

বিশুদ্ধ আর্ট বলতে বুঝি সেই আর্ট যা শিল্পকে মুক্তি দেয়। যার সাধনা ও সিদ্ধি এস্থেটিক। অবশ্য যাঁর ইচ্ছা তিনি তাঁর বিষয়বস্তু বা প্রেরণা *বাইবেল* থেকে বা *পুরাণ* থেকে নিতে পারেন বা *ডাস কাপিটাল* থেকে। বা মাও মহোদয়ের চিন্তা থেকে। কিন্তু শেষফল যেন মুখে রোচে, যেন আস্বাদন সুখ দেয়, যেন এস্থেটিক বিচারে উত্তীর্ণ হয়। উপরন্তু যদি সমাজের বা ধর্মের লক্ষ্যভেদ করে তো বহুত আচ্ছা, কিন্তু আর্টেও লক্ষ্যভেদই প্রথম কাজ, যা না করলেই নয়।

মনে রাখতে হবে যে আর্ট যদিও একদেশে-না-একদেশে সৃষ্টি হয় তবু তা দেশাতীত ও বিশ্বজনীন। যেমন শিশু একজনের গর্ভে জন্মালেও সারা সমাজের। নইলে রাশিয়ান ব্যালে সবাইকে এত আনন্দ দেয় কেন? এমনকী আমেরিকার ক্যাপিটালিস্ট ও ফ্রান্সের বুর্জোয়াদেরও? তেমনি আর্ট যদিও একযুগে-না-একযুগে সৃষ্টি হয় তবু তা যুগাতীত ও সর্বকালীন। তাই যদি না হত তবে মিলো দ্বীপের ভিনাস আমার দেহেমনে এমন পুলক সঞ্চার করত না। যেসব শিল্পকর্ম কালজয়ী বা ক্লাসিক হয়েছে তাদের সকলেরই সেই হ্লাদিনী শক্তি রয়েছে।

যার দেশ আছে অথচ বিদেশ নেই, সব দেশই স্বদেশ। যার যুগ আছে অথচ বিযুগ নেই, সব যুগই স্বযুগ; তাকে যথাসম্ভব বিশুদ্ধ হতে হবে বই কী। যেমন বিশুদ্ধ এসেন্স বা আতর। যেটা তার পক্ষে এসেনশিয়াল সেটাই তার কাছে অগ্রগণ্য। সেটা হয়তো তার হ্লাদিনীশক্তি। অথবা তার অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্য। অথবা তার মধুচক্রের অমৃত যা মানুষকে অমর করে। অথবা তার পাগল করা রূপযৌবন, যা কোনোদিনই ফুরোবে না। অথবা তার ধরাছোঁয়ার অতীত জাদু, যা সব গণনার ঊর্ধ্বে।

আধুনিকরা চাতুর্য দিয়ে জাদুর স্বাদ মেটাতে চান। পারেন না। চাতুর্যেরও হয়তো একটা স্থান আছে, কিন্তু সেটা তেমন অগ্রগণ্য নয়। চাতুর্য যদি আর্টের এসেন্স হত তাহলে সেফলিত বিজ্ঞান হয়ে উঠত। একালের ইমারত দেখে অনেকসময় বোঝা যায় না আর্ট না ফলিত বিজ্ঞান। তাজমহলের জাদু কি আধুনিক চাতুর্যের নাগালের বাইরে নয়? ফলিত বিজ্ঞান আমাদের মহাশূন্যে নিয়ে যেতে পারে, চাঁদের বুড়ি ছুঁইয়ে দিতে পারে, কিন্তু জাদুর রহস্য সেজানে না। জানলে আর্টই জানে। সেইজন্যে আর্টের অভাব ফলিত বিজ্ঞান দিয়ে মেটে না। আধুনিক সভ্যতা যদি আর্টের সাধনা ও সিদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ফলিত বিজ্ঞান নিয়ে মশগুল থাকে ও তারই মতো চতুর এক আর্ট পেলেই চরিতার্থ হয় তবে যাঁরা সমঝদার তাঁরা ক্লাসিকের মধ্যেই আশ্রয় নেবেন। মডার্ন আর্ট যাকে বলা হয় তার সম্বন্ধে আমার নিজেরই মনে দ্বিধা আছে। পরীক্ষানিরীক্ষার দিক থেকে এর মূল্য অশেষ। কিন্তু বিশুদ্ধ আর্টের নামে এও তো সেই ফুটিয়ে খাওয়া জল। আরও শুদ্ধ। ডিস্টিলড ওয়াটার। পরের ধাপটা বোধ হয় অবিমিশ্র হাইড্রোজেন অক্সিজেন।

না, বিশুদ্ধ আর্ট বলতে যদি সেইপ্রকার বিশুদ্ধি যার আছে তেমনি এক আর্ট বোঝায় তবে আর তাকে আর্ট বলে চেনা যাবে না। সেতার বিশুদ্ধি নিয়েই থাকবে। তাতে জলতৃষ্ণা মিটবে না। প্রাণ জুড়োবে না। এমন কয়েকটা উপাদান বাদ পড়বে যাদের বহিষ্কার আর্টের রীতি নয়। আর্টের নীতি নয়।

রাজনীতি সমাজনীতি ইত্যাদি যখন আর্টকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে যায় তখন বিশুদ্ধ আর্টের নাম করে আত্মরক্ষা তথা আর্টরক্ষা করতে চাওয়া এক জিনিস। যেটা সত্যি এসেনশিয়াল তার উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বিশুদ্ধির নামে বর্জনশীল ও অবিমিশ্র একটা মৌলিককে লক্ষ করতে যাওয়া আরেক জিনিস। বিশুদ্ধ আর্ট কথাটার দুইরকম অর্থ, মনের প্রবণতা প্রথমটার প্রতি। তা বলে আমি দ্বিতীয়টার বিরোধী নই। পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে চলুক। দেখাই যাক-না নিট ফল কী দাঁড়ায়।

তা ছাড়া আর্টের অগ্রগতির পথটা যে কোন দিকে সে-বিষয়ে আমরা যথার্থই দোটানায় পড়েছি। 'সব কিছু নিয়েই আর্ট' যেমন একদিক থেকে টানছে তেমনি আরেক দিক থেকে টানছে 'কোনো কিছুকে নিয়ে আর্ট নয়, আর্ট তার আপনাকে নিয়ে।' একদিকে 'ইতি ইতি' করে পাওয়া। আরেক দিকে 'নেতি নেতি' করে পাওয়া। পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে সবশেষে কী থাকে দেখা যাক। থাকবেই কিছু-না-কিছু।

যাঁরা দোটানায় পড়ে মনঃস্থির করতে পারছেন না তাঁদের সংকট সহজে কাটবে না। সমস্যাটা বহুকাল ধরে ঘনাচ্ছে। কিন্তু আজকের মতো স্পষ্ট হয়নি। সেদিন এক চিত্রশিল্পী বলছিলেন, 'ছবি আঁকা হচ্ছে বিস্তর। এক একখানা হাজার টাকা দামে বিকোচ্ছে। কিন্তু আর্ট হচ্ছে কি না সন্দেহ।' কথাটা মোটামুটি সাহিত্য সম্বন্ধেও খাটে। শিল্পী তাহলে করবে কী? কী করলে আর্ট হবে?

যেখানে স্পষ্ট একটা দোটানা সেখানে ঐতিহ্যের অনুসরণ করতে বলা নিষ্ফল। কারণ ঐতিহ্য তো 'নেতি নেতি' বলে না। আধুনিকতাই বলে 'নেতি নেতি'। আবার আধুনিকতার অনুসরণ করতে বলাও নিরর্থক, কারণ আধুনিকতা মাত্র সেদিনকার। যাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বলব তাঁরা সবে পা ফেলতে শিখেছেন। তবে আমার নিজের মনের প্রবণতা 'ইতি ইতি'মূলক। সংকটের দিন আমি ক্লাসিক পড়ি ও তারই মধ্যে দিশা পাই।

তারপর যখন পারি জনগণের দিকে তাকাই। লোকসাহিত্যের মধ্যেও নিশানা মেলে। যদিও তার অনুসরণ করা চলে না। করা চলে অনুকরণ। কিন্তু অনুকৃতি তো আর্ট নয়। লোকসাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়। জনগণের সঙ্গে পা মেলানো যায়। কিন্তু তারাই প্রত্যাশা করছে পথপ্রদর্শন। আমরা কি তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারব? না তারা করবে আমাদের প্রত্যাশা পূরণ? না আমরা তাদের মধ্যে বিলীন হয়ে যাব?

আধুনিক না আদিম

আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য পড়তে পড়তে সংশয় জাগে। এসব ব্যাপার কি আধুনিক না আদিম? হতে পারে বর্তমান শতাব্দীতেই ঘটেছে। কিন্তু খোসা ছাড়িয়ে দেখলে যা পাই তা একালের নয়, আদ্যিকালের শাঁস। খোসার জন্যে নয়, শাঁসের জন্যেই সে-সাহিত্য উপভোগ্য।

মাঝখানে বহু শতাব্দী কেটে গেছে। সভ্যসমাজ মাত্রেই মানা দিয়ে রেখেছে, সাহিত্যে তোমরা এসব ব্যাপার এনো না। আনাটা পাপ কিংবা অপরাধ। মানা যদি না মানে কঠোর শস্তি পাবে। তা সত্ত্বেও সাহিত্য শুদ্ধাচারী সাত্ত্বিক হয়ে ওঠেনি। সাধারণত কর্মের বর্মচর্ম বা নীতিবাক্যের নামাবলি গায়ে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করেছে ও করিয়েছে।

আধুনিক সাহিত্যিকরা ভন্ডামির ধার ধারেন না। কোদালকে কোদাল বলেন। কেউ কেউ দন্ডিত হলেও বেশিরভাগ পার পেয়ে যান। তাঁদের সাফাই হল বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা। খুঁটিয়ে দেখলে ওটা বৈজ্ঞানিকও নয় বাস্তবতাও নয়, আসলে ওটা বহু পুরাতন আদিমতা। সমাজের পরতে পরতে জড়ানো। সভ্যসমাজে আর অসভ্য সমাজে লেশমাত্র প্রভেদ নেই। যা আছে তার নাম সামাজিক শিষ্টাচার। বাইরের পালিশ।

আধুনিকতার সঙ্গে আদিমতাকে কী করে মেলানো যায় সেএক প্রহেলিকা। যখন ধর্মের যুগ ছিল তখন আদিমতার জন্যে খানিকটা জায়গা ছেড়ে দেওয়া হত। এখন ধর্ম পিছিয়ে পড়েছে। সামাজিক মতবাদ এগিয়ে গেছে। সামাজিক মতবাদ আদিমকে আধুনিক করতে চায়, আধুনিককে আদিম করতে চায় না—একদিনের জন্যেও না। সেইজন্যে আধুনিক উপাখ্যানের মধ্যে আদিমের গন্ধ পেলে ক্ষুব্ধ হয়। বর্ণচোরা আদিমতা পাঠকদের কামনাপূরণ করলেও সমাজনায়কদের অনুমোদন পায় না।

অথচ কত সহজ ছিল ভারতচন্দ্রের যুগে! সেযুগ ধীরে ধীরে অস্ত গেলেও তার গোধূলি দীর্ঘকাল থাকে। সাহিত্যে না হোক জীবনে।

আমার এক আলাপী তাঁর ছেলেবেলায় এমন একটি দৃশ্য চাক্ষুষ করেছিলেন যা অবর্ণনীয়। বছর ষাটেক আগেকার ঘটনা। কবি রবি তখন মধ্যগগনে। স্বদেশির যুগ। যে সম্প্রদায়ের কথা হচ্ছে সেটি পুরোপুরি স্বদেশি। কলকাতার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে তাদের আখড়া বা আস্তানা ছিল। কীর্তনাদি শুনতে আমার আলাপীর কাকা বা মামা মাঝে মাঝে সেখানে যেতেন। সঙ্গে নিয়ে যেতেন সাত-আট বছরের বালককে। সেও একজন ভক্ত। বালকটি মুগ্ধ হয়ে কীর্তন বা *ভাগবত* পাঠ শোনে, খাজা বা গজা প্রসাদ পায়, ঘুমের ঘোরে বা ভক্তিভরে ঢলে পড়ে। কেউ তাকে উপস্থিত বলে গণ্য করে না। একবার তাকে দেখে মনে হল সেঘুমিয়েই পড়েছে। কিন্তু তার ওটা ঘুম নয়, তন্দ্রা। রাত তখন দশটা কি সাড়ে দশটা। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা একটু একটু করে *গোপী*দের বস্ত্রহরণে পৌঁছোয়।

হলঘরটার একদিকে একটা গাছের মতো বা মাচার মতো কিছু ছিল। এতক্ষণ সেদিকে নজর পড়েনি বালকের। হঠাৎ দেখা গেল কে একজন লাফ দিয়ে সেখানে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে এক ফুঁয়ে বাতি নিবিয়ে দিল। বিজলির বাতি নয়। হলঘরের একধারে নানা বয়সের পুরুষ। অন্য ধারে নানা বয়সের নারী। সবাই ভক্তিমান ও ভক্তিমতী। এতক্ষণ সকলেই সুসংযত ও সুসংবৃত ছিলেন। কিন্তু যেই শ্যামের মুরলীধ্বনি শুনলেন অমনি লাজ মান ভয় বিসর্জন দিলেন। রাশি রাশি শাড়িকাপড় অন্ধকারে গাছের উপর বা মাচার উপর ছুড়ে ফেলা হল।

পুরাণে হয়তো সেইখানেই শেষ। জীবনে কিন্তু সেইখানেই শেষ নয়। অন্ধকারের আড়ালে যে যাকে পায় তাকে টেনে নিয়ে একটু দূরে সরে যায়। যতগুলি *গোপী* ততগুলি *কৃষ্ণ*। বালক বুঝতে পারে না বাকিটা কী?

শুধু বোঝে সেটাও একপ্রকার *হরির* লুট। ওর সমবয়সি কেউ নেই। থাকলে সেও হয়তো লুট করত বা লুট হত।

জিজ্ঞাসা করিনি, ওরা ওদের শাড়িকাপড় ফিরে পেল তো? চিনে নিল কী করে? বাতি জ্বলে ওঠার আগে না পরে? শুনতে শুনতে এমন বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলুম যে বাকস্ফূর্তি হয়নি।

শান্তশিষ্ট সামাজিক মানুষ। ছেলেমেয়ের বাপ, ছেলেমেয়ের মা। হয়তো ঠাকুমা, ঠাকুরদা। শুদ্ধাচারী ধার্মিক। পরকালের ভয় আছে। কিন্তু ওই যে ওদের সাধনা। লাজ মান ভয় ত্যাগ করতে হবে। লাজ মান ভয়, তিন থাকতে নয়।

সমাজে এরূপ সাধনার স্বীকৃতি কোনোদিন ছিল না। তবু সাধনাটা ছিল ও নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপ ছিল। এখনও থাকতে পারে। খোঁজ করিনি। কথা হল সমাজের নীতি আর ধর্মের রহস্য সবসময় এক নয়। আর ধর্মের রহস্যকে রূপক বলে ব্যাখ্যা করলেও তা সব ক্ষেত্রে রূপক নয়। সেও বস্তুগত তথ্য। তাকেও চাক্ষুষ করা যায়। কিন্তু তার জন্যে হয়তো সাত বছরের খোকা হতে হবে ও নিদ্রার ভান করতে হবে। ধার্মিকদের প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া যাবে না। মন্ত্রগুপ্তি তাঁদের নিয়ম।

ধর্মের রহস্যের মধ্যে আদিম যদি আত্মগোপন করে থাকে তবে মধ্যযুগে যা সত্য ছিল আধুনিক যুগেও তা সত্য। যুগ পরিবর্তনে তার এমন কিছু ঘোরতর পরিবর্তন হয়নি যে তাকে প্রাগৈতিহাসিক বলে অপাঙক্তেয় করতে হবে।

ধর্মের শামিল ছিল বলে যা এতকাল ধরে চলে আসছিল তাকে ধর্মের থেকে বিযুক্ত করে দেখলে তা কুৎসিত দেখাবেই। তা ছাড়া ধর্মেও তো শিক্ষিতজনের সংশয় জাত হয়েছে। যেখানে ধর্মবিশ্বাস প্রবল সেখানে ধর্মের আনুষঙ্গিকরূপে অনেক কিছুই পার পায়। যেমন নরবলি বা সতীদাহ। এগুলিও প্রাগৈতিহাসিক। এখনও বহু লোক আছে যারা সুযোগ পেলেই সতীদাহ করে, নরবলি দেয়। সেই আদিমের মতো এইসব আদিমও যুগ পরিবর্তন সত্ত্বেও গোপনে বিদ্যমান। ধর্মের থেকে বিযুক্ত করলে এসব হল দস্তুরমতো 'হরর' বা বিভীষিকা। পাশ্চাত্য ভূখন্ডে 'হরর' উপন্যাস বা গল্প এখন বিপুলসংখ্যকের প্রিয়পাঠ্য। পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যেও তার সংক্রমণ ঘটেছে। ছোটো ছোটো ছেলেদেরও আজকাল 'হরর' কাহিনি পড়তে দেওয়া হয়। কেনা-বেচার উপর বিধিনিষেধ নেই।

মানুষের অভিরুচি কেন এমন হল তার উত্তর, জন্ম আর মৃত্যু এ দুটোই সবচেয়ে দুর্ভেদ্য রহস্য। আদিকাল থেকেই মানুষ এর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে, আজও করে; জন্মরহস্য তাকে আকৃষ্ট করে এক প্রান্তের আদিমের দিকে। মৃত্যুরহস্য আরেক প্রান্তের আদিমের দিকে। আকর্ষণ অতি স্বাভাবিক ও অতি প্রচন্ড বলেই আধুনিক সাহিত্যেও আদিমের প্রতিফলন ঘটে। তবে ও-জিনিস সাহিত্য না অসাহিত্য সেটাও একটা প্রশ্ন। যেমন ধর্ম না অধর্ম এটাও একদা একটা প্রশ্ন ছিল।

বলতে পারা যায় আজকের দিনে ধর্মের স্থান নিয়েছে সাহিত্য। সাহিত্যের নামে অনেক কিছুই পার পেয়ে যাচ্ছে। তা বলে বহিষ্কারনীতি অবলম্বন করতেও মন সায় দেয় না। ইউরোপে ধর্মান্ধদের প্রতাপ এককালে প্রভূত অবিচার ও অনিষ্ট করেছে। ডাইনি শিকার ও ভিন্নমতের ব্যক্তিদের জীবন্ত দহন হাজার বছর ধরে চলেছিল। আধুনিক যুগ তার থেকে মুক্তি দিয়েছে বলেই তার নাম আধুনিক ও তার প্রতিপত্তি এত নিবিড়। ধর্মান্ধদের স্থানে যাঁদের বসানো হবে তাঁরাও যদি সমান অন্ধ হন তবে তো সাহিত্যের আঁচল ধরে সেইসব অবিচার ও অত্যাচারই ফিরে এল।

যে যার নিজের মতো করে বাঁচবে, স্বাধীনতার সারমর্ম এই নয় কি? একবার এটাকে কাম্য বলে মেনে নিলে এক একজনের এক এক রূপরুচিও মেনে নিতে হয়। সেরুচি যদি বিকৃত বা বীভৎস না হয় তবে কেবলমাত্র ইউনিফর্মিটির খাতিরে হস্তক্ষেপ করা উচিত কি? বৈচিত্র্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বিকৃত বা বীভৎস যদি হয় তবে শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন করতে হবে, সংশোধনের উপায় খুঁজতে হবে, যথাসম্ভব উদার হতে

হবে, সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে আইন অনুসারে হস্তক্ষেপ করতে হবে। স্বাধীনতার অপব্যবহার যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তবে বিচারের আমলে আসবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অভয় দিতে হবে যে স্বাধীনতাই কাম্য।

সুখও যে মানবজীবনের অন্যতম কাম্য এটার ব্যাপক স্বীকৃতিও আধুনিকতার লক্ষণ। সুখের চেয়ে দুঃখের পাল্লা এত ভারী ছিল যে মানুষ পৃথিবীকে দুঃখের স্থান ও স্বর্গকে সুখের স্থান ভাবতে অভ্যস্ত ছিল। জন্ম সার্থক করার মতো সুখ অল্প লোকের কপালেই জুটত। ধরে নেওয়া হত যে সেই ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতীরা পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই কোনো সুকৃতি করেছিল। যারা জন্মান্তর মানত না তারা জন্মগত দৈবী অধিকার মানত। অভিজাত কুলে জন্মানোর সুকৃতি। অধিকাংশ লোক ওই একই জন্মের প্রবেশদ্বার দিয়ে এসেছে, অথচ তাদের জন্ম দুঃখের। তারা জন্মদুঃখী। গত চার শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষাদীক্ষা চিন্তন ও কর্ম মানুষকে সেই নিষ্ঠুর লৌহ নিয়ম হতে মুক্তি দিয়েছে। যে নিয়ম দুঃখকেই নিয়তি বলে ও সুখকে ব্যতিক্রম বলে মানুষের মন ভোলাত।

সুখের জন্যে আরেক জন্ম অপেক্ষা করতে বা পরলোকের জন্যে ধৈর্য ধরতে আজকাল বিশেষ কেউ রাজি নয়। এটা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন নয় কি? সব দেশের আধুনিক সাহিত্যিক ও মনীষীরা মোটামুটি মেনে নিয়েছেন যে সুখও মানবজীবনের অন্যতম কাম্য। সুখ বলতে ঠিক কী বোঝায় সেটা কিন্তু তর্কের বিষয়। কেউ যদি সন্ন্যাসী হয়েই সুখী হয় তবে তার পথটাও অপথ নয়। তা বলে সেইটেই একমাত্র সুপথ নয়। সন্ন্যাসীশাসিত সমাজে বংশরক্ষা ছিল একটা অপ্রিয় কর্তব্য। কোনোমতে চোখ বুজে সেটা সম্পাদন করতে হত যারা সন্ন্যাসী নয় সেইসব দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকদের। ওই ‘পাপক্রিয়া’র মধ্যে সুখ আশা করাটাই ছিল অন্যায়। প্রেম? প্রেমের সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক? প্রেম হবে অশরীরী, প্রেম হবে নিষ্পাপ।

অপ্রিয় কর্তব্য বনাম প্রিয়মিলন নিয়ে মানুষের মনে যে পুঞ্জীভূত দ্বন্দ্ব ছিল সেটা প্রাচ্যের চেয়ে প্রতীচ্যেই বেশি। সেইজন্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যেই তা নিয়ে এত বেশি বিদ্রোহ। বিদ্রোহ থেকে স্বাভাবিক আতিশয্য। এর সবটাই আধুনিকতা নয়। সবটাই যে ধোপে টিকবে তা নয়। পেণ্ডুলাম যেমন এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে যেতে একসময় মধ্যপন্থী হয় সাহিত্যও তেমনি হবে। তখন আদিমের দিকে অতটা ঝোঁক থাকবে না। দেহের সঙ্গে মনের, প্রেমের সঙ্গে কামের, বিবাহের সঙ্গে স্বাধীনতার সামূহিক বোঝাপড়া যখন হবে তখন আধুনিকের সঙ্গে আদিমেরও বিশিষ্ট বোঝাপড়া হবে। তখন সাহিত্যের উপরেও সেবোঝাপড়ার ছাপ পড়বে।

সেই পথেই মানব-মানবীর সুখ ও সার্থকতা। তারই স্বপ্ন দেখতে হবে। কিন্তু বাস্তবের উপর এক চোখ রেখে। দুঃখ শোক আর ব্যর্থতা দিয়ে জীবনের পথ আকীর্ণ।

মায়া ও সত্য

আমার মা বলতেন, 'এ সংসার মায়ার। কেউ কারও নয়। ওই যে গোপাল বিগ্রহ দেখছিস, ওই সত্য।'

অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মায়া। ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন তত্ত্ব। মা কিন্তু ওটা শাস্ত্র পড়ে পাননি। অত বিদ্যা ছিল না তাঁর। পেয়েছিলেন বহু দুঃখে। ঠাকুরের কাছে দিনরাত পড়ে থেকে। এ জ্ঞান যার হয়েছে সেবেশিদিন বাঁচে না। সংসারের মায়া কাটায়।

আমি কিন্তু ওকথা মানতুম না। এখনও মানিনে। ব্রহ্ম সত্য সে-বিষয়ে আমি নি:সন্দেহ। কিন্তু এ জগৎ মায়ার জগৎ হলে কীসের আকর্ষণে আমি বেঁচে আছি? কেনই-বা সৃষ্টির দায় মাথায় নিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছি?

না, আমি স্বীকার করব না যে এ সংসার মায়ার সংসার। কিন্তু মা যে ওর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন কেউ কারও নয় সেটা এককথায় উড়িয়ে দিই কী করে? মানুষ কোনখান থেকে আসে, কোনখানে যায়, মাঝখানে ক-টা দিনের জন্যে কতরকম সম্পর্কে বাঁধা পড়ে। একজনের ছেলে আরেক জনের স্বামী, আরেকজনের বাপ, আরেকজনের বন্ধু, এসব যখন ভাবি তখন আমিও মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, সমুদ্রের বেলায় বালুর খেলাঘর।

মহাযুদ্ধ রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি যদি সত্য না হয় তো সত্য কী? সত্য কাকে বলে? তবু আমারও থেকে থেকে মনে হয় যে মহামায়ার মায়া। সব যেন পর্দার উপর ছায়াছবির মতো ভাসছে। একটু বাদে মিলিয়ে যাবে। এই অভিনেতারা কেউ থাকবে না। এদের কীর্তির রেকর্ডও হাজার কয়েক বছর বাদে নি:শেষে মুছে যাবে। মহাকালের দৃশ্যপটে কয়েক হাজার বছর তো কয়েকটা মুহূর্ত। কয়েক লক্ষ বছর বাদে পৃথিবীও থাকে কি না দেখো। মহাকালের মহামায়া সৌরজগৎকেও বালুর খেলাঘরের মতো ভাঙবেন।

দেখতে দেখতে চোখের সুমুখে মিলিয়ে গেল দীর্ঘ সাত পুরুষের ইংরেজ রাজত্ব। মায়া নয় তো কী! সাত শতাব্দীর গৌড়বঙ্গ ভূমিকম্পে দ্বিখন্ড হয়ে গেল। মায়া নয় তো কী! কিন্তু কত লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ গেল, প্রাণের চেয়ে প্রিয় পূর্বপুরুষের বাস্তু গেল, কত সহস্র সহস্র নারীর প্রাণের চেয়ে মূল্যবান ইজ্জত গেল—হায় *মহামায়া*! সেও কি তোমার মায়া! শঙ্করাচার্য কী বলেন?

জ্ঞান হবার সময় থেকেই মানবজাতির এ জিজ্ঞাসা। যা-কিছু দেখছি সবই কি সত্য? সবই কি মায়া? যা-কিছু ঘটছে সবই কি সত্য? সবই কি মায়া?

দেশবিদেশের দার্শনিকরা এখনও এ জিজ্ঞাসার সর্বসম্মত মীমাংসা খুঁজে পাননি। দর্শনের মতো আর্টেরও এটা একটা অমীমাংসিত প্রশ্ন। সাপের মতো যেটা দেখতে সেটা হয়তো সাপ নয়, দড়ি। কিংবা দড়ির মতো যেটা দেখতে সেটা হয়তো দড়ি নয়, সাপ। জীবনমরণের প্রশ্ন বই কী। যদি দড়ি না হয়ে সাপ হয়ে থাকে তবে সর্পে রজ্জুভ্রমের পরিণাম হয়তো মৃত্যু। রজ্জুতে সর্পভ্রমও অনেকসময় ভয়ংকর হয়। অকারণ ভয় থেকেও কখনো কখনো মৃত্যু ঘটে। শক পেয়ে মৃত্যু।

বিভ্রম ও সত্যতা দর্শন, বিজ্ঞানের মতো আর্টেরও একটা মূলগত সমস্যা। কোনটা ইলিউশন, কোনটা রিয়্যালিটি এ নিয়ে মতভেদ হতে পারে, কিন্তু একটা যে অপরটা নয় এ বিষয়ে সকলে একমত। সাপটা যদি সত্য হয় দড়িটা মায়া। দড়িটা যদি সত্য হয় সাপটা মায়া। কিন্তু কী করে স্থিরনিশ্চিত হব যে ওটা দেখতে দড়ির মতো, আসলে সাপ? বা দেখতে সাপের মতো, আসলে দড়ি?

শিল্পীদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে অন্তহীন তর্ক করবেন না। সোজা এগিয়ে গিয়ে সাপের গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা করবেন সাপ না দড়ি। অত্যন্ত বিপজ্জনক পরীক্ষা। এঁরা প্রত্যক্ষ

অভিজ্ঞতায় বিশ্বাস করেন ও তার ঝুঁকি নিতেও তৈরি। আগুনে হাত না দিয়ে এঁরা মেনে নেবেন না যে হাত পুড়ে যাবে, হাতের ছোঁয়া লেগে মুখও পুড়বে। জীবনের স্বাদ জীবনের কাছেই মেলে, দুধের স্বাদ যেমন দুধের কাছে। কল্পনা সে-স্বাদ জোগাতে পারে না। পরোক্ষ অভিজ্ঞতা বা শোনা কথা তার স্থান নিতে পারে না। অথচ জীবনের ক-টা অভিজ্ঞতাই-বা কজনের বেলা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা!

আমার এক বন্ধু আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন বিবাহযোগ্যা কুমারীদের ফোটো দেখে বিশ্বাস না করতে। ফোটোতে নাকি আসল রূপ ধরা পড়ে না। বলতে হয়, কন্যাটিকে স্বচক্ষে দেখতে চাই। স্বচক্ষে দেখেও কত লোক ঠকে গেছে বন্ধু বোধ হয় জানতেন না। কিংবা জানলেও একজন বাস্তববাদী সাহিত্যিক হিসাবে সেইটেই তাঁর দাবি। নিজের চোখের উপর তাঁর অসীম আস্থা। বাস্তববাদী হলে যা হয়। আমি কিন্তু রোমান্টিক। আমি চোখে না দেখেও ইমেজ বানাই। ফোটো না দেখেও প্রতিমা গড়ি। রূপ যাকে বলি তার কতক আমার কল্পনা, কতক নারীর আপন রূপ। তেমনি যেকোনো মানুষের বা প্রাণীর বা বস্তুর বা ঘটনার আসল সত্যের রূপ খোলা চোখেও দেখা যায় না। সেযেন সূর্যের রূপ।

একজন বিচারক হিসাবে আমার কাজ ছিল ঠিক কী হয়েছিল তা সাক্ষীদের মুখে শোনা ও শুনে লিপিবদ্ধ করা। ঠিক যে কী হয়েছিল তা চাক্ষুষ সাক্ষীরাও বলতে পারে না। অনেক জায়গায় ফাঁক থেকে যায়। অনেক জায়গায় গোলমাল হয়ে যায়। লিপিবদ্ধ যেটা হয় সেটা হুবহু সত্য নয়। বাস্তববাদ তা হলে কীসের উপর নির্ভর করে পাঁচজনকে ডেকে বলবে, এই যা লিপিবদ্ধ হল তা-ই সত্য? তা-ই ঠিক? তা-ই আসল?

কাজ চালানো গোছের বাস্তবতা না হলে অফিস-আদালত চলে না, সংসার চলে না। এমনকী ঘরগৃহস্থালিও চলে না। কিন্তু কাজ চালানো গোছের রিয়্যালিটি দিয়ে উচ্চাঙ্গের দর্শন বা সাহিত্য হতে পারে কি? আর্ট আরও গভীরে যেতে চায়। কাজ চালানো গোছের রিয়্যালিটি তার জন্যে নয়। কাজ চালানোর জন্যে মাথাব্যথা তার নেই। 'নইলে কাজ চলবে কী করে' এ প্রশ্ন তাকে ভাবিয়ে তোলে না। তার প্রশ্ন, 'আসল ব্যাপারটা কী?'

এই চেয়ারটার একটা বাহ্য রূপ আছে, সেটাই এর আসল রূপ। কিন্তু এর উপরে যে মানুষটা বসে আছে তার কি শুধু একটা বাহ্য রূপই আছে? তার আভ্যন্তরিক রূপ অপরে দেখবে কী করে? সে-ই বা দেখাবে কী করে? মুখের কথায়? পুরো মানুষটার পুরো রূপ সেনিজেই দেখেনি, সেইজন্যেই তো সাধকরা বলে থাকেন, আত্মানং বিদ্ধি। বাহ্যরূপের বর্ণনা এমন কিছু কঠিন নয়, কিন্তু তার আড়ালে ও তাকে জড়িয়ে যে অনির্বচনীয় রূপ আছে সেযে বর্ণনাতীত।

তেমনি বাহ্য ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা শক্ত নয়, কিন্তু তার পেছনে যে কার্যকারণ পরম্পরা রয়েছে তার সন্ধান নিতে গেলে মহাভারত হয়। আর্টের পরিসর সীমাবদ্ধ। তা ছাড়া ঘটনা যেমন আকর্ষক কার্যকারণ পরম্পরা হয়তো তেমন নয়। সাধারণত এত ক্লান্তিকর যে পাঠককে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। অসংখ্য খুঁটিনাটি দিয়ে জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা পরিচালিত। শরীরকে চালায় মন, মনকে চালায় প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন বা দয়ামায়া বা উদারতা। যথার্থ অভিপ্রায় যে কী তা অনেক সময় দুর্জ্ঞেয়। অসুখ না করলে কেউ মনোবিশ্লেষণ করায় না। অসুখী ছাড়া কারও মন মনোবিশ্লেষকদের পরীক্ষার বিষয় হয় না। খাপছাড়া বা খারাপ কিছু না হলে সেটা 'খবর' হয় না। অধিকাংশ গল্প উপন্যাস খবরধর্মী।

সেইজন্যে প্রকৃত সত্য যে কী তা রীতিমতো ধাঁধা। বৈজ্ঞানিকরা এতকাল প্রকৃতিকে নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। ইদানীং মানুষের উপর দৃষ্টি পড়েছে। কিন্তু আভ্যন্তরিক বলতে তাঁরা যা বোঝেন তা যথেষ্ট গভীর নয়। আরও গভীরে যেতে হলে কবি ও ঋষিরাই পথপ্রদর্শক। তাঁদের পথ দেখায় তাঁদের গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। সেখানে যে নিয়ে যায় তার নাম ইনার রিয়্যালিটি। সে-ই যদি সত্য হয় তবে আর সব আপাত সত্য, বা সত্যাভাস।

এই দৃশ্যমান জগৎকে মায়া বলে অগ্রাহ্য করে বা ছোটো করে কোনো কিছুই সৃষ্টি করা যায় না। সেপন্থা আর্টের পন্থা নয়। এ যেমন একদিকের কথা তেমনি আরেক দিকের কথা হচ্ছে এই দৃশ্যমান জগৎকে তার নিজের ভাষায় বা নিজের অর্থে বোঝাও যায় না, বোঝানোও যায় না—বৃথা চেষ্টা। এর বাইরে গিয়ে বাইরে

থেকে দৃষ্টিপাত করা জীবিত মানুষের অসাধ্য, কিন্তু সাধনা করলে ভিতরে গিয়ে ভিতর থেকে দর্শন করা সম্ভব। সেটা কেবল সাধুসন্ত বা মুনিঋষি বা মরমিদের পন্থা নয়, কবি বা শিল্পীদেরও পন্থা। শুধু ধর্মের পন্থা নয়, আর্টেরও পন্থা সেই।

আর্টকে আমি ধর্মের অনুসরণ করতে বলছিনে। স্বধর্মের অনুসরণ করতেই বলছি। স্বধর্মের অনুসরণ করতে করতেই সেদৃশ্যমানের অন্তরালে কী আছে তার মর্মভেদ করবে। তখন তারই আলোয় দৃশ্যমানকেও ঠিকভাবে চিনবে। ঠিকভাবে বুঝবে। তার ফলে যে তার সৃষ্টি ব্যাহত বা বন্ধ হবে তা নয়। আধুনিকদের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক যে গ্যেটে তাঁর 'ফাউস্টের' সমাপ্তির জন্যে বিশ্বরূপ প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল। আর বিশ্বরূপ কেবল মর্ত্যরূপ নয়। কী করে তিনি তা নিরীক্ষণ করতেন যদি-না অন্তর্ভেদী দৃষ্টির বর্তিকা হাতে নিয়ে যাত্রা করতেন? ফাউস্টের জীবনবৃত্ত কোথায় গিয়ে সম্পূর্ণতা পেল তা উপলব্ধি করেই তিনি শান্তি পান। নইলে প্রথম খন্ডের খন্ডসত্য তাঁকে আমরণ অস্বস্তি দিত।

না, দৃশ্যমানকে খারিজ করে বা খাটো করে নয়, তাকে তার আভ্যন্তরিকের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েই বিধাতার সৃষ্টির সমগ্রতাবোধ ও মানবের সৃষ্টির পরিণতি। রবীন্দ্রনাথ যে রূপসাগরে ডুব দিয়েছিলেন তাঁর মনে ছিল অরূপরতনের আশা। রূপদৃষ্টি তাঁর মতো আর কার অমন ছিল! অথচ সেইখানেই তিনি ক্ষান্ত হননি। অরূপদৃষ্টির উন্মীলন চেয়েছেন। তাঁর কাব্য তা বলে ব্রহ্মসূত্রে পর্যবসিত হয়নি।

বিধাতা তাঁর সৃষ্টির দায়ের খানিকটা আমাদের হস্তান্তর করে দিয়েছেন। আমরাও স্রষ্টা। আমরা যা সৃষ্টি করি তার অঙ্গেও মায়া-মাখানো। নাটকের বা উপন্যাসের জগৎও কি মায়ার জগৎ নয়? *হ্যামলেট* বা *আনা কারেনিনা* কি সত্যিকার চরিত্র? তাদের জীবনের ঘটনা কি সত্য ঘটনা? মায়া নিয়েই আমাদের কারবার, অথচ আমরা সত্যের আবরণ খুলে দিই। হিরন্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত। সেআবরণ খুলে দেখানোর ভার যাদের উপরে পড়েছে আমরাও তাদের মধ্যে আছি। হে শিল্পী, হে কবি, তৎ ত্বম অপাবৃণু।

যেমনটি-তেমনটি

ছেলেবেলায় যিনি আমাদের অঙ্ক শেখাতেন তিনিই শেখাতেন অঙ্কন। একবার তিনি আমাকে একটা অশ্বত্থের পাতা দিয়ে বলেন, যেমনটি দেখছ তেমনটি এঁকে নিয়ে এসো। আমি সেই পাতাটাকে পাতলা কাগজ দিয়ে অবিকল ট্রেস করি। মাস্টারমশাই তো মহাখুশি। যেমনটি দেখতে তেমনটি দেখিয়েছি। আর কী চাই? অঙ্কনের জন্যে সে-বার আমি পুরো মার্ক পাই। আমিও মহাখুশি।

বড়ো হয়ে বুঝতে পারলুম যে অঙ্কের বেলা যেটা খাটে অঙ্কনের বেলা সেটা খাটে না। মাস্টারমশাই আসলে অঙ্কের লোক। অঙ্কনের ভার তাঁর উপর দেওয়া হয়েছিল অধিকন্তু। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে দুই আর দুই মিলে যেমন চার হয় তেমনি গাছের পাতা আর খাতার পাতা মিলে এক হয়। বড়ো হয়ে জ্ঞান হল যে প্রকৃতির অনুকৃতির নাম আর্ট নয়। অশ্বত্থের পাতার হুবহু নকল যারা করে তারা শিল্পী নয়। আমি যে পুরো মার্ক পেয়েছিলুম সেটা আমার পাওনা নয়। তখন আমি মহা দুঃখিত হই।

অনেকের স্মরণশক্তি এত প্রখর যে তাঁরা অশ্বত্থের পাতা সামনে না রেখেও বিলকুল তেমনিটি আঁকতে পারেন। সেটাও অনুকৃতি। এক্ষেত্রে সামনে রাখা না রাখাটা পয়েন্ট নয়। পয়েন্ট হচ্ছে যেমনটি-তেমনটি। সেটা হয়তো আমার খাতার অশ্বত্থ পাতার মতো জালিয়াতি নয়। কিন্তু সেটাও একপ্রকার কেরামতি, যার জন্যে স্মরণশক্তি থাকলেই যথেষ্ট।

ধরো একজনের স্মরণশক্তি নেই। তা বলে কি সেশিল্পকর্ম করবে না? শিল্পী হবে না? নিশ্চয়ই হবে। যাঁরা প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চান তাঁরা নিরাশ হয়ে বলবেন, অশ্বত্থ পাতা এরকম তো হয় না। অতএব ফেল। যাঁরা মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন মনে করেন না তাঁরা বলবেন, গাছের পাতা গাছেই সুন্দর। ছবিতে তাকে না এনে তার ভিতরের সুষমাটুকু ফোটাও। তা হলেই পাস।

এ জগৎ যেমনটি তাকে তেমনিটি দেখতে হবে, একথা ঠিক। কিন্তু একে তেমনিটি দেখতে হবে, একথা ঠিক নয়। যদি বলি তেমনিটি দেখাতে হবে তবে কথাটার একটা বিশেষ অর্থ আছে যে-অর্থে সেটা ঠিক। সেই বিশেষ অর্থটা যাঁরা বোঝেন তাঁরাই শিল্পী, বাদবাকি ফোটোগ্রাফার।

ডাক্তারদের মতো শিল্পীরাও অ্যানাটমি ফিজিয়োলজি শিখতে পারেন, কিন্তু আঁকবার সময় সে-বিদ্যা ভুলে যেতে হবে। অঙ্কনের কাজ প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া নয়, তার রহস্য ভেদ করা। রিয়্যালিটি তার আড়ালে রয়েছে। তাকে ছাড়িয়ে রয়েছে। তাকে ধরতে পারাটাই আসল। সহজে কি সেধরা দেয়? দিব্যদৃষ্টির শরণ নিতে হয়। তখন যা ফোটে তা সাধারণ অর্থে যেমনটি-তেমনটি নয়, বিশেষ অর্থে যেমনটি-তেমনটি।

সাধারণের চেনা জগতের সঙ্গে শিল্পীর আঁকা জগতের ষোলো আনা মিল আশা করাই অন্যায়। আশা যাঁরা করেন তাঁরা ধরে নেন যে আর্ট মানে মিল রাখা বা মিল দেওয়া। যে যত মেলাতে পারবে তারই তত বাহাদুরি। এই যে বদ্ধমূল সংস্কার এটাকে ভেঙে দিতে গিয়ে একালের শিল্পীরা অনেক সময় ইচ্ছে করেই অমিল উদ্ভাবন করছেন। যে যত না মেলাতে পারবে সেতত বাহাদুর। আদৌ যদি না মেলে তো পুরো মার্ক পাওনা।

এইসব বিদ্রোহীরা বিপরীত দিকে দৌড়োতে দৌড়োতে ইতিমধ্যে এতদূর চলে গেছেন যে প্রকৃতির দিকে ফিরেও তাকান না। কিংবা অনুকৃতির অপবাদ খন্ডনের জন্যে সংকেতের বা ফ্যানটাসির আশ্রয় নেন। এদের দিব্যদৃষ্টি যে বস্তুর অন্তর্ভেদী তাও নয়। এঁরা বরং বস্তুকে ব্যবচ্ছেদ করেন ও টুকরোগুলিকে নতুন করে সাজান।

যেমনটি দেখব তেমনিটি দেখাব এ তত্ত্বে এঁদের বিশ্বাস নেই। সাধারণ অর্থে তো নয়ই, বিশেষ অর্থেও না। রিয়্যালিটির সঙ্গে ষোলো আনা অমিল না থাকলে আর্ট হয় না, এটাই মনে হয় এঁদের পালটা তত্ত্ব। সাদৃশ্যের রেশটুকুও থাকবে না তবেই সেটা হবে আর্ট, নইলে হবে না; এটাই বোধ হয় এদের পালটা দাবি।

প্রকৃতির জগৎ ও আর্টের জগৎ যে এক নয় তা মানতেই হবে। কিন্তু এক নয় বলে কি তাদের ষোলো আনা বিসদৃশ হওয়া চাই? আর্টের কি তবে প্রকৃতির কাছে পাঠ নেবার দায় নেই? চোখ মেললেই প্রকৃতিকে দেখতে পাই, প্রকৃতির প্রতিবিম্ব মনের মুকুরে পড়বেই। তাকে কি আমি সচেতনভাবে বহিষ্কার করব? অতখানি আত্মসচেতন হলে কি আমি রূপধ্যান করতে পারব? রূপসৃষ্টি করতে পারব?

আর্ট হবে প্রকৃতিছুট এমন কোনো তত্ত্ব, যদি কেউ প্রচার করেন তবে সেটা হবে একপ্রকার ডগমা। চোখ বুজে সেটা মেনে নিলে আর চোখ খোলা রাখতে পারব না। অথচ শিল্পীকে সর্বক্ষণ চোখ খোলা রাখতে হয়। তা না করে যদি কেউ সর্বক্ষণ চোখ বন্ধ রাখেন তবে হয় তিনি একজন ধ্যানী, যাঁর ধ্যানদৃষ্টি সক্রিয়, আর নয়তো তিনি একজন পাতালচারী, যাঁর বিহার অচেতন বা অবচেতন রাজ্যে।

বলা বাহুল্য রিয়্যালিটির অন্বেষণ কতক শিল্পীকে পাতালে নিয়ে গেলেও সেটা বৃহত্তর অন্বেষণের শামিল। পাতালও রিয়্যালিটির এলাকার বাইরে নয়। সেক্ষেত্রে ষোলো আনা অমিল অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু সেটা যেন আত্মসচেতনভাবে জাহির করা না হয়। আপনা হতে যতটা অমিল আসে তাকে আসতে দাও। জোর করে টেনে না আনলেই হল। রিয়্যালিটিকে ধরতে ছুঁতে না পারলে শুধুমাত্র আকার অবয়ব শুদ্ধভাবে আঁকাই কি আর্ট? রূপ কি কেবল যেমনটি দেখতে?

পাশ্চাত্য ভূখন্ডে রেনেসাঁসের পর যুক্তির যুগ এসে এমন এক গাণিতিক বিশ্বের রূপ বর্ণনা করে যে, আর্টও বেশিদিন পিছিয়ে থাকতে পারে না। আর্টকেও নতুন রিয়্যালিটির সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হয়। অঙ্কের নিয়ম অঙ্কনেও প্রভাব বিস্তার করে। এখন গাণিতিক বিশ্বের উপর নির্ভরতা টলেছে। প্রকৃত বিশ্ব যে একান্ত গাণিতিক নয় এ সংশয় জেগেছে। মধ্যযুগের শাস্ত্রীয় বিশ্ব যেমন একদিন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের আলোয় অবাস্তব ঠেকেছিল, আধুনিক যুগের গাণিতিক বিশ্বও তেমনি গভীরতর অনুসন্ধানের আলোয় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মশৃঙ্খলাবদ্ধ ও কার্যকারণ শাসিত বলে প্রতিভাত হচ্ছে না।

আমরা আবার এক যুগসন্ধিতে পৌঁছেছি। রিয়্যালিটির স্বরূপ সম্বন্ধে সংশয়মোচন না হলে সে-সংশয়ের ছায়া আর্টের উপরেও পড়বে। সংশয়ই এ যুগের বাদী সুর। বৈজ্ঞানিক বা অর্থনৈতিক বা বৈপ্লবিক সাফল্য এর কণ্ঠরোধ করতে পারছে না।

বিজ্ঞান তথা বিপ্লবী মতবাদ মিলে খোদার উপর খোদকারি করতে পারে, মহাশূন্য অভিযান ও গ্রহগ্রহান্তর জয় করতে পারে। আত্মকলহে নির্বাণলাভ না করলে মানবজাতি আক্ষরিক অর্থে অপার্থিভ হতে পারে। এমনি কতরকম মধুর স্বপ্ন আমাদের জীবনে। কিন্তু রিয়্যালিটির স্বরূপ সম্বন্ধে নতুন করে যে সংশয় জন্মেছে তার কণ্ঠস্বর দিন দিন জোরালো হয়ে উঠছে। যুক্তির যুগ ধীরে ধীরে নিযুক্তির যুগে পরিণত হচ্ছে। এর লক্ষণ চারদিকে।

বাইরে যদি নিযুক্তির রাজত্ব হয় তবে আর্টের ঘরে তার পদসঞ্চার অপরিহার্য। আর্টের ঘর তো সংসারের বাইরে নয়। আর্ট বড়োজোর স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে পারে, কিন্তু বিচ্ছিন্নতা দাবি করতে পারে না। তার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হাওয়া তার দেহের বাইরের সঙ্গে, তার এলাকার বাইরের সঙ্গে ওতপ্রোত।

নির্যুক্তির যুগে বাস করলে আর্টের ভিতরেও তার অনুপ্রবেশ মেনে নিতে হয়। কিন্তু ছেলেবেলায় অশ্বত্থ পাতার গায়ে দাগা বুলিয়ে আমি যে ভুল করেছিলুম সেই ভুলই আবার করা হবে যদি নির্যুক্তির জগতের গায়ে আর্টের দাগা বুলোতে যাই। প্রকৃতির অনুকৃতি যদি ভ্রম হয় তবে নির্যুক্তির অনুকৃতিও ভ্রম। যেমনটি দেখেছি তেমনিটি দেখাব বলতে কি এই বোঝায় যে দুনিয়াটা একটা পাগলাগারদ বা মানসিক হাসপাতাল? না, এক্ষেত্রেও সেই বিশেষ অর্থে বুঝতে হবে। সাধারণ অর্থে যেমনিটি-তেমনিটি মানে নির্যুক্তির অবিকল

অনুকৃতি। আর বিশেষ অর্থে যেমনটি-তেমনটি মানে নির্যুক্তির আড়ালে যে উচ্চতর সত্য আছে তার সঙ্গে সত্যরক্ষা। আর্টে যে জিনিস কোনোমতেই নকলনবিশি হতে পারে না।

দুনিয়াতে যদি নিয়ম বলে কিছু না থাকে, সমস্তটাই হয় অনিয়ম, তা হলেও আর্ট তার নিজের নিয়ম মেনে চলবে, নিয়মভ্রষ্ট হবে না। আর্টের শাসন গতকাল যেমন কঠোর ছিল আজও তেমনি কঠোর, আগামীকালও তেমনি কঠোর হবে। বাইরে নির্যুক্তির যুগ এসেছে বলে ও প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুনগুলোর সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিয়েছে বলে আর্ট তার আপনার নিয়মনিষ্ঠতা বিসর্জন দেবে না। আর্ট এক জায়গায় স্থির থাকবে। সেটা তার ঘরের শাসন।

এর মানে অবশ্য এমন নয় যে আর্টের নিয়মাবলি বদলায় না। নিশ্চয় বদলায়, বার বার বদলায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেনিয়মশৃঙ্খলার দ্বারা শাসিত। নিয়মশৃঙ্খলা এক্ষেত্রে আর্টের স্বকীয়। পরকীয় নিয়মশৃঙ্খলার বেলা সেসত্যাগ্রহী।

এমন যে আর্ট সেনিযুক্তির যুগেও স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে না, যেমন যুক্তির যুগেও স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়নি। অঙ্কনের বেলা যেমন অঙ্কের নিয়ম খাটেনি তেমনি খাটবে না অগাণিতিক নিয়ম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চোখে জগতের চেহারা যেমনই হোক-না কেন আর্ট হুবহু তেমনিটি ফুটবে না। তবে তার যেটা স্পিরিট সেটা ফুটতে পারে।

প্রধানত অনুভূতি ও কল্পনা নিয়েই আর্টের আপনার সংসার। যুক্তি কিংবা নিযুক্তি কোনোটাই সেখানে মুখ্য নয়। যুক্তি ও জীবনকে গন্ডিবদ্ধ করতে পারে, সেইজন্যে তার মুক্তির জন্যে নির্যুক্তিকে স্বাগত জানাতে পারে। আবার নির্যুক্তি যে মুক্তি দেয় সে-মুক্তিও জীবনকে পাগলাগারদে কোণঠাসা করতে পারে। তার বাইরে পা দিলেই সেগাড়িচাপা পড়তে পারে।

যাতে সবচেয়ে কম সংকোচন ও সবচেয়ে বেশি প্রসারণ সেইরূপ জীবনই আর্টের কাম্য। জীবন যদি মোটের উপর সংকোচনশীল হয়ে ওঠে আর্ট ত্রাহি ত্রাহি করবে। আর যদি মোটের ওপর প্রসারণশীল থাকে তবে সেই আওতায় আর্ট তার আপনার বিকাশে মন দেবে। বিকাশের পক্ষে প্রসারণশীলতাই শ্রেয়।

তা বলে শিল্পীর উপরে জীবনকে প্রসারণশীল করার ভার অর্পণ করা হয়নি। আর্ট যদিও জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে, জীবনের গতিনির্দেশ করতে পারে, তবু সে-কাজ সচেতনভাবে করতে যাওয়াও একপ্রকার উদ্দেশ্যসাধন। সেউদ্দেশ্য আর্টের ঘরোয়া উদ্দেশ্য নয়। রিয়্যালিটিকে জানতে চাও, বুঝতে চাও, ধরতে চাও, ছুঁতে চাও—বেশ। কিন্তু তাকে নিজের হাতে বানাতে যেয়ো না। অন্তত সচেতনভাবে নয়। তা করতে গেলে এতদূরে সরে যাবে যে অনায়াসে স্বক্ষেত্রে ফিরে আসতে পারবে না। স্বক্ষেত্র ত্যাগ স্বধর্ম ত্যাগের মতোই ভয়াবহ।

আধুনিক মানুষ রিয়্যালিটিকে বানিয়ে নেবার স্পর্ধা রাখে। তা বলে শিল্পী যেন স্বস্থানচ্যুত না হয়। স্বস্থানে পা ঠিক রেখে টাল সামলে সুস্থির হয়ে তার পরে অন্য কথা।

বাংলার রেনেসাঁস

ভূমিকা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ১৯৬৭ সালের লীলা বক্তৃতাবলি আমি ১৯৭১ সালে প্রস্তুত করি। বিষয়টা আমিই নির্বাচন করেছিলুম—বাংলার রেনেসাঁস। এ বিষয়ে আমি তিনটি বক্তৃতা দিই। পরে সেগুলিকে প্রবন্ধের আকার দিতে আরও সময় নিই। এখন পুস্তকাকারে প্রকাশ করছি। পরিশিষ্ট হিসাবে জুড়ে দিচ্ছি অপর একজনের বইয়ের জন্য লেখা ভূমিকা, আমার বক্তব্য যাতে আরও পরিষ্কার হয়।

বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির ধারণা গত শতাব্দীতে আমাদের দেশে প্রথমে দেখা দেয় রেনেসাঁস, তারপরে রিভাইভাল। অনেকের মতে রিভাইভালও রেনেসাঁসের অন্য নাম। আমাদের রেনেসাঁস যদি ইটালির সঙ্গে আদৌ তুলনীয় না হত তাহলে কেউ একে রেনেসাঁস নাম দিয়ে শব্দটির অপব্যবহার করতেন না। অপরপক্ষে রেনেসাঁস বলে অভিহিত হলে ইটালির সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে এতটা প্রত্যাশা করলে একদেশের সঙ্গে আরেক দেশে ষোলো আনা মিল কল্পনা করতে হয়। ইতিহাসে কোনো দুটো রেভোলিউশনই একইরকম নয়। তা হলে কোনো দুটো রেনেসাঁসই-বা কেন একইরকম হবে? মাটি আলাদা, মন আলাদা, ইতিহাস আলাদা, ঐতিহ্য আলাদা। বাংলার রেনেসাঁস তাই ইটালির অনুরূপ হয়নি। তা সত্ত্বেও রেনেসাঁস বলে তাকে চেনা যায়। বিভ্রান্তি ঘটে রিভাইভাল যখন রেনেসাঁসের নাম অধিকার করতে চায়।

আমার নিজের ধারণা পঞ্চাশ বছর আগে যেমনটি ছিল এখন তেমনটি নয়। ধীরে ধীরে তার বিবর্তন হয়েছে। এখন আমার স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, আমাদের রেনেসাঁস এসেছিল সাত সমুদ্র পার হয়ে পশ্চিম ইউরোপ থেকে। কালপারাবার পার হয়ে প্রাচীন ভারত থেকে নয়। প্রাচীন ভারত থেকে যেটা আসে সেটার নাম রিভাইভাল। দুটো স্রোতই প্রায় সমসাময়িক, কিন্তু সমান প্রবল নয়। প্রথম দিকে রেনেসাঁস ছিল প্রবলতর। পরবর্তীকালে রিভাইভালই প্রবলতর হয়। আরও পরে রেনেসাঁসের উপর থেকে দেশের লোকের মন উঠে যায়। ওটা যেন স্বাদেশিকতা ও স্বাধীনতাকামনার বিপরীত মেরু। আরও পরে বুদ্ধিমানেরা আবিষ্কার করেন যে ওটা বিদেশি ধনতন্ত্র আর স্বদেশি বুর্জোয়াচক্রের ভাববিলাসিতা। সত্যিকার রেনেসাঁস নয়। মিথ্যে ফাঁকি।

এতকাল আমরা যেটাকে বাংলার রেনেসাঁস বলে ঠিক করেছি বা ভুল করেছি সেটা ছিল অবিভক্ত বাংলার ব্যাপার। পার্টিশনের পর পূর্ব বাংলা—এখন তো বাংলাদেশ—নতুন করে জেগে ওঠে। সেখানে দেখা দেয় দ্বিতীয় এক রেনেসাঁস। প্রথম রেনেসাঁসে নায়কদের মধ্যে ইউরোপীয় ছিলেন, খ্রিস্টান ছিলেন, কিন্তু মুসলমান ছিলেন না। দ্বিতীয় রেনেসাঁসের নায়করা প্রায় সকলেই মুসলমান। এবার তাঁরা পা মিলিয়ে নিচ্ছেন। প্রথম রেনেসাঁস ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। দ্বিতীয় রেনেসাঁস হচ্ছে ঢাকাকেন্দ্রিক। এর পূর্বাভাস পার্টিশনের পূর্বেই সূচিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনতিকাল পরে। মুসলিম বুদ্ধিজীবীমহলে যখন জগৎ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে, মানুষ সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে নতুন করে অনুসন্ধিৎসা জাগে। তখন একে বলা হত 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন। এর নায়কদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন আবুল হোসেন ও কাজি আবদুল ওদুদ। গত শতাব্দীর ডিরোজিয়ো ও তাঁর 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর সঙ্গেই এঁদের তুলনা। এঁরাও গোঁড়াদের বিষনজরে পড়েন। এক্ষেত্রেও প্রবাহিত হচ্ছিল রিভাইভালের স্রোত—মুসলিম রিভাইভালের। রিভাইভালই প্রবলতর, রিভাইভালের স্রোতের তোড়ে দেশ ভেঙে যায়। তারপরে যখন ভাষার প্রশ্নে একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদের রক্তে ঢাকার মাটি রঞ্জিত হয় তখন সে-মাটিতে জন্ম নেয় দ্বিতীয় রেনেসাঁস। মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের রক্ত তাকে আরও শক্তি জোগায়। 'বাংলার রেনেসাঁস' না বলে এর নাম রাখা যাক 'বাংলাদেশের রেনেসাঁস'।

প্রথম রেনেসাঁস এখনও অসমাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্ধানে সেনি:শেষিত হয়নি। আমাদের মনে জগৎ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে, মানুষ সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে অফুরন্ত জিজ্ঞাসা। তাই আমাদের রেনেসাঁস চলছে, চলবে।

১৪ আগস্ট ১৯৭৪

অন্নদাশঙ্কর রায়

পুনশ্চ,

দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত বাংলা 'রেনেসাঁসের নবপর্যায়' ও 'বাংলার রেনেসাঁস: পুনর্ভাবনা'।

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮০

অন্নদাশঙ্কর রায়

ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছিলুম যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় তথা ভারতে একটা নবজন্ম ঘটে গেছে, ফরাসিতে যাকে বলে রেনেসাঁস। কী জানি কেন ওই ফরাসি প্রতিশব্দটাই লোকে পছন্দ করে। যাঁদের বিদেশিতে আপত্তি তাঁরা বলেন নবজাগরণ। কিন্তু তাঁরাও স্বীকার করেন যে, গত শতাব্দীতে একটা নবজাগরণ ঘটে গেছে।

সম্প্রতি এক সেমিনারে গিয়ে শুনলুম রেনেসাঁস বা নবজন্ম বা নবজাগরণ বলে যাকে চিহ্নিত করা যায় তেমন কিছুই ঘটেনি। কারণ, দেশটা ছিল পরাধীন ও জনগণ ছিল শোষিত ও নিরক্ষর। সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের আওতায় মুষ্টিমেয় অভিজাত বা ভদ্রলোক শ্রেণির সাহিত্যিক বা শিল্পী বা মনীষী কি রেনেসাঁসের মতো অত বড়ো একটা ব্যাপার ঘটাতে পারতেন? পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ফ্রান্স বা ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তার কি কোনো সাদৃশ্য ছিল? যেটা রেনেসাঁস নয় সেটাকে রেনেসাঁস বলে ভ্রম করা হয়েছে।

আবার এমন কথাও শোনা গেল যে বাংলার রেনেসাঁস তো চৈতন্যদেবের সময়েই ঘটেছিল। বৈষ্ণব পদাবলি যার সাক্ষী। অমন অপূর্ব জাগরণ যে-দেশে ঘটেছিল, সে-দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এমন কী ঘটল যে তাকেই বলতে হবে রেনেসাঁস? যেটা রেনেসাঁস নয় সেটাকে রেনেসাঁস বলে ভ্রম করা হচ্ছে।

বুঝতে পারা যাচ্ছে দেশে দুই দল ভাবুক আছেন। যাঁরা দেশাভিমানী তাঁরা বলবেন, দেশের রেনেসাঁস দেশের অতীত থেকে বা দেশের মাটি থেকেই জন্মায়। ইউরোপে যেমন জন্মেছিল। রেনেসাঁসের বীজ বাইরে থেকে উড়ে আসে না সমসাময়িক কালের হাওয়ায়। আর যাঁরা সমাজবাদী, তাঁরা বলেন, সত্যিকার রেনেসাঁস কখনো উপরের স্তর থেকে হতে পারে না, হতে পারে নীচের স্তর থেকে। সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও দেশি-বিদেশি ধনতন্ত্র মিলে রেনেসাঁস ঘটাতে পারে না, পারে জাগ্রত জনগণ।

এই নেতিবাদী মনোভাব আমার ছেলেবেলায় ছিল না। স্বদেশি যুগের নেতারাও স্বীকার করতেন যে বিদেশি শাসন যতই মন্দ হোক-না কেন, সেই অন্ধকারের ভিতরেও আলোর দেওয়ালি জ্বলেছিল। জ্ঞানের আলো এসে অজ্ঞানের আঁধার দূর করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

তবে ইউরোপেও আজকাল রেনেসাঁসের সংজ্ঞা ও সময় নিয়ে নানা মত। কারো কারো মতে রেনেসাঁস শুরু হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুর্কদের কনস্টান্টিনোপল অধিকার ও গ্রিক পন্ডিতদের ইটালিতে আশ্রয়লাভের সময় থেকে নয়; আরও আগে থেকে। যখন আরবরা স্পেন অধিকার করে ও তাদের সঙ্গে গ্রিক গ্রন্থের আরবি তর্জমা ইউরোপের নজরে পড়ে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় তো তখন থেকেই প্রতিষ্ঠিত। এঁদের মত মেনে নিলে মহাকবি দান্তেও রেনেসাঁসের সন্তান। এটা কিন্তু অধিকাংশের মত নয়। অথচ এটার পক্ষে প্রবল যুক্তি হল দান্তের যুগে ল্যাটিন থেকে ইটালিয়ান ভাষার উত্তরণ, অবজ্ঞাত লোকভাষায় নিখুঁত ছন্দ নিখুঁত মিল বিদগ্ধ চিন্তা গভীর অনুভূতি।

সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষার উত্তরণ, হিন্দি ভাষার উত্তরণ; অন্যান্য লোকভাষার উত্তরণও কি অনুরূপ ঘটনা নয়? সেটা যদি রেনেসাঁসের লক্ষণ না হয়, তবে কীসের লক্ষণ? সেইজন্যে রেনেসাঁসের সংজ্ঞা সম্বন্ধে একমত হওয়া শক্ত। অধিকাংশের মতে রেনেসাঁসের প্রধান লক্ষণ হল দিব্যচেতনার পরিবর্তে মানবিক

চেতনা, ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্তে বস্তুজ্ঞান, পারলৌকিক বা অলৌকিক কার্যকারণ পরম্পরার পরিবর্তে ঐহিক বা প্রাকৃতিক কার্যকারণ পরম্পরা, ভক্তির পরিবর্তে যুক্তি, আপ্তবাক্যের পরিবর্তে প্রমাণসিদ্ধ বাক্য, অথরিটির পরিবর্তে লিবার্টি। প্রাচীন গ্রিসে এসব ছিল। খ্রিস্টধর্ম প্রবর্তনের ফলে এসব রহিত হয়। সব কিছুর জন্যে বাইবেলে যেতে হয়। *বাইবেলই* ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন। তাহলে মানবমনের বিকাশ হবে কী করে? মানুষের কি কেবল আত্মা আছে? মন নেই, দেহ নেই? দেহ থাকলে শারীরতত্ত্বও জানতে হয়। শারীরতত্ত্ব জেনে মানুষের ছবি আঁকতে হয়, মূর্তি গড়তে হয়। শারীরতত্ত্ব জানতে হলে শবব্যবচ্ছেদ করতে হয়। এসব যে নিষিদ্ধ।

প্রাচীন গ্রিসের সঙ্গে একটা ছেদ বা ডিসকন্টিনিউইটি ঘটেছিল। তার ফলে এনেছিল একপ্রকার অন্ধকার, সেটা মনের রাজ্যে। তেমনি একপ্রকার অবদমন, সেটা দেহের রাজ্যে। মানবমনকে বিশ্বপ্রকৃতিকে শৃঙ্খলিত করে যে শৃঙ্খলা, তার থেকে মুক্তির জন্যেও আকুলতা জেগেছিল। আবশ্যক হয়েছিল আরও একটা ছেদ, আরও একটা ডিসকন্টিনিউইটি। এবার প্রাচীন গ্রিসের সঙ্গে নয়, মধ্যযুগের শাস্ত্রনিবদ্ধ চার্চশাসিত বিদ্যার সঙ্গে। তাই পুরাতন বিদ্যার জায়গায় এল নতুন বিদ্যা—ওল্ড লার্নিং-এর জায়গায় নিউ লার্নিং। এটা একটা নতুন ধর্ম নয়, একটা নতুন মনোভাব। এটা ধর্মের সঙ্গে মেলে না বলে এর নাম দেওয়া হয় মানবিকবাদ বা হিউম্যানিজম। মানুষই সব কিছুর মাপকাঠি। পৃথিবী স্থির না অস্থির এই নিয়ে যে বাদবিসংবাদ ঘটে, সেটা আসলে খ্রিস্টীয় বা ধর্মীয় বিশ্ববীক্ষার পক্ষে জীবন-মরণের প্রশ্ন। পৃথিবী অস্থির হলে তো সব কিছুই অস্থির।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের আরও একটা দিক ছিল। শিল্পের দিক। ধর্মের আঁচল ধরা জ্ঞানের মতো ধর্মের আঁচল ধরা সৌন্দর্য কয়েকটি ধর্মীয় বিষয়ে নিবদ্ধ ছিল। তার বাইরে গেলেই আধ্যাত্মিক বা নৈতিক অর্থে পতন। রেনেসাঁস দিল শিল্পীকে মুক্তি। গ্রিক রোমক দেবদেবীর অস্তিত্বে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস না থাকলেও তাদের পৌরাণিক কাহিনিকে চিত্রভাস্কর্যে রূপায়িত করা হল। আঁকা হল, গড়া হল নগ্নকায় ভেনাস। এক এক করে নিষেধের গন্ডি লঙ্ঘন করা হল। যে গন্ডি প্রাচীন ঐতিহ্যের নয়, মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যের। এক্ষেত্রে প্রাচীন আধুনিক পরস্পরের বন্ধু। আধুনিকদের প্রেরণার উৎস প্রাচীন ক্ল্যাসিকাল সাহিত্য ও শিল্প। এক-একটি প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কৃত হয় আর সাহিত্যিক বা শিল্পীরা নতুন প্রেরণা পেয়ে সৃষ্টিতৎপর হন। তাতে হয়তো খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে অসঙ্গতি বা বিচ্ছেদ হল, কিন্তু তার জন্যে কেউ দ্বিধান্বিত নন।

অতীতের পুনরাবিষ্কারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে বহির্বিশ্ব আবিষ্কার। আকাশের গ্রহনক্ষত্রের মতো পৃথিবীর সাগর-মহাসাগর দেশ-মহাদেশ। আগেকার দিনে লোকের ধারণা ছিল স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল পরস্পরসংলগ্ন। তার চিত্র আঁকা হত। কোথাও তার কোনো সমর্থন পাওয়া গেল না। ভূগর্ভে আর যা-ই থাক পাতাল নেই। আকাশে আর যা-ই থাক স্বর্গ নেই। বাইবেলের জগৎ বিজ্ঞানের জগতের সঙ্গে মেলে না। মানুষ কোনটা বিশ্বাস করবে? ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের জগৎকেই স্বীকার করে নিল। বাইবেলের জগৎ যে সহজে পথ ছেড়ে দিল তা নয়। রেনেসাঁসের পর এল কাউন্টার রেনেসাঁস। সাহিত্যের উপরে, বিজ্ঞানের উপরে এমন উপদ্রব শুরু হল যে, ইটালির রেনেসাঁস এক শতাব্দীর মধ্যেই স্তব্ধ। তারপরের শতাব্দীটা তার তুলনায় বন্ধ্যা। অন্যান্য দেশেও এর অনুরূপ দেখা যায়। তবে যেসব দেশে খ্রিস্টধর্মের রিফর্মেশন ঘটে সেই প্রোটেস্টান্ট দেশগুলিতে কাউন্টার রেনেসাঁস তেমন অত্যাচার করতে পারে না। আর ফ্রান্স যদিও ক্যাথলিক দেশ তবু সেইখানেই দেখা দেয় অষ্টাদশ শতাব্দীর এনলাইটেনমেন্ট। যার মানসসন্তান ফরাসি বিপ্লব। এই চারটি যুগান্তকারী পর্যায় এক শতাব্দী কালের মধ্যে উপস্থিত হয়নি। মোটামুটি চার শতাব্দী সময় নিয়েছে। এই চার শতাব্দীর ঐতিহাসিক বিবর্তন একসঙ্গে এসে সমাগত হয় আটলান্টিক ও ভারতমহাসাগর পার হয়ে বাংলার উপকূলে। তথা ভারতবর্ষের উপকূলে। তাদের স্বাগত জানান সর্বপ্রথম রামমোহন রায়। তিনি যেন তাদেরই অপেক্ষায় অন্ধকার রাত্রে জাগ্রত ছিলেন। বিদেশি বিধর্মী ও বিজেতার সঙ্গে তিনি তাদের ঘুলিয়ে ফেলেন না। পৃথিবীর একপ্রান্তের ঐতিহাসিক পরিবর্তন অপর প্রান্তের ঐতিহাসিক পরিবর্তন উদবোধন করতে পারে। রামমোহন বিশ্বাস করতেন যে, বাংলায় তথা ভারতে অনুরূপ পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। সূচনা যাঁরা

করেন, তাঁরা সব দেশেই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তি। কেউ-বা অভিজাত কেউ-বা মধ্যবিত্ত। জনগণ হঠাৎ একদিন জেগে উঠে রেনেসাঁসও করেনি, রিফর্মেশনও না, এনলাইটেনমেন্ট তো নয়ই। এক ফরাসি বিপ্লবেই জনগণকে রঙ্গমঞ্চে দেখা গেল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসি বিপ্লবের পুনরাবৃত্তির লেশমাত্র সম্ভাবনা ছিল না এদেশের মাটিতে। প্রথম তিনটির অনুবৃত্তির সম্ভাবনা যে ছিল এটা রামমোহনের চোখে পড়ে।

আমাদের রেনেসাঁস ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঘটেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে ধারাবাহিকতার সূত্রে আসেনি। ইউরোপের ইতিহাস থেকে আবির্ভূত হয়েছে। কিছুকালের জন্য ভারতের ইতিহাস ইউরোপের ইতিহাসের সামিল। গোড়ায় অর্থনৈতিক অর্থে, পরে রাজনৈতিক অর্থে, শেষে সাংস্কৃতিক অর্থে। ইচ্ছা করলে তৃতীয়টাকে প্রতিরোধ করতে পারা যেত। বলতে পারা যেত চাইনে রেনেসাঁস, চাইনে রিফর্মেশন, চাইনে এনলাইটেনমেন্ট। পরবর্তীকালে বলাও হল। কিন্তু রামমোহন ও তাঁর সহযোগীরা বহিরাগত ভাবধারাকে সাদরে আবাহন করেন। দেশজ না হলেও কালোপযোগী বলে। সেনা এলে আধুনিক যুগটাই আসত না। নতুন ভোরের আলোর রেখাও আসত না।

আমাদের রেনেসাঁস ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মতো মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে আধুনিক যুগের আলোকে উত্তরণ। আমাদের রিফর্মেশন অর্থাৎ ধর্মসংস্কার তথা সমাজসংস্কার আমাদের রেনেসাঁসের সমকালীন, যদিও স্বতন্ত্র। আমাদের এনলাইটেনমেন্ট স্বতন্ত্র নয়, যদিও সমকালীন। রামমোহনের মধ্যে তিনটেই একসূত্রে গ্রথিত। ফরাসি বিপ্লবের সঞ্চালিকা ভাবধারাও তাঁর মধ্যে কাজ করছিল, তিনিও ভালোবাসতেন সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা। তবে বিপ্লবটার অনুরূপ তাঁর স্বকালে ও তাঁর নেতৃত্বে সংঘটিত হয়নি। আপাতত রেনেসাঁস নিয়েই আমাদের আলোচনা। রিফর্মেশন আমাদের আলোচ্য নয়। এনলাইটেনমেন্ট অর্থাৎ রুশো ভলতেয়ার দিদেরো প্রভৃতিকে রেনেসাঁসের কোটায় ফেলা যায় না। অথচ আমাদের ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী এঁদের দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত যে, এনলাইটেনমেন্টকে বাদ দিলে ইয়ংবেঙ্গলকেও বাদ দিতে হয়। আর ইয়ংবেঙ্গলকে বাদ দিলে আমাদের রেনেসাঁস অঙ্গহীন হয়। আসলে আমাদের রেনেসাঁস ইউরোপের চার শতাব্দীর বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ও বিমিশ্র অনুবর্তন। অথচ অনুকরণ নয়। আমরা কতক নিয়েছি কতক বাদ দিয়েছি। আমাদের প্রেরণার উৎস খ্রিস্টপূর্ব গ্রিস নয়। ইসলামপূর্ব ভারত নয়। প্রতীচ্যের নতুন বিদ্যা, নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান।

খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য তার পূর্ববর্তী গ্রিক ঐতিহ্যকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করত। আর আপনাকে করত আলোকের সঙ্গে। রেনেসাঁসের পর হিউম্যানিস্টদের একভাগ খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যকেই অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করেন, আর পুনরুদিত গ্রিক ঐতিহ্যকে আলোকের সঙ্গে। মধ্যযুগের অন্য নামই হল অন্ধকার যুগ। অথচ সেই যুগটাই ছিল খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যের একচ্ছত্র আধিপত্যের যুগ। আমাদের এদেশে যাঁরা রেনেসাঁসের দীক্ষা নিলেন তাঁদের মধ্যে একভাগ বলতে আরম্ভ করলেন যে আমাদের মধ্যযুগটাও ছিল অন্ধকার যুগ। কিন্তু সেকথা বললে কেবল যে ইসলাম প্রভাবিত আরব্য ও পারসিক ঐতিহ্যকে খর্ব করা হয় তাই নয়, নানক কবীর চৈতন্য প্রবাহকেও উপেক্ষা করা হয়। মধ্যযুগ নিয়ে এই যেমন সমস্যা, তার পূর্ববর্তী যুগ নিয়েও তেমনি আরেক। ইসলামি ধর্ম প্রচারকরা হয়তো তাকে অন্ধকার যুগ বলে শ্রদ্ধা করে থাকবেন, কিন্তু প্রাচীন আরবরা প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। প্রাচীন পারসিকরাও। ইসলাম এতে দেশসুদ্ধ মানুষকে মুসলমানও করেনি, খ্রিস্টধর্ম যেমন করেছিল ইউরোপের মানুষকে। তেমন কোনো ছেদ বা ডিসকন্টিনিউইটি ইউরোপের মতো ভারতের পূর্বতন ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘটেনি। সেটা ঘটে থাকলে পরে আবার পূর্বতন ঐতিহ্যকে পুনরাবিষ্কার করে মধ্যযুগের অন্ধতার সঙ্গে ছেদ বা ডিসকন্টিনিউইটির প্রশ্ন উঠত।

এদেশে প্রাচীন ভারতীয় বা হিন্দু সংস্কৃতি প্রাচীন গ্রিক সংস্কৃতির মতো আচ্ছন্ন বা বিলুপ্ত হয়নি। মধ্যযুগের ইসলামি বা আরব্য পারসিক সংস্কৃতি তাকে আচ্ছন্ন বা বিলুপ্ত করতে চায়নি বা পারেনি। যেকোনো দেশে যেকোনো যুগে নবজাগরণ ঘটতে পারে, কিন্তু যেকোনো নবজাগরণই রেনেসাঁস নামের যোগ্য নয়। যেখানে ছেদ নেই, ডিসকন্টিনিউইটি নেই, সেখানে অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তরণের প্রশ্ন ওঠে না। তা সেখ্রিস্টীয় আলোকই হোক আর গ্রিক আলোকই হোক। অবিকল ইউরোপীয় অর্থে রেনেসাঁস এদেশে ঘটবার কথা নয়।

কিন্তু একথা তো অস্বীকার করা যায় না যে বস্তুজগৎ সম্বন্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয়দের যে জ্ঞান ছিল সেজ্ঞান অজ্ঞান। অজ্ঞানের পরিণাম জ্ঞানের হাতে পরাজয়। অন্ধকারের পরিণাম আলোকের কাছে পরাভব। আরও আগে ইসলামধর্মী আরব, তুর্ক ও মোগলদেরও বস্তুজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান খুব বেশি না হলেও তুলনায় বেশি ছিল। দেশ-বিদেশ ঘুরে ভূগোলটা তারা আরও ভালো জানত। আর সমুদ্রযাত্রা তথা স্থলপথে বিদেশযাত্রা নিষিদ্ধ করে ভারতের মধ্যযুগের হিন্দুরা স্বেচ্ছায় কূপমন্ডূক হয়েছিল। একই কালে তাদেরই মতো কূপমন্ডূক হয়েছিল চীনারা, জাপানিরাও।

কোনো এক অজ্ঞাত কারণে কেবল ভারত নয়, চীন-জাপান-তিব্বতও তাদের ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে পর্দানশিন বনে। পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে ইউরোপের অভিযাত্রীরা এসে তাদের ঘোমটা খুলে দেয়। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঘটে লাসার অবগুণ্ঠন উন্মোচন। যাঁর দ্বারা তাঁর নামটিও তেমনি। ইয়ং হাজব্যাণ্ড। জাপানিরা রাতারাতি ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সাদরে বরণ করে নেয়। চীনারা তাদের অহংকার ছাড়ে না। দীর্ঘসূত্রিতা করে। তবু তারাও ওর মূল্য বোঝে। অবুঝ কেবল তিব্বতিরা। চীন কমিউনিস্ট হবার পর তিব্বত থেকে যাঁরা পালিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন একজন পন্ডিত। একখানি পুথি দেখিয়ে আমাকে বলেন, 'আমার হাতে প্রমাণ আছে। আমি প্রমাণ করে দিতে পারি যে পৃথিবীটা গোল নয়।'

আমাদের এদেশেই অনবগুণ্ঠন সকলের আগে ঘটে। এদেশে রেনেসাঁস হয়নি বলা যেমন কঠিন, হয়েছে বলাও তেমনি। কারণ বিস্তর পন্ডিত আছেন যাঁদের হাতে প্রমাণ রয়েছে যে রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। তা ছাড়া রেনেসাঁস তো একটা সাধারণ শব্দ নয়, একটা বিশেষ শব্দ। যেটা ইটালির বেলা প্রয়োগ করা হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে একটি বিশেষ অবস্থায়, সেটা যত্রতত্র যেকোনো শতাব্দীতে যেকোনো অবস্থায় প্রয়োগ করলে তার অর্থ বদলে যায়। রেনেসাঁস সেইখানেই আর তখনই হয় যেখানে ও যখন শাস্ত্র আর বিজ্ঞান ফারাক হয়ে যায়, থিয়োলজি আর ফিলসফি ফারাক হয়ে যায়, পুরাণ আর ইতিহাস ফারাক হয়ে যায়, ল্যাটিন আর ইটালিয়ান, সংস্কৃত আর বাংলা ফারাক হয়ে যায়। জার্মানির মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিন থিয়োলজির চেয়ার ছাড়া আরও একটা চেয়ার সৃষ্টি হয়। তার নাম ফিলসফির চেয়ার। ফিলসফি তার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পরে ন্যাচারাল ফিলসফি বলে নতুন একটি বিভাগ খোলা হয়। যার অপর নাম বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞান থেকে এখন আলাদা হয়ে গেছে সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান। প্রত্যেকেই স্বাধীন। এটা শুধু মারবুর্গে নয়, ইউরোপের সর্বত্র। এখন তো পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে।

রামমোহন রায়ই প্রথমে উপলব্ধি করেন যে এদেশে থিয়োলজি শিক্ষার নতুন কোনো দরকার নেই, দরকার ফিলসফি তথা বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থার। তিনি স্বয়ং ছিলেন জবরদস্ত মৌলবি, প্রচন্ড বৈদান্তিক, প্রগাঢ় খ্রিস্টভক্ত। কিন্তু দেশবাসীর জন্যে যে-শিক্ষা তিনি ও তাঁর সহযোগীরা মিলে প্রবর্তন করেন সেটা মারবুর্গের তিন শতাব্দী পূর্বের সেই স্বাধীন মানবিক বিদ্যার অনুবর্তন। ততদিনে সেটার আরও ভাগ-বিভাগ হয়েছে। ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে থিয়োলজি তখনও সহ-অবস্থান করছিল। কিন্তু ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ব সম্পূর্ণ বাদ যায়।

ইউরোপের সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অন্তরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেও প্রাচীন গ্রিসকে প্রেরণার উৎস বলে মেনে নিতে রামমোহন বা তাঁর সমকালীন কেউ ইচ্ছুক ছিলেন না। প্রাচীন গ্রিসের স্থানে তাঁরা অভিষেক করেছিলেন প্রাচীন ভারতকে। এক্ষেত্রে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর প্রতিপক্ষদের বিবাদ যা ছিল তা ধর্ম বা সমাজনিবদ্ধ। তাঁদেরই মতো রামমোহনেরও প্রতিষ্ঠাভূমি ছিল সংস্কৃত ভাষা ও আর্য সংস্কৃতি। খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভের জন্যে গ্রিক ভাষা শিক্ষা করলেও তিনি *ইলিয়াড ওডিসি* বা গ্রিক ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে কৌতূহলী ছিলেন কি না সন্দেহ। সম্ভবত গ্রিকদর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন মাদ্রাসায় আরবি ভাষায়। গ্রিক সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা আসে রামমোহন-পরবর্তী কালে। মধুসূদন হোমার পড়ে প্রভাবিত হন। ইলিয়াডের আলোয় রামায়ণের ইন্টারপ্রিটেশন দেন। সেটা কিন্তু একটা ব্যতিক্রম। বাংলার রেনেসাঁস গ্রিসের দিকে তাকায়নি, তাকিয়েছে ইংল্যাণ্ডের দিকে; সেও আধুনিক ইংল্যাণ্ড। ইউরোপের রেনেসাঁসের যেটা প্রতিষ্ঠাভূমি বাংলার বা

ভারতের রেনেসাঁস তার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়নি, হয়েছে আধুনিক ইউরোপের প্রতি। আধুনিক ইউরোপই এক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রিসের ভূমিকা নিয়েছে।

রেনেসাঁসের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে সর্ববিষয়ে কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসা। আর একটা মানবজীবনকে সর্বপ্রকারে ভরিয়ে নেওয়া ও বিকশিত করা। এ দুটি লক্ষণ ইউরোপের মতো বাংলায় তথা ভারতেও দেখা দিল। তেমনি আরও একটি লক্ষণ হল মানবিক ব্যাপারে অতিপ্রাকৃতের হস্তক্ষেপ স্বীকার না করা। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের পরতে পরতে দেব-দেবীর পদক্ষেপ ও হস্তক্ষেপ। দেব-দেবীর কোপে মানুষের সর্বনাশ, দেব-দেবীর বরে মানুষের সর্বসিদ্ধি—এই যে সাহিত্যের নিয়ম তা সংস্কৃতে লেখা না হয়ে বাংলায় লেখা হয়েছে বলেই কি রেনেসাঁসের সূচক? কিন্তু ইংরেজি ভাষায় নতুন বিদ্যা প্রবর্তনের পর যে সাহিত্যের উদয় হল তার আলোয় অতিপ্রাকৃতের ছায়া সরে গেল। কদাচিৎ একজন সাধু বা সন্ন্যাসী এসে পরিস্থিতি বাঁচান, কিন্তু চন্ডী বা কালী বা ধর্মঠাকুর আর আসেন না। নব্যশিক্ষিত পাঠক অমন নভেল পড়বেন না, অমন নাটক দেখবেন না।

এই যে নতুন শিক্ষা, এটাই ইউরোপের নিউ লার্নিং; যা মধ্যযুগকে অপসারণ করে আধুনিক যুগের পত্তন করেছিল সেখানে। এখানেও তার একই ভূমিকা। তফাতের মধ্যে এই যে এদেশের পড়ুয়াদের গ্রিক ল্যাটিন পড়তে হয় না, তার বদলে পড়তে হয় ইংরেজি। কিন্তু সেই ইংরেজির ভিতর লুকিয়ে থাকে গ্রিক ল্যাটিন শেখা মন। প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে। প্রাচীন গ্রিস রোম আমাদের ইংরেজি শিক্ষিতদের মনের উপর কাজ করে। আর তাঁরাই হন বাংলার নতুন সাহিত্যের প্রবর্তক।

দেখতে দেখতে গড়ে ওঠে বাংলা পদ্য, গোড়ার দিকে সংস্কৃত বা পারসিক ভাষায় শিক্ষিত পন্ডিত বা মুনশিদের হাতে। পরে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত সাহিত্যিক বা সাংবাদিকদের হাতে। এঁদের সামনে ছিল ইংরেজি মডেল। ইংরেজি পত্রিকা পড়ে এঁরা বাংলা পত্রিকা লেখেন। ইংরেজি কাব্য উপন্যাস পড়ে বাংলা কাব্য উপন্যাস। সংস্কৃত মডেল সামনে রেখে যাঁরা লিখতেন তাঁরাও ইংরেজির প্রতি আকৃষ্ট হন। যেমন সংস্কৃত রীতির কাব্যনাটকের সঙ্গে তেমনি গৌড়ীয় রীতির মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে ছেদ পড়ে যায়। এটাও একপ্রকার ডিসকন্টিনিউইটি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে না। এক পুরুষ কি দু-পুরুষ পূর্বের ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গেই পা মিলিয়ে নেয়। তবে প্রাচীন সংস্কৃতের সঙ্গেও যোগসূত্র রাখতে চায়। এইখানে বাংলার বা ভারতের রেনেসাঁস ইউরোপীয় রেনেসাঁসের থেকে ভিন্ন।

ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে গ্রিক ল্যাটিনের চর্চা হত তার কোনো ধর্মীয় ঝোঁক ছিল না। তার প্রবণতাটাই ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার। গ্রিক বা রোমক দেব-দেবীদের কেউ দেবতাজ্ঞান করত না, তাদের পায়ে মাথা ঠেকাত না। তারা যেন দেবতাই নয়, মানবমনের কল্পনা। আর এখানে মানুষ দেবতা হয়ে বসে আছেন। তাঁর মানবিক বিচার করে সাধ্য কার! দেবতারাও জাগ্রত! সংস্কৃতচর্চা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যা ছিল তা সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের নয়, প্রধানত হিন্দুশাস্ত্রের ও শাস্ত্রানুমোদিত সাহিত্যের। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে যেটুকু ছিল সেটুকু সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের ভগ্নাংশ। জার্মানিতে বা জাপানে গেলে তার চেয়ে অনেক বেশি সংস্কৃত পুথিপত্রের সন্ধান পাওয়া যেত। ইউরোপের লোকের *ইলিয়াড ওডিসি* পড়া আর ভারতের লোকের *রামায়ণ মহাভারত* পড়া দুই বিভিন্ন ধরনের পড়া। ওদের পড়া বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসাবে পড়া। এদের পড়া সাহিত্যচ্ছলে ধর্মগ্রন্থ হিসাবে পড়া। এ পড়ার মধ্যে বিচার নেই, বিশ্লেষণ নেই, লৌকিক অলৌকিক সব সমান সত্য। কেউ তর্ক করলে একটা রূপক ব্যাখ্যা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট একটা সেকুলার দিকও ছিল। কিন্তু সেটা বিলুপ্ত বা অনাবিষ্কৃত। অশোকের শিলালিপি, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মানসারের শিল্পসূত্র, ভরতের নাট্যশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের কামসূত্র ইত্যাদি সংস্কৃত কলেজ বা হিন্দু কলেজ বা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের বা তাদের অধ্যাপকদের বিদ্যার চতু:সীমার মধ্যে ছিল না। টোল

চতুষ্পাঠীর বিদ্যার্থী ও পন্ডিতদের বিদ্যার বিস্তারও সীমাবদ্ধ। রেনেসাঁসের প্রেরণা তার থেকে আসে না, আসে পূর্ববর্তী চার শতাব্দীর ইউরোপীয় বিবর্তন থেকে।

পূর্ববর্তী চার শতাব্দীতে ইউরোপ যদি এইভাবে বিবর্তিত না হত তাহলে এদেশেও রেনেসাঁস ঘটত না। শুধুমাত্র সংস্কৃতচর্চা করেই যে কেউ প্রাচীন ভারতের স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন পরীক্ষণ স্বাধীন জীবনকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবাহন করে নিয়ে আসতে পারতেন তা নয়। প্রাচীন গ্রিকবিদ্যার মতো প্রাচীন সংস্কৃতবিদ্যা মধ্যযুগে অচলিত ছিল না। আধুনিক যুগের বীজ নিহিত থাকলে ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু পূর্বেই ভারতে নবজাগরণ ঘটতে পারত। যে কারণেই হোক সংস্কৃতচর্চা থেকে ভারতে নবজাগরণ আসেনি, পারসিক চর্চা থেকেও না, বাংলা পদাবলি কীর্তন থেকেও না। এসেছে ইংরেজিচর্চা থেকে, ইংরেজিসূত্রে দর্শন-বিজ্ঞান ইতিহাস-ভূগোল ও নীতিচর্চা থেকে। অচলায়তনের নিষিদ্ধ দুয়ার খুলে গেছে। সেই দুয়ার দিয়ে এসেছে চার শতাব্দীর ইউরোপীয় বিবর্তন।

ইটালির বেলা যেমন গ্রিস, বাংলার বেলা তেমনি ইংল্যাণ্ড। ইটালির বেলা যেমন প্রাচীন যুগ বাংলার বেলা তেমনি পূর্ববর্তী চার শতাব্দী। উভয়ক্ষেত্রেই পুরাতন বিদ্যার স্থান অধিকার করে নূতন বিদ্যা। নতুন ধরনের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি। তবে রেনেসাঁস কেবল বিদ্বানদের ব্যাপার নয়। শিল্পীদেরও ব্যাপার। ইউরোপের রেনেসাঁসের নায়কদের মধ্যে ছিলেন একদিকে যেমন কোপারনিকাস, গালিলিয়ো, ব্রুনো, ইরাসমাস প্রমুখ জ্ঞানী তেমনি অপরদিকে লেওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, রাফেল, বতিচেলি প্রমুখ শিল্পী। জ্ঞানীদের উপর নির্যাতন যতখানি হয় শিল্পীদের উপর ততখানি নয়। কারণ তাঁরা খ্রিস্টীয় বিষয়েও ছবি আঁকতেন, মূর্তি গড়তেন, আবার পেগান বিষয়েও। রেনেসাঁসের জ্ঞানের দিকটা খ্রিস্টীয় চার্চের কোপদৃষ্টিতে পড়লেও শিল্পের দিকটা নীতির নামে পুনরায় অর্গলবদ্ধ হয় না। তবে লেওনার্দোকেও ভয়ে ভয়ে শবব্যবচ্ছেদ করে শারীরতত্ত্ব শিখতে হত একান্ত গোপনে। না শিখলে নতুন যুগ আনতে পারতেন না চিত্রকলায় বা ভাস্কর্যে।

নীতিনিপুণদের বিষদৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বা তার থেকে বাঁচিয়ে থিয়েটার, অপেরা ও ব্যালে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তেমনি নগরে নগরে যাদুঘর, আর্ট গ্যালারি ও কনসার্ট হল তৈরি হয়। রেনেসাঁসের পূর্বে ধর্মীয় সংগীত ও ধর্মীয় শিল্পের চর্চা ছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হল সেকুলার সংগীত ও শিল্প। যা-কিছু মানবিক তার মর্যাদা ও মূল্য অকস্মাৎ বেড়ে গেল। ধর্মের সঙ্গে পাল্লা দিল মানবিকবাদ। বিষয় সংগ্রহ করা হল কতক প্রাচীন গ্রিক রোমক উৎস থেকে, কতক দেশ-বিদেশের ইতিহাস বা কিংবদন্তি বা রূপকথার ভান্ডার থেকে, কতক-বা পরিচিত জনজীবন থেকে। শেক্সপিয়রের নাটক এই তিনটি সূত্র থেকে বিষয় আহরণ করে থিয়েটারের গতিনির্দেশ করে দেয়। এরপরে আর পিছুটান থাকে না। ধর্মনাট্য তার জনপ্রিয়তা হারায়। শেক্সপিয়রের যুগে অভিনেত্রীর যোগদান নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে নারীর ভূমিকায় নারীর অধিকার স্বীকৃত হয়।

কলকাতার পত্তনের পর থেকে স্থানীয় ইংরেজ সম্প্রদায় নিজেদের জন্যেও বইপত্র ও শিল্পকর্ম আমদানি করার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য নাটক প্রভৃতিরও আয়োজন করে। বাঙালিরা ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয়। প্রথমে তাদের বড়োলোকদের নজরে পড়ে গাড়ি বাড়ি আর আসবাবের উপর। ঔপনিবেশিক বাস্তুরীতির অনুসরণ করতে বাধে না। তারপর খানা বাদ দিয়ে পিনার উপর। স্বয়ং জাহাঙ্গির বাদশাহ সেটার সূত্রপাত করে দিয়ে যান কলকাতার পত্তনের পূর্বে। ইউরোপীয় চিকিৎসাবিদ্যাও প্রবেশ পায় মোগল অন্তঃপুরে। অস্ত্রশস্ত্রও আদৃত হয়। পলাশির আগেই ভারতের মাটিতে পাশচাত্য মিশাল জীবনযাত্রা শুরু হয়ে যায় ইউরোপীয় সমাজে তো নিশ্চয়ই, ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম সমাজেরও উপরতলায়। খ্রিস্টধর্মে আগ্রহ আকবর বাদশাহের ছিল, কিন্তু আর কারও ছিল না। অপরপক্ষে পাশচাত্য জীবনযাত্রার প্রতি ঔৎসুক্য আরও অনেকের ছিল। তা বলে তাঁরা কেউ পরাধীন হতে চাননি।

ইউরোপীয় আগন্তুকরাও জাহাজ বোঝাই করে এদেশের মরিচ-মশলা শালদোশালা ভোগ্যপণ্য ওদেশে নিয়ে যেতেন। কেউ কেউ নিয়ে যেতেন এদেশের পুরাকীর্তি ও পুথিপত্র। একদা পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের

যোগাযোগ ছিল, আদান-প্রদানও চলত। গ্রিস ভারতের কাছে নতুন নয়, ভারতও গ্রিসের কাছে নতুন নয়। তেমনি রোমও ভারতের কাছে নতুন নয়, ভারতও রোমের কাছে নতুন নয়। মাঝখানে হাজার খানেক বছর পুরোনো পথঘাট বন্ধ হয়ে যায় আরবদের দাপটে। আরবরা হয়ে যায় মুসলিম আর গ্রিক-রোমানরা খ্রিস্টান। কতকটা ধর্মীয় কারণে, কতকটা অর্থনৈতিক কারণে দুই পক্ষের মধ্যে এমন রেষারেষি হয় যে গ্রিস-রোমের লোক ভারতে আসার পথ খুঁজে পায় না, ভারতের লোক গ্রিস-রোমে যাবার পথ ফিরে পায় না। বাণিজ্যটা আরবদের হাত দিয়ে হয়, ওরাও মুনাফা লোটে। শেষকালে পোর্তুগালের নাবিকরা আফ্রিকার দক্ষিণ দিয়ে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে আসতে সমর্থ হয়। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে ভারতীয় নাবিকরাই আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল থেকে। কী করে তারা জানবে যে খাল কেটে কুমির ডেকে আনছে!

পোর্তুগাল অবশ্য রোম নয়, ইংল্যাণ্ডও নয় গ্রিস। এবারকার যোগাযোগটা ইউরোপের পূর্ব প্রান্তের সঙ্গে নয়, পশ্চিম প্রান্তের সঙ্গে। কিন্তু রেনেসাঁসের কল্যাণে পূর্ব-পশ্চিম দুই প্রান্তই এক সূত্রে গাঁথা হয়ে যায়। আর পোর্তুগাল ও ইংল্যাণ্ড থেকে যারা এসে হাজির হয় তারাও ভারতের পশ্চিম প্রান্তের সঙ্গে পূর্ব প্রান্তকে সমুদ্রপথে সংযুক্ত করে। মাঝখানে সে-সংযোগও আরবদের দ্বারা ছিন্নপ্রায় হয়েছিল। স্থলপথের যোগসূত্রও ছিল ক্ষীণ। ভারতবর্ষ বলতে যা বোঝাত তা ইউরোপের মতোই একটা মহাদেশ বা উপমহাদেশ। যেখানে এক রাষ্ট্র বা এক নেশন কোনোদিন গড়ে ওঠেনি। মাঝে মাঝে চক্রবর্তী রাজারা স্থাপন করেছেন সাম্রাজ্য। যেমন ইউরোপেও। সকলেই হিন্দু, এটা তেমনি একটা তথ্য যেমন ইউরোপের সকলেই খ্রিস্টান। খ্রিস্টান হলেই একজাতি হয় না, হিন্দু হলেও একজাতি হয় না। খ্রিস্টানরা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে তুর্কদের প্রশ্রয় দিয়েছে। হিন্দুরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে পাঠান বা তুর্কদের প্রশ্রয় দিয়েছে। তুর্করা আরবদের পদানত করে। মুসলমান বলে তুর্ক আর আরব একজাতি হয় না। পরে তো খ্রিস্টধর্মী ইউরোপীয়রাই তুর্কদের হাত থেকে আরবদের উদ্ধার করে। অবশ্য নিজেদের স্বার্থে। এখন আর কেউ আরব তুর্ক ভাই ভাই বলে না।

ইউরোপের রেনেসাঁস বাণিজ্যসূত্রে সমুদ্রপথে ভারতের উপকূলে পৌঁছোয়। কিন্তু পোর্তুগালের ধর্মান্ধতা তাকে রেনেসাঁসের বাহক করে না ; করে ইংল্যাণ্ডকে, ফ্রান্সকে। তাই রেনেসাঁসের প্রধান পীঠ হয় কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, সেইসঙ্গে পণ্ডিচেরি। ফরাসিরা ইংরেজদের কাছে হেরে যাবার পর পণ্ডিচেরির প্রাধান্য হ্রাস পায়। কলকাতা ইংরেজদের রাজধানী হবার পর থেকে কলকাতার প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। বাঙালিরা এই আকস্মিকতার সুযোগ লাভ করে। এটা দৈবলব্ধ। এর জন্যে তাদের আত্মপ্রসাদ সাজে না। তাদের কৃতিত্ব এইখানে যে তারাই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করে সাগরপারের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের রূপকথার রাজপুত্রদের স্বপ্ন সার্থক করবে। তারা সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে দেশ-দেশান্তরে যাবে। যেমন যেত জাভায় সুমাত্রায় সিংহলে। কে জানে কতকাল আগে!

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বাংলাতেই যে রেনেসাঁস সবচেয়ে বেশি জমল তার কারণ ওই সাগরপারের স্বপ্ন। রামমোহনকে, দ্বারকানাথকে যা অস্থির করে তুলল। মধুসূদনকে তো খ্রিস্টান করে ছাড়ল। সাগরপারের আকর্ষণ এত তীব্র না হলে এঁরা সাগরপারের চিন্তার ও বিদ্যার প্রতি এত সহজে আকৃষ্ট হতেন না। এঁদের প্রত্যেকের মধ্যে স্বাদেশিকতা প্রবল ছিল। এঁরা কেউ ঘরের থেকে বিযুক্ত হতে চাননি। অথচ বাইরের সঙ্গে যুক্ত হতে ব্যাকুল হয়েছিলেন এঁরা ও এঁদের মতো আরও অনেকে।

গ্রহণ করার ইচ্ছা না থাকলে, লোক না থাকলে ইউরোপীয়রা যা বহন করে নিয়ে এল তা কলকাতা শহরের সাহেবপাড়ার তাদেরই কাজে লাগত। তাদের দীপশিখা থেকে আর কারও দীপসলিতায় সঞ্চারিত হত না। দেশের মন প্রস্তুত না থাকলে বহিরাগত জ্ঞান বা শিল্পরস কোথাও ফুল ফোটায় না, ফল ধরায় না। ইউরোপেও এক দেশ থেকে অপর দেশে সঞ্চারিত হতে অনেক সময় লেগেছে। রাশিয়ার রেনেসাঁস ভারতের রেনেসাঁসের সমকালীন। জাপানের রেনেসাঁস আরও পরবর্তীকালের।

নতুন আইডিয়ার জন্যে বাংলার মন প্রস্তুত ছিল। পুরুষানুক্রমিক সংস্কৃত ও পারসিক প্রস্তুতির কাজ করে রেখেছিল। বহুকালের কর্ষিত ক্ষেত্রে নতুন বীজ বপন করতে না করতেই তা অঙ্কুরিত হল। সাত সমুদ্র

পারের অচেনা ভাষা অচেনা ভাব আত্মসাৎ করতে এক পুরুষও লাগল না। দেখা গেল ডিরোজিয়োর শিষ্যরা ইংরেজিতে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখছেন সহজাত প্রতিভার সঙ্গে। অথচ স্বদেশপ্রেম বিসর্জন না দিয়ে। টমাস পেইনের *যুক্তির যুগ* বইখানি প্রথমে একটাকা দামে, তারপর পাঁচ টাকা দামে বিকোয়। পাঠকদের কাছে দেশ যেমন প্রিয় যুগও তেমনি। দেশকে বাদ দিয়ে যুগ নয়, যুগকে বাদ দিয়ে দেশ নয়। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা যুগের সঙ্গে মন মিলিয়ে নেয়। মানুষের মন দেশের বেড়া মানে না। সমকালীন মনের সঙ্গে সাযুজ্য অন্বেষণ করে। তার জন্য যে পারে সশরীরে সাগর পাড়ি দেয়। যে পারে না সেঘরে বসেই সাগরপারের হাওয়া খায়। এর নিট ফল একপ্রকার 'সি চেঞ্জ'।

আমাদের যে রেনেসাঁস সেটা একপ্রকার 'সি চেঞ্জ'। সামুদ্রিক পরিবর্তন। একে কয়েক জন উচ্ছৃঙ্খল অনাচারী তরুণের অপকর্ম বলে উড়িয়ে দেওয়া বা বাড়িয়ে দেখা কোনোটাই যথার্থ নয়। যে মদ এদের মাতাল করেছিল সেটা নতুন বিদ্যা, নতুন ভাব, নতুন আইডিয়া, নতুন প্রকাশভঙ্গি, নতুন জীবনযাপনের ধারা। কয়েক শতক আগে ইটালিতে বা ইংল্যাণ্ডেও অনুরূপ দেখা গেছে। সময়কালে রাশিয়াতেও লক্ষিত হয়েছে। সেই মুহূর্তে উৎসাহীদের খেয়াল ছিল না যে দেশটা পরাধীন বা সমাজটা জমিদারদের অধীন। রেনেসাঁসের উদয়লগ্নে কোথাও কারও খেয়াল থাকে না। পরবর্তীকালে উন্মাদনা কেটে যায়। যেটা থেকে যায় সেটা ওই সি চেঞ্জ'। রূপান্তর একবার ঘটলে আর অঘটিত হয় না। পালটা যেটা ঘটে সেটা একপ্রকার কাউন্টার-রেনেসাঁস। এদেশে সেটা রিভাইভালের আকার নেয়। দেশের লোক স্বদেশসচেতন, অতীতসচেতন, অধীনতাসচেতন, শোষণসচেতন হয়। কিন্তু ওই সামুদ্রিক পরিবর্তনটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। ওটা অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

আমাদের রেনেসাঁসের দুর্বলতা এখানে নয় যে ওটাতে জনগণের যোগ ছিল না। কোন দেশের রেনেসাঁসেই-বা ছিল? আমাদের রেনেসাঁসের অপরাধ এখানেও নয় যে ওটা পরাধীন দেশের ও ফিউডাল সমাজের ফসল। একই অপরাধ অন্যত্রও দেখা যায়। কেউ কি বলতে পারেন যে স্বাধীন ভারতে ও শ্রেণিশূন্য রাশিয়ায় নতুন এক রেনেসাঁস ঘটেছে? গণচীনের খবর কি কেউ রাখেন?

তা নয়। আমাদের রেনেসাঁসের দুর্বলতা এইখানে যে ওর কোনো ক্ল্যাসিকাল বনেদ ছিল না। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ছিল। সেটা প্রাচীন গ্রিসে বনেদ। রামমোহন প্রাচীন ভারতের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করতে চেয়েছিলেন ধর্মে। বিদ্যাসাগর প্রাচীন ভারতের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করতে চেয়েছিলেন সমাজে। বাংলা গদ্যের পথিকৃৎরা অন্বয় রক্ষা করতে চেয়েছিলেন ভাষায়। সংস্কৃতানুসারী ভাষায়। কিন্তু কলেজে গিয়ে যাঁরা নতুন বিদ্যার পাঠ নিতেন তাঁদের সকলের আদর্শ ছিল ইংরেজি কাব্য নাটক উপন্যাস ও প্রবন্ধ। তাঁদের আদর্শ ছিল ইউরোপীয় থিয়েটার, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, বাস্তুরীতি, উদারনীতি। পরবর্তীকালে এর বিরুদ্ধে একটা স্বদেশি বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু বিদ্রোহীরাও ক্ল্যাসিকাল বনেদ খুঁজে পেলেন না। কতকগুলি ছবি আঁকা হল পৌরাণিক বিষয়ে, কিন্তু যে ধারায় আঁকা হল সেটা কি দু-হাজার বছরের পুরাতন ধারা? পুরাণ যে যুগের সেযুগের? ভাগ্যক্রমে অজন্তা আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু অজন্তার আদর্শে যা আঁকা হল তার বিষয় কি বৌদ্ধ জাতক? একালের চিত্রকররা আবার আধুনিক ইউরোপের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। যাঁরা লোকচিত্র বা পটচিত্র নিয়ে আছেন তাঁদের সেটা ক্ল্যাসিকাল বনেদ নয়।

আমাদের রেনেসাঁসের দুর্বলতা এখানেও নয় যে তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ পশ্চিমের তুলনায় বিলম্বিত ও খর্বাঙ্গ। এই দেড় শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এদেশে প্রচুর কাজ হয়েছে। আমরা খুব বেশি পিছিয়ে নেই। তেমনি সাহিত্যেও কাজ যা হয়েছে তার চেয়ে বেশি এত কম সময়ের মধ্যে হত না। বঙ্কিম মধুসূদন রবীন্দ্রনাথের মতো সৃষ্টি যেকোনো দেশের আধুনিক সাহিত্যে বিরল। আমাদের রেনেসাঁসের দুর্বলতা এইখানে যে তার শিল্পের দিকটা কাঁচা। যা নিয়ে আমরা গর্ব করি তা হয় প্রাচীনের হুবহু অনুকরণ বা অনুসরণ, যেমন কথাকলি বা ভারতনাট্যম বা মার্গসংগীত। আর নয়তো লোকনৃত্য বা লোকগীতি বা লোকনাট্য। তার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক অতি নিবিড় ও অতি পুরাতন। মধ্যযুগের মতোই। শিল্পে নতুন যুগ এসেছে, যেমন বিদ্যায় ও

সাহিত্যে নতুন যুগ এসেছে, একথা বলতে পারি কি আমরা! যেটুকু এসেছে সেটুকু পশ্চিমি প্রকৃতির ও পদ্ধতির।

তা ছাড়া এটাও মনে রাখতে হবে যে মধ্যযুগের খ্রিস্টীয় ইউরোপে যেসব বিষয় ও যেসব রীতি শিল্পীর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল মধ্যযুগের ইউরোপে সেসব নিষিদ্ধ ছিল না। মন্দিরচিত্র বা মন্দির ভাস্কর্যেও শিল্পীরা নর-নারীর বর্ণনা করেছে। *গোপী*দের বস্ত্রহরণের দৃশ্যে নগ্নতার কতটুকু বাকি ছিল! রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও প্রেমের অভিব্যক্তি শিল্পীদের যে অসীম স্বাধীনতা দিয়েছিল সেস্বাধীনতা সমসাময়িক ইউরোপে অকল্পনীয়। তাই রেনেসাঁসের বন্ধ মুক্তির প্রশ্নই ওঠেনি হিন্দু-শাসিত ভারতে। মুসলিম-শাসিত ভারতেও রাজপুত সামন্তরা তাঁদের শিল্পীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননি। তবে যেখানে মন্দিরনির্মাণ একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেখানে মন্দির ভাস্কর্য বা মন্দিরচিত্রও বন্ধ হয়ে গেছে। সেটা ইউরোপের মতো ব্যাপক ক্ষেত্রে নয়। দক্ষিণ ভারত ছিল হিন্দু শাসনে। আর মুসলিম শাসনও সর্বত্র অনুদার ছিল না।

শিল্পের মুক্তির জন্যে রেনেসাঁসের প্রয়োজন এদেশের ইতিহাসে ছিল না, যেমন ছিল ইউরোপের ইতিহাসে। তাহলে কি রেনেসাঁস বলতে যা বোঝায় তা এদেশের শিল্পের ক্ষেত্রে একেবারেই ঘটেনি বা ঘটবে না? না, একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে আমাদের আধুনিক শিল্পীরা কেউ দশানন বা পঞ্চানন আঁকেন না। দশভুজা বা চতুর্ভুজা গড়েন না যা পূজার সময় ফরমাশ দিয়ে গড়িয়ে নেওয়া হয়। ওকে ভাস্কর্যের নমুনা বলা হয় না। আর্ট থেকে অতিপ্রাকৃত অন্তর্হিত হয়েছে। প্রকৃতির হুবহু অনুকরণ কেউ চায় না, কিন্তু প্রকৃতিকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। এই পরিবর্তনটা এদেশে ইউরোপের রেনেসাঁসের ধারা বেয়ে এসেছে, প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে নয়।

জীবনের সমূহ বিভাগে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কোথাও কোনোকালে একসঙ্গে ঘটেনি। সামগ্রিক পরিবর্তনও এক-আধ শতাব্দীর ব্যাপার নয়। পাঁচ শতাব্দীকালও ইউরোপের পক্ষে যথেষ্ট হয়নি। আমাদের নতুন বিদ্যার প্রবর্তনের পর তো দেড় শতাব্দীও কাটেনি। একে যদি তিন ভাগে বিভক্ত করি তো এর প্রথম পর্বটা আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে জ্ঞানবুদ্ধি মিলিয়ে নেওয়ায়। দ্বিতীয় পর্বটা প্রাচীন ভারতের সঙ্গে চেতনা মিলিয়ে নেওয়ায়। তৃতীয় পর্বটা অভূতপূর্ব গণজাগরণের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নেওয়ায়। প্রথমটার অস্তিত্ব এখনও অনুভব করা যায়। সেটা এখনও অতিক্রান্ত হয়নি। দ্বিতীয়টাও যে সমাপ্ত হয়েছে তা নয়। প্রাচীনের চেয়ে আরও প্রাচীনের আবিষ্কার প্রতিনিয়ত চলেছে। তৃতীয়টার তো সবে সূত্রপাত। তিনটি পর্ব যেন তিনটি স্রোত। পাশাপাশি প্রবহমান। একটির সঙ্গে আরেকটির সংযোগও ঘটছে, সংঘর্ষও। গতি ও প্রতিক্রিয়া উভয়ই সজীব।

রেনেসাঁসের মহত্ত্ব এইখানে যে স্বর্গ ও নরক, পরলোক ও পরকালের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে মানুষ রিয়্যালিটির সন্ধানে লেগে যায়। ইহলোকে ও ইহকালে পরিপূর্ণ জীবনই হয় তার আদর্শ। সেটা যেমন ব্যক্তির বেলা তেমনি সমষ্টির বেলা। পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে দেহেরও অংশ আছে, মনেরও আছে, হৃদয়েরও আছে, বিবেকেরও আছে। কিন্তু কেবলমাত্র আত্মার পরিত্রাণের উপর জোর দিতে গিয়ে এদের যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হত না। রেনেসাঁস এদেরও গুরুত্ব দেয়। এদের গুরুত্ব দিতে গিয়ে হয়তো আত্মার পরিত্রাণের প্রশ্নটাকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেয় না। এতকাল যাঁরা গুরুজন ছিলেন তাঁদের গুরুত্ব হ্রাস পায়। তবে রেনেসাঁস রেভোলিউশন নয় যে ঈশ্বরকে বা ঈশ্বরের পুত্রকে বা তাঁর চার্চকে বা প্রতিনিধিকে সরাসরি অস্বীকার করবে। রেনেসাঁস রিফর্মেশনও নয় যে ঈশ্বরকে ও তাঁর পুত্রকে রেখে রোমান ক্যাথলিক চার্চকে ও পোপকে সরাসরি অস্বীকার করবে। এসব পরবর্তীকালে বিবর্তন। পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের আদিপর্ব বিশ্বাসী খ্রিস্টানদের পৃষ্ঠপোষকতা উপভোগ করেছিল।

রেনেসাঁসের সময় থেকে ইউরোপে যা হিউম্যানিজম বা মানবিকবাদ বলে অভিহিত হয় তারও পরবর্তীকালে বিবর্তন ঘটেছে। সেকালের মানবিকবাদীরা মানবের পরিপূর্ণ বিকাশে উৎসাহী হলেও মানবসত্যের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ সত্যেও বিশ্বাস করতেন। একালের মানবিকবাদীদের মধ্যে তাঁরাও যেমন আছেন তেমনি আরও আছেন একদল যাঁরা ঐশকে মানবের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত বা প্রমাণাতীত বলে মানবিক

ব্যাপারের বাইরে রাখতে চান বা স্রেফ অস্বীকার করেন। এঁদের মতে মানুষের কাজ মানুষকে নিয়েই থাকা আর মানুষের বাইরের ও ভিতরের প্রকৃতিকে। ভাগবত সত্তাকে নিয়ামক বলে স্বীকার করলে মানুষের আত্মশক্তির বিকাশই মানুষকে একদিন সর্বশক্তিমান করবে। জীবনকে করবে জরাব্যাধিমুক্ত। সংসারকে অভাবশূন্য।

রেনেসাঁসের পূর্বেও শোনা গেছে 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও শোনা গেছে যে, 'এই মানুষে আছে সেই মানুষ'। তার মানে ভগবানকে মানুষ বলে গণ্য করা হয়েছে। মানবিকবাদ মানুষকে বরাবরই উচ্চস্থান দিয়ে এসেছে, কিন্তু রেনেসাঁসের পর যে প্রকৃষ্ট স্থান দেয় তা সাধুসন্ত আউল-বাউল সুফি মিস্টিকদের দেওয়া স্থান নয়, ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক দার্শনিক সাহিত্যিক শিল্পীদের দেওয়া। *বাইবেল* বর্ণিত বিষয়ে ছবি আঁকা মূর্তি গড়া ধীরে ধীরে অচলিত হয়ে যায়। আমাদের দেশেও পৌরাণিক বিষয়ে ছবি আঁকা মূর্তি গড়া ধীরে ধীরে কমে আসছে। অবশ্য ওটা যাঁদের চিরাচরিত বৃত্তি তাদের কথা আলাদা।

রেনেসাঁসের পরেই মানুষ ইউটোপিয়ার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে। এমন এক রাজ্যের যেখানে সকলেই স্বাধীন, সকলেই সুখী, জীবনের সম্পদ সকলের ভাগ্যে, কেউ বঞ্চিত নয়। যেখানে আইন নিখুঁত, রাজনীতি নিখুঁত, অর্থনীতি নিখুঁত, কেউ কাউকে ফাঁকি দেয় না, শোষণ বা শাসন করেন না। যেখানে অপরাধ ঘটে না, অন্যায় ঘটে না, মানুষের সঙ্গে মানুষেও সম্বন্ধ স্বাভাবিক সৌহার্দ্যের। যেসব আদর্শ এতকাল স্বর্গের জন্যে তোলা ছিল এখন মর্ত্যের জন্যেও প্রত্যাশা করা হল। প্রত্যাশাটা স্বর্গের দেবতাদের কাছে নয়, মর্ত্যের প্রভুদের কাছে। স্বর্গের দেবতাদের সরানো যায় না, মর্ত্যের প্রভুদের উপর হতাশ হলে তাদের সরানো যায়। পুরাতন সমাজব্যবস্থাকে পালটানো যায়। পুরাতন বলে সেসনাতন নয়। মানুষের জন্যেই তার স্থিতি, তার জন্যে মানুষের স্থিতি নয়।

রেনেসাঁসের সময় থেকে ইউটোপিয়ার স্বপ্ন একভাবে-না-একভাবে মানুষকে প্রবৃত্ত করেছে এমনসব কর্মে যা পরলোকে বা পরকালে কাজে লাগবে না। যা এই জগৎটাকেই ও এই জীবনকেই আর একটু উপভোগ্য করবে, অন্তত আর একটু কষ্টশূন্য। ধর্মের মধ্যেও সমাজকল্যাণের নির্দেশ ছিল, কিন্তু মানবিকবাদে যে নির্দেশ ছিল তা আত্মার পুণ্যের জন্যে নয়, তা ঈশ্বরের প্রীতির জন্যে নয়, তা মানবিক পূর্ণতার জন্যে। পারফেকশন তার লক্ষ্য। মানুষ বিশ্বাস করতে আরম্ভ করল যে প্রকৃতিকে বশ করতে পারলে এই জগতেই লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব। ধর্ম বলে আসছিল অন্তঃপ্রকৃতিকে বশ করতে। বিজ্ঞানের কাছে তাঁদের অসীম প্রত্যাশা।

রেনেসাঁসের মানুষ বলতে বোঝায় সাধুসন্ত বা মিস্টিক নয়, সবজান্তা ও সব্যসাচী মানুষ যাঁরা এই পৃথিবীকে প্রতিদিন বদলে দিচ্ছেন আরও সুন্দর ও আরও উপভোগ্য পৃথিবীর জন্যে। সফল হয়তো হচ্ছেন না, কিন্তু বিফলতাও সফলতার সোপান। তাঁদের বিশ্বাস একালে যা হল না ভাবীকালে তা হবে। ভাবীকাল মানে পরকাল নয়। তেমনি এ পুরুষে যা হল না পরবর্তী পুরুষে তা হবে। পরবর্তী মানে পরজন্ম নয়। রেনেসাঁস যে-দেশে ঘটে সে-দেশের মানুষকে ইহলোকের উপরেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে প্রবর্তনা দেয়।

ঠিক এই অর্থে রেনেসাঁস ভারতের মাটিতে হয়েছে না মাটির গুণে অন্য রূপ নিয়েছে সেটা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এমন কয়েক জন মানুষ এদেশে জন্মেছেন যাঁদের বলা যেতে পারে রেনেসাঁস যুগের মানুষ। এঁরা না হলে রেনেসাঁস হত না, রেনেসাঁস না হলে এঁরা হতেন না। রেনেসাঁস স্বীকার না করলে এঁদের জীবনের কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, মনে হয় এঁরা প্রক্ষিপ্ত। স্বীকার করলে ব্যাখ্যা মেলে, লক্ষণ মিলে যায়।

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহমান যে ধারা সেধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার বা ভারতের সঙ্গে ধারাবাহিক নয়। তার ধারাবাহিকতা খুঁজতে হলে যেতে হয় পশ্চিম মুখে আধুনিক ইউরোপে ও অতীত মুখে প্রাচীন ভারতে। তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন যুগের দিক থেকে আধুনিক আর দেশের দিক থেকে বাঙালি বা ভারতীয়। ভারতচন্দ্র বা রামপ্রসাদ তো আধুনিক ছিলেন না। কার কাছ থেকে তাঁরা তাঁদের আধুনিক ধারা

পেতেন, যদি ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান কাব্য উপন্যাসকে বিদেশি বা সাম্রাজ্যবাদী বা ধনতন্ত্রী বলে বর্জন করতেন? ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান কাব্য উপন্যাস বলতে যা ছিল তা মান্ধাতার আমলের। সেই মজা নদী থেকে যা পাবার তা ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদরাও পেয়েছিলেন। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যদি তার বেশি ও তার থেকে ভিন্ন কিছু না পেতেন তাহলে তাঁরাও হতেন মধ্যযুগের সামিল। তাঁদের কীর্তিও হত সেই ধরনের ও সেই মাপের।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তাঁরা গতানুগতিকের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেননি। আর সেস্রোতও তো মজা নদীর স্রোত। গা ভাসাতে চাইলেও গা ভাসে না। যেমন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা। দু-কূল ভাসানো এক প্লাবনের প্রয়োজন ছিল। সেটা স্বদেশ থেকে নয়, অতীত থেকে নয়, বিদেশ থেকে ও আধুনিক যুগ থেকেই আসতে পারত। দেশ মোগল-শাসিত হলেও আসত। মারাঠা-শাসিত হলেও আসত। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বর্জন করে কোনো দেশই নতুন কিছুই করতে পারত না। গতানুগতিকে লোকের অরুচি জন্মাত। রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীন ও অর্থনৈতিক অর্থে স্বাবলম্বী হলেও সংস্কৃতির রূপান্তরের জন্যে ভারতের জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও ঔপন্যাসিকরা দেশেও চারদিকের জানালা-দরজা খুলে বাইরের আলো হাওয়াকে আমন্ত্রণ জানাতেন ও নিজেরাই তার খোঁজে বেরিয়ে পড়তেন। যেটা আবশ্যক সেটা কেমন করে হয়েছে তার চেয়ে বড়ো কথা সেটা যথাকালে হয়েছে। নইলে রামমোহনের নাম কে জানত, বিদ্যাসাগরের কথা সেশুনত! মাইকেল বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের প্রতিভার মতো গৃহকোণের হত। হত অষ্টাদশ শতাব্দীর মতো সেকেলে।

ঘটনাচক্রে গ্রিক পন্ডিতদের কনস্টান্টিনোপল থেকে ইটালিতে শরণার্থী হয়ে আগমন যেমন সে-দেশে রেনেসাঁসের সূচনা করে তেমনি ঘটনাচক্রে ইংরেজ বণিকদের বাংলার শাসনভার গ্রহণ ও তাদের নতুন বিদ্যার প্রতি এদেশের ভদ্রলোক শ্রেণির আকর্ষণ এদেশে রেনেসাঁসের সূত্রপাত করে। আপাতদৃষ্টিতে যা ঘটনাচক্র, ইতিহাসের বিচারে সেটা যুগপরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা। মধ্যযুগ মানুষকে নিশ্চয়ই অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছিল, ইউরোপের গথিক ক্যাথিড্রাল ও ভারতের দেবমন্দির তার সাক্ষী। কিন্তু মানবের অগ্রগতি সেইখানেই রুদ্ধগতি হত, যদি সেআধুনিক যুগে পদার্পণ না করত। ইউরোপের রেনেসাঁস তাকে আধুনিক যুগে রূপান্তরিত করে। তেমনি ভারতের রেনেসাঁস ভারতকে করে আধুনিক যুগে যুগান্তরিত। যুগান্তরিত যে হয় সেধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়। রিফর্মেশন, এনলাইটেনমেন্ট প্রভৃতি পর্যায়ের ভিতর দিয়ে যায়। তবে একইরকমভাবে নয়, একই অর্থে নয়।

যে রেনেসাঁস চার শতাব্দীকাল সময় পেয়েছে ও যে রেনেসাঁস সবে আরম্ভ হয়েছে তাদের একটির সঙ্গে অপরটির তুলনা করলে দ্বিতীয়টিকে নিষ্প্রভ মনে হবেই। তা ছাড়া ইউরোপের পরিমন্ডল ও ভারতের পরিমন্ডল তো এক নয়। ইতিহাস ও ভূগোল, সমাজ ও ধর্ম, জাতি ও বর্ণ তাদের বিভিন্ন করেছে। তবে কিছু প্রচ্ছন্ন মিলও ছিল। সংস্কৃত ও ল্যাটিন ভাষা সুদূর অতীতে এক পরিবারের ভাষা ছিল। আর সেই পরিবারটির আদিভূমি ছিল সম্ভবত একই। আদিভূমি যেখানেই হোক সেটার স্মৃতি কোনো পক্ষেরই নেই। ভারতীয়দের বিশ্বাস ভারতই সেই আদিভূমি। তাই যদি হয়ে থাকে তবে ইংরেজরা আমাদের ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে। যা নিয়ে এসেছে সেটা সম্পূর্ণ পরকীয় নয়। বেশ চেনাচেনা ঠেকছে।

রামমোহন রায় বা স্যার উইলিয়াম জোন্স অনাত্মীয়তা বোধ করেননি। একজন প্রাচ্যের প্রতি ও অপরজন পাশ্চাত্যের প্রতি জ্ঞাতিসুলভ মনোভাব পোষণ করেছিলেন। একজনের কৌতূহল প্রাচীনের প্রতি, অপরজনের আধুনিকের প্রতি। অবশ্য এটাও ঠিক যে একজন হলেন স্বাধীন দেশের লোক ও অপরজন পরাধীন দেশের। কিন্তু সেটাই কি একমাত্র গণনা? রামমোহনও তো ভাবতে পারতেন যে তিনি অতি প্রাচীন দেশের সন্তান, তাঁর উত্তরাধিকার পরাধীনতার দ্বারা আচ্ছন্ন হবার নয়। আর পরাধীনতাও তাঁর দেশের পক্ষে মঙ্গলের হতে পারে। বিধাতা কতভাবেই-না নিজের কাজ করে যান। আর যে ব্যক্তি বর্ণে ব্রাহ্মণ সে-ব্যক্তি যদি বর্ণে শ্বেত না হন তো কী আসে-যায়! বা বর্ণও তো একদিক থেকে শ্রেষ্ঠ।

রামমোহনের মধ্যে, দ্বারকানাথের মধ্যে, বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে মর্যাদাবোধ ছিল তা সমকক্ষের। তাঁরা মাথা উঁচু রেখেই করমর্দন করেছিলেন। তবে অযথা শ্রেষ্ঠতার বড়াই করেননি। ভারত সব বিষয়েই বড়ো এটা তাঁদের বক্তব্য ছিল না। সিপাহি বিদ্রোহের পরে ইংরেজদের ব্যবহার বদলে যায়। তারা ভারতীয়দের মর্যাদাবোধে আঘাত করে। যে ব্যক্তি বর্ণে ব্রাহ্মণ সেব্যক্তিও তাদের চোখে কৃষ্ণবর্ণ। যে ব্যক্তি মোগল ঘরানা বা রাজপুত ঘরানা সেব্যক্তিও তাদের চোখে নিম্নবর্ণ। 'হোয়াইট ম্যানস ব্যার্ডন' বা 'লেসার ব্রিডস' শুনলে কার-না রক্ত গরম হয়ে ওঠে! অসহযোগই তখন মর্যাদারক্ষার স্বাভাবিক নীতি। নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে কেউ কাছে যেতেও চায় না, সেলাম করতেও চায় না, শিখতেও চায় না, শেখবার কিছু আছে এটা স্বীকার করতেও চায় না। এমনি করে দেশাভিমান ও জাত্যাভিমান জন্মায়। বর্ণবিদ্বেষ দেখা দেয়। যাঁরা ইংরেজ শাসনকে বিধাতার বিধান বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁদের পৌত্ররাই তাকে শয়তানের শাসন বলে বর্জনের সংকল্প নেন।

পরবর্তী কালকে পূর্ববর্তী কালের উপর আরোপ করা উচিত নয়। সকাল বেলা যেটা নিয়ে উৎসাহ বিকেল বেলা সেটা নিয়ে অবসাদ। সকাল বেলা জোয়ার বিকেল বেলা ভাটা। দেশের ইতিহাসেও একই ব্যাপার। রেনেসাঁসের জোয়ার নেমে যাবার পর ভাঁটার সময় আসে। তখন তার সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। যারা তার কাছে আরও অনেক কিছু আশা করেছিল তারা হতাশ হয়। যাদের বদ্ধ ধারণাগুলো তার কাছ থেকে ধাক্কা খেয়েছে তারা তাকে ক্ষমা করে না। রেনেসাঁস মানুষকে দেবতাও করে না, দানবও করে না। সেদেবতাও মানে না। তার অধ্যয়নের বিষয় হচ্ছে মানুষ আর বিশ্বপ্রকৃতি, ইহলোক আর ইহকাল। পারে তো এইখানেই সেআদর্শ জগৎ গড়ে তুলবে। না পারে তো বাস্তবকে নিয়েই ঘর করবে। সমালোচকরা এতে সন্তুষ্ট নন। তাই দুই দিক থেকে কথা শুনতে হয়।

পূর্ববর্তী কালে ইংরেজ শাসন ছিল এক জিনিস, রেনেসাঁস ছিল আরেক। ব্রিটিশ অধিকৃত সব অঞ্চলে রেনেসাঁস হয়নি, হয়েছিল যেখানে একদল অগ্রদূত ছিলেন। পরবর্তী কাল একথা ভুলে যায়। তার দৃষ্টিতে রেনেসাঁস ও ইংরেজ শাসন একাকার। আরও পরবর্তী কালের চোখে ইংরেজ ও বুর্জোয়ার পিন্ডি রেনেসাঁসের ঘাড়ে চাপানো হয়। তখন সেআর রেনেসাঁসের বলে স্বীকৃতি পায় না। সেটা তাহলে কী? একটা বিভ্রম? ইংরেজ আর বুর্জোয়া তো আরও অনেক অঞ্চলে ছিল। কোথায় তাদের রেনেসাঁস? মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বড়োলোকের অভাব তো ছিল না। ওরাও বাস করত ইংরেজ শাসনে। কোথায় ওদের রেনেসাঁস? আসলে ইংরেজ শাসন ও রেনেসাঁস এক জিনিস নয়, বুর্জোয়া প্রাধান্য ও রেনেসাঁস নয় এক জিনিস।

যে-দেশ যত প্রাচীন নবীনত্বের প্রয়োজন তারই তত বেশি। তাকেই যুগে যুগে নবীন হয়ে উঠতে হয়। সেনবীনত্ব বাইরের সাজবদল বা খোলসবদল নয়। অন্তরে যদি রং ধরে তাহলেই তা নবীনত্ব। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার তথা ভারতের অন্তরেও রং ধরেছিল, শুধু অফিসে আদালতে বা দোকানে বাজারে নয়। বাইরে থেকে কত বার কত বিদেশি এসেছিল, কেউ-বা লুটপাট করতে, কেউ বাণিজ্য করতে, কেউ রাজত্ব করতে। বাইরে থেকে এলেও তারা একই যুগের মানুষ। তারা সমকালীন। কিন্তু এই প্রথম দেখা গেল তারা ভিন্ন যুগে বাস করছে, তারা আধুনিক যুগের মানুষ। আর তাদের তুলনায় ভারতের লোক তিন-চার শতাব্দী পেছিয়ে রয়েছে। আধুনিক যুগে পৌঁছোয়নি। এই যে কালগত ব্যবধান এটা দেশগত ব্যবধানের চেয়ে দুরতিক্রম্য। একে অতিক্রম করার একমাত্র উপায় কালোপযোগী শিক্ষা ও সম্ভব হলে সমুদ্রযাত্রা। কালোপযোগী শিক্ষাই অন্তরে রং ধরায় ও সমুদ্রযাত্রা সেই রংকে আরও উজ্জ্বল করে।

যাঁরা কালোপযোগী শিক্ষাও গ্রহণ করেননি, সমুদ্র পার হয়ে দেশভ্রমণও করেননি তাঁরা আধুনিক যুগের মানুষই নন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেহধারণ করলেও তাঁদের মন মধ্যযুগীয়। এঁরাও বই কাগজ লেখেন। সাহিত্যের ইতিহাসে এঁদেরও স্থান আছে। কিন্তু রেনেসাঁসের প্রবাহ এঁদের নিয়ে নয়। যাঁরা মনেপ্রাণ আধুনিক তাঁরাই রেনেসাঁসের পথিকৃৎ পথিক। রামমোহনের ঘরোয়া পড়াশোনা ছিল কালোপযোগী ও অতি সহজেই তিনি বহু শতাব্দী অতিক্রম করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপনীত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও ঘরোয়া

পড়াশোনা ছিল ইংরেজি। সমুদ্রযাত্রা অবশ্য তাঁর বেলা ঘটেনি। তবে ইউরোপীয়দের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা ছিল। সেটাই সমুদ্রযাত্রার কাজ করত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই নবীনত্ব আসে যা দ্বাদশ শতাব্দীতে তুর্কদের সঙ্গে আসেনি। সেসময় এসেছিল আরবি ফরাসি শিক্ষা। সেশিক্ষা বিদেশি হলেও আধুনিক ছিল না। ছিল মধ্যযুগীয়। কয়েকটা বিষয়ে কিছু উনিশ-বিশ ছিল। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার মতো সব বিষয়ে অগ্রসর নয়। আরবি ফরাসি শিক্ষাও ছিল থিয়োলজি কবলিত। কারও সাধ্য ছিল না স্বাধীনভাবে চিন্তা করে বা প্রকাশ করে। আবিষ্কার, উদ্ভাবন, পরীক্ষানিরীক্ষা প্রয়োগ থিয়োলজির সঙ্গে বিরোধ ডেকে আনত। সেবিরোধে পুরাতন বিশ্বাসের জিত নিশ্চিত। আর নতুন চিন্তার শাস্তি ভয়ংকর। আরবভাষী জগতে যেটুকু এসেছিল সেটুকু তুর্কদের ভারতে প্রবেশ করার পূর্বেই থেমে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই নতুন চিন্তা জয়ী হয়, পুরাতন বিশ্বাস হেরে গিয়ে পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন দেখে।

২

রুমানিয়া থেকে একজন লেখক এসেছিলেন। বললেন, 'চার হাজার বছরের বহমান সভ্যতা আপনাদের। এর কোনোখানেই ছেদ পড়েনি। ধারাভঙ্গ হয়নি। আমাদের কিন্তু বার বার তিন বার ডিসকন্টিনিউইটি ঘটেছে। একবার যখন প্রাচীন গ্রিস রোম যায়, খ্রিস্টধর্ম আসে। আবার, যখন রেনেসাঁস হয়। শেষ বার, যখন মার্কসবাদী এসে ওলটপালট করে। এইসব ডিসকন্টিনিউইটি নিয়ে ইউরোপের সভ্যতা।'

পূর্ব ইউরোপের সভ্যতা বলুন। পশ্চিম ইউরোপের লোক ওই তিন বারেরটা মানে না। তাদের বেলা এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো ওলটপালট সফল হয়নি। তাহলে ওদের চোখে ডিসকন্টিনিউইটি যা তা রেনেসাঁসের সময়ই দ্বিতীয় ও শেষ বার ঘটেছে।

আর আমাদের বেলা? একথা যদি সত্য হয় যে আমাদের সভ্যতার ধারাভঙ্গ এক বারও ঘটেনি তবে বাংলার রেনেসাঁস একটা কথার কথা। যার মৃত্যু নেই তার নবজন্মও নেই। যার নিদ্রা নেই তার নবজাগরণও নেই। এদেশে কত বার গ্রিক শক কুষাণ হূন এসেছে, তেমনি তুর্ক মোগল পোর্তুগিজ ইংরেজ এসেছে। সাময়িক এক-একটা তরঙ্গ উঠে আবার মিলিয়ে গেছে। এই যাকে রেনেসাঁস বলা হচ্ছে এও তেমনি একটা তরঙ্গ।

রুমানিয়ান লেখক আমাকে ভাবিয়ে তোলেন। ভেবে দেখি এদেশেও মাঝে মাঝে ছেদ পড়েছে। ধারাভঙ্গ হয়েছে। নয়তো মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা মরুপথে হারিয়ে গেল কী করে? সেই নাগরিক যুগের সঙ্গে বৈদিক আরণ্যক যুগের ধারাবাহিকতা কোথায়? সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীনতর সভ্যতার অস্তিত্ব পর্যন্ত পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের জানা ছিল না। পঞ্চনদের বৈদিককেই আমরা আদি বলে বিশ্বাস করতুম। কারণ ঋগবেদের চেয়ে পুরাতন শাস্ত্র পৃথিবীতেই নেই। কিন্তু পাষাণের সাক্ষ্য শাস্ত্রের চেয়েও প্রামাণিক। একদিন স্বীকার করতেই হবে যে সিন্ধু সভ্যতার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা ছেদ পড়ে। ছেদের পর পুনরারম্ভ। বৈদিক আর্যদের আবির্ভাব। সম্ভবত বহিরাগত আক্রমণকারী রূপে।

এই ছেদটার কথা খননকার্যের পূর্বে আমাদের অজ্ঞাত ছিল। এটা এত পুরাতন যে লোকমানসেও কোনো চিহ্ন রেখে যায়নি। সেইজন্যে মনে হয়েছে আমাদের সভ্যতা চিরপ্রবহমাণ। যা গ্রিস রোম মিশরের নয়। কিন্তু একথা আমরা সবাই জানতুম যে বৌদ্ধ ধর্ম একদিন অস্তমিত হয়, ইসলাম একদিন উদিত হয়। প্রায় একই ঐতিহাসিক লগ্নে। বৌদ্ধদের যখন গৌরবের দিন ছিল তখন সেগৌরব মুসলিমদের চেয়ে কোনো অংশে খাটো ছিল না। আর মুসলিমদের যখন গৌরবের দিন ছিল তখন সেগৌরব বেদানুগ হিন্দুদের চেয়ে কোনো অংশে খর্ব ছিল না। ভারতের ইতিহাসে বেদানুগ হিন্দুর পাশাপাশি রয়েছে আর-একটি প্রতিবাদী শক্তি। সেটি এককালে বৌদ্ধ, পরে মুসলিম। এদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায় না। একটি যে অপরটির উচ্ছেদের হেতু তাও নয়। কিন্তু একটির শূন্যতা অপরটি পূরণ করে। একের প্রস্থান, সঙ্গে সঙ্গে অপরের উত্থান।

তাই যদি হয় তবে আমাদের ইতিহাসেও বার দুই ডিসকন্টিনিউইটি ঘটেছিল। ইতিহাস লেখার অভ্যাস নেই বলে কেউ লিপিবদ্ধ করেনি। লোকে ভুলে গেছে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাকে; তেমনি *অশোক কনিষ্ক হর্ষবর্ধন* ও *ধর্মপালকে*। যদিও বাণভট্টের হর্ষচরিত ছিল সাক্ষী দিতে।

অন্য একদিক থেকেও বিবেচনা করতে পারি। সংস্কৃত ভাষার গৌরবের দিন যখন গেল তখন দেখা গেল রাজকর্মে তার স্থান নিয়েছে পারসিক আর জনজীবনে বাংলা, হিন্দি, মারাঠি, তামিল প্রভৃতি অসংস্কৃত ভাষা। এদের অধিকাংশই সংস্কৃতের সন্তান বলে গণ্য করা হয়, কিন্তু জয়দেবের ভাষা ও চণ্ডীমঙ্গলের ভাষার মাঝখানে নিশ্চয়ই একটা ধারাভঙ্গ ঘটেছিল। মহারাষ্ট্রের একজন সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক জয়দেব পাঠ করার পর চণ্ডীদাস পড়তে বসলেই তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করবেন যে পরম্পরাটা ধারাবাহিক নয়। মাঝখানে একপ্রকার

ডিসকন্টিইনিউইটি। এটা না হলে বাংলা হিন্দি প্রভৃতি ভাষার উদ্ভবই হত না। সংস্কৃত ভাষা সাধারণ লোকের হৃদয়াবেগ প্রকাশের বাহন ছিল না। যাত্রায়, পাঁচালিতে, কীর্তনে, গীতিকায় কেউ সংস্কৃত শুনতেও চায় না, বুঝতেও পারে না। তাঁদের মনের আনন্দ জোগায় তাদেরই মুখের ভাষা।

এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার যে সংস্কৃতের পর বাংলা ও বৌদ্ধ ধর্মের পর ইসলাম অবিকল সমকালীন না হলেও মোটামুটি একই যুগের ঘটনা। সম্পর্কটা কাকতালীয়। আমাদের মধ্যযুগকে দুই ভাগে বিভক্ত করলে এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। ইসলামের ও বাংলার পূর্ব ছিল মধ্যযুগের প্রথমার্ধ। পরে এল দ্বিতীয়ার্ধ। জয়দেব প্রথমার্ধের কবি। চন্ডীদাস দ্বিতীয়ার্ধের কবি। মাঝখানে একটা ছেদ। মধ্যযুগের তাতে অবসান হল না। যুগটা অবিচ্ছিন্নই রয়ে গেল। তবু যে পরিবর্তনটা ঘটল সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মের দিক থেকে, ভাষার দিক থেকে লোকে আরও গণতান্ত্রিক হল। ধর্ম বলতে শুধু ইসলাম নয়, মঙ্গলকাব্য ও পদাবলির ধর্মও বোঝায়।

সংস্কৃতের স্থান নেয় রাজকর্মে পারসিক, জনজীবনে বাংলা হিন্দি প্রভৃতি ভাষা। কিন্তু পুরাতন জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাষা সংস্কৃতই রয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আরবি ফারসি। সেকালের শিক্ষিত শ্রেণি বলতে বোঝাত টোল চতুষ্পাঠী মাদ্রাসায় শিক্ষিত হিন্দু- মুসলিম উচ্চতর বর্ণ বা উচ্চতর শ্রেণি। যে পদ্ধতিতে এঁরা শিক্ষালাভ করতেন সেটাকে পশ্চিমে বলা হত স্কলাস্টিক পদ্ধতি। ইউরোপে যখন নতুন বিদ্যা প্রবর্তিত হয় তখন পদ্ধতিটাই যায় পালটে। স্বাধীন চিন্তাকে উৎসাহ দেওয়া হয়। শিষ্যরা গুরুদের সঙ্গে তর্ক করতে সাহস পায়, গুরুর মত খন্ডন করতে পারলে গুরু রুষ্ট হন না। গুরুবাদ জিনিসটাই উঠে যায়। তবে মনে রাখতে হবে যে এটা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে; চার্চে নয়। কিংবা চার্চ-শাসিত বিভাগে নয়। যেমন থিয়োলজিতে নয়। নতুন বিদ্যা নতুন নতুন বিভাগ সৃষ্টি করে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন অনুসন্ধান, স্বাধীন গবেষণা সম্ভব হয়।

এদেশে নতুন বিদ্যার বাহন হয় ইউরোপীয় আদর্শের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের পদ্ধতি স্কলাস্টিক নয়। তাদের ভাষা সংস্কৃত বা আরবি ফারসি নয়। আরম্ভটা সম্পূর্ণ আধুনিক। তাই পুরাতনের সঙ্গে একটা ছেদ পড়ে যায়। শিক্ষিত শ্রেণি বললে এখন থেকে বোঝায় ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণি। স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত শ্রেণি। সংস্কৃত বা আরবি ফারসিতে শিক্ষিতদের ফেলে এরা এগিয়ে যায়।

সংস্কৃত শিক্ষায় যাদের অধিকার ছিল না, পারসিক শিক্ষায় যাদের প্রয়োজন ছিল না, তারাও ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পায় ও তার প্রাঙ্গণে দলে দলে যোগ দেয়। পাঠশালা বাদ দিলে এর মতো গণতান্ত্রিক শিক্ষা ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধ যুগের পূর্বে ও পরে আর কখনো দেখা যায়নি। এর বিপক্ষে ছিলেন গোঁড়া মুসলমান ও গোঁড়া হিন্দুরা। যে কারণে ইউরোপের গোঁড়া খ্রিস্টানরা বিপক্ষে ছিলেন সেই কারণে ভারতের গোঁড়ারাও। তাঁদের আশঙ্কা নতুন বিদ্যা এসে তাঁদের চিরাচরিত বিশ্বাসের মূলে ঘা দেবে। তাঁদের পায়ের তলার মাটি নড়ে গেলে মন্দির মসজিদ সব টলে পড়বে। সমাজ সংসার সব ধ্বংস হবে। ছোটোলোকদের বাড় বাড়বে।

ইউরোপের গোঁড়া খ্রিস্টানরা নতুন বিদ্যার প্রবর্তকদের একদা পুড়িয়ে মেরেছিলেন। তাঁদের মতে ওটা শয়তানি বিদ্যা। কয়েক শতাব্দী পরে ওই শয়তানি বিদ্যাই বয়ে নিয়ে আসেন ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারিরা। তার থেকে এদেশের গোঁড়াদের ধারণা জন্মায় যে, ওটা খ্রিস্টানি বিদ্যা, ওর লক্ষ্য খ্রিস্টান বানানো।

ওটা অশাস্ত্রীয়, ওটা ম্লেচ্ছ, ওটা পাশ্চাত্য, ওটা বিজাতীয়, ওটা জড়বাদী ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করা সারা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরেই চলে, তা সত্ত্বেও ওর প্রসার রোধ করা যায় না। যারা কোনো কালেই উচ্চশিক্ষার ধারে-কাছেও আসতে পারত না তারাও নতুন বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ পায় ও স্বাধিকার সচেতন হয়।

কিন্তু সংস্কৃত ও আরবি ফারসির মতো ওর মাধ্যমটা ছিল ইংরেজি। সেটা সর্বজনযোগ্য নয়। রামমোহন রায় ও তাঁর সহযোগীরা আশা করেছিলেন অবিলম্বে বাংলা হিন্দি ভাষাতেও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিবেশন করতে পারা যাবে, কিন্তু তাঁদের সেআশা এক শতাব্দীর মধ্যেও পূর্ণ হয় না। প্রবর্তকরা এর জন্যে দায়ী নন। দায়ী আমাদের ভাষাগুলির অবস্থা। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় যিনি যা-ই লিখতেন পদ্য আকারে লিখতেন। প্রথম ছেদ পড়ল যখন ফোর্ট উইলিয়ামের পন্ডিত বা মুনশিরা জীবনীগ্রন্থ লিখলেন

বাংলা গদ্যে। সংবাদপত্রেও বাংলা গদ্য ব্যবহার করলেন মিশনারিরা। এরপর পাঠ্যপুস্তকও রচিত হয় গদ্যে। ধর্মগ্রন্থও অনুবাদ করা হয় গদ্যে।

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ কতক পরিমাণে সংস্কৃত বা পারসিক শিক্ষিত লেখকদের হাতে হলেও বিপুল পরিমাণে হয় ইংরেজি শিক্ষিত লেখকদের হাতে। পদ্যের মতো গদ্যে অশিক্ষিত পটুত্বের স্থান ছিল না। থাকলে সেটা রূপকথায় বা ব্রতকথায়। তবে এটাও লক্ষ করবার মতো যে বাংলা গদ্য গোড়ার দিকে যেমন দুর্বোধ্য সংস্কৃত বা পারসিকবহুল ছিল, পরে তেমন নয়। গদ্য ধীরে ধীরে সহজ ও সরল হয়ে আসে। সাধুরূপ ছেড়ে চলিতরূপ ধরে। ইউরোপের ইতিহাসে, চীনের ইতিহাসেও এর নজির আছে।

স্কুল কলেজ বিদ্যালয়ের মতো ছাপাখানারও ভূমিকা ছিল এই যুগপরিবর্তনে। ছাপাখানা ছড়িয়ে দেয় রাশি রাশি বই কাগজ। এত কম দামে যে সাধারণ লোকও কিনতে পারে। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে উচ্চবর্ণ ও উচ্চশ্রেণির সম্পর্কটার একটা কারণ তো ছিল বইপত্রের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতা। ছাপাখানা উদ্ভাবনের পর দেখা গেল যারা কোনো কালেই বইপত্র কিনত না তারাও কিনছে, যারা কিনতে পারছে না তারাও অন্যের লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়ছে। পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়ছে। পাবলিক লাইব্রেরিও গড়ে ওঠে।

ইংরেজি শিক্ষিত ধনী বাঙালিদের শখ ছিল সাহেবদের মতো বাড়ি করা, গাড়ি চড়া, আসবাব কেনা। সেইসঙ্গে আরও একটা শখ ছিল বিলিতি বই ও শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করা। তাঁদের লাইব্রেরিতে সমসাময়িক ইংল্যাণ্ডের সবরকম বই দেখতে পাওয়া যেত। তাঁদের শিল্পশালায় সমসাময়িক ইউরোপের চিত্র ও ভাস্কর্যের নমুনা বা নকল।

সরকারি চিড়িয়াখানা ছাড়াও ধনীদের নিজেদের চিড়িয়াখানা ছিল। সরকারি বটানিক গার্ডেন ছাড়াও ধনীদের নিজেদের আমদানি গাছপালার বাগান ছিল। হেন মুলুক ছিল না যেখান থেকে জাহাজে করে ফলটা ফুলটা পাখিটা জন্তুটা না আসত, আর সাহেবদের দেখাদেখি বাবুদের কৌতূহল না জাগাত। রেল টেলিগ্রাফ ট্রাম ইত্যাদিও এমনই করে আসে ও যাদের কৌতূহলী করে তারা কেবল সাহেব নয়, বাবু নয়, সাধারণ লোক। দেখতে দেখতে লোকের অভ্যাস বদলে যায়। তারা রেড়ির তেল ছেড়ে কেরোসিন তেল ধরে। তারপর কেরোসিনের বাতি ছেড়ে গ্যাসের বা বিজলির বাতি। তেমনি ঘুঁটে কিংবা কাঠ ছেড়ে কয়লা জ্বালায়। পুরুষের চুল ছেঁটে সাহেবদের মতো করা হয়। টিকি কাটা যায়। মেয়েদের গায়ে সেমিজ সায়া ওঠে।

দেশটা একটু একটু করে পাশ্চাত্য প্রভাবে পড়ে। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা আধুনিক যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে নেয়। কোনটা পাশ্চাত্য আর কোনটা আধুনিক এটা পরিষ্কার ছিল না। পাশ্চাত্যকে আধুনিক ও আধুনিককে পাশ্চাত্য বলে ভ্রম হত। এখনও হয়। জাতীয়তাবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশীলদের মনে একটা বিরূপ ভাবও জন্মায়। কেন আমাদের কি আপনার বলতে কিছুই নেই যে আমরা পরেরটা নেব?

নির্বিচারে কোনোটাই নেওয়া উচিত নয়। পরেরটাও নয়, পূর্বপুরুষেরটাও নয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যেমন পরেরটা নেবার সময় আতিশয্য দেখা গেল শেষ পাদে তেমনি পূর্বপুরুষেরটা নেবার বেলা আতিশয্য। এক শতাব্দীর মধ্যেই চাকা ঘুরে গিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। 'দাও ফিরে সেঅরণ্য, লহো এ নগর।' প্রাচীন ভারতের তপোবন না হলে ব্রহ্মচর্যাশ্রম হবে না, ব্রহ্মচর্যাশ্রম না হলে জাতীয় শিক্ষা হবে না। রেখে দাও তোমার হিন্দু কলেজ আর ডিরোজিয়ো।

একটা চোখ প্রাচ্যের উপরে আরেকটা চোখ প্রতীচ্যের উপরে, একটা চোখ প্রাচীনের উপরে একটা চোখ আধুনিকদের উপরে—এই দ্বৈত রামমোহনের মধ্যেও ছিল। কিন্তু তাঁর বিচারবুদ্ধি ছিল একান্ত সক্রিয়। গা-ভাসানো আতিশয্য তাঁর স্বভাবে ছিল না। তিনি আধুনিক ইউরোপকে আহবান করলেও প্রাচীন ভারতের সঙ্গে পূর্ব সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। মধ্যযুগে সে-সম্পর্ক বিকৃত হয়েছিল। একদিকে তিনি যেমন নতুন বিদ্যার প্রধান প্রবর্তক অপরদিকে তেমনি পুরাতন ধর্ম ও সমাজের মুখ্য সংস্কারক। সংস্কারকের কাজ তিন-চার হাজার বছর আগে ফিরে যাওয়া নয়, তাকে ফিরিয়ে আনাও নয়, তার মূল সত্যকে পুনরাবিষ্কার করা।

আধুনিক ইউরোপ এত বড়ো একটা জাজ্বল্যমান সত্য যে তাকে উপেক্ষা করার সাধ্য কোনো শিক্ষিত ব্যক্তির ছিল না। অপরপক্ষে ভারতও আজকের দেশ নয়, এর ছিল অতি পুরাতন এক সভ্যতা ও নানা বিকৃতি সত্ত্বেও তার যে সারসত্য তাকেও উপেক্ষা করা অসম্ভব ছিল। মিশনারিরা নিজেদের ধর্মকে বড়ো করে দেখানোর জন্যে এদেশের ধর্মকে হেয় করে দেখালেও ভাষাতত্ত্ববিদ বহু ইউরোপীয় ছিলেন যাঁরা প্রাচীন প্রাচ্যবিদ্যাকে ইংরেজি ফরাসি ও জার্মান অনুবাদসূত্রে পশ্চিম ভূখন্ডের সর্বত্র পৌঁছে দেন। রামমোহনের অনুবাদগুলিও পশ্চিমে প্রচারিত হয়। অপরাপর ভাষায় পুনরায় অনূদিত হয়। রাজা যখন ইউরোপে যান তার আগেই যায় তাঁর লেখা, তাঁর নাম।

এই যে ইউরোপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ শুরু হয়ে যায় এর জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হলেও পশ্চিমযাত্রীর অভাব হয় না। যান সংস্কারবিরোধী হিন্দুরাও। ইউরোপবিরোধী ভারতীয়রাও। ম্লেচ্ছ বিদ্বেষে যাঁরা অন্ধ তাঁরাও যান কালাপানির ওপারে। এমনি করে আচার অলক্ষে শিথিল হয়। বিচারও ধীরে ধীরে উদার হয়। ওদের সব কিছু খারাপ আর আমাদের সব কিছু ভালো এ মনোভাব আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে ক্ষয় হয়। কিন্তু 'ওরা স্বাধীন আর আমরা পরাধীন' এ অনুভূতি আরও তীব্র হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদী অভিমান থেকে আসে ভারত সম্বন্ধে উচ্চতর ধারণা, পশ্চিম সম্বন্ধে নিম্নতর। ওরা জড়বাদী, আমরা অধ্যাত্মবাদী, আমরাই শ্রেষ্ঠ।

পাশ্চাত্য পন্ডিতদের অবিরাম সংস্কৃত ও পালি চর্চা তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে গুহাচিত্র ও শিলালিপি আবিষ্কারের ফলে ভারতের যে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব রচিত হয় তাতে ভারতের প্রাচীন গৌরব বৃদ্ধি পায়। এমন প্রাচীন গৌরব যে-দেশের সে-দেশ আধুনিক ইউরোপের শিষ্য হবে না গুরু হবে! যন্ত্রতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই ওদের কাছ থেকে শেখবার নেই, এই ধারণায় উপনীত হন যাঁরা জার্মান পন্ডিতদের দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতকে দেখেন। মোক্ষমূলর বলেছে 'আর্য'। এই আর্যামিটা রামমোহনের যুগে ছিল না। হঠাৎ শোনা গেল আমরা আর্য জাতি, আমাদের ভাষা আর্য ভাষা, ধর্ম আর্য ধর্ম। আর আর্যই জগতের শ্রেষ্ঠ। একটা পরাধীন জাতির পক্ষে এটা কত বড়ো একটা সান্ত্বনা।

অতীত গৌরবের পুনরাবৃত্তির নাম রেনেসাঁস নয়, রিভাইভাল। রেনেসাঁস অতীতের থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করলেও যা করতে চায় তা নতুন, নিত্যনতুন। যা জানতে চায় তা নতুন, নিত্যনতুন। যাদের বিশ্বাস বেদে বা বাইবেলে বা কোরানে সব কিছু আছে, তার বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই, তাদের বিশ্বাস রেনেসাঁসের অনুকূল নয়। কারণ রেনেসাঁস নতুন করে জানতে চায়, নতুন করে বিচার করতে চায়। পুনর্বিচার না হলে রেনেসাঁস হয় না। তার ফলে খানিকটা ধারাভঙ্গ হবেই। নয়তো সেটার নাম রেনেসাঁস নয়।

ধর্ম ও সমাজসংস্কারেও খানিকটা ধারাভঙ্গ হয়। সেটা যাদের সহ্য হয় না তারা ধর্ম সমাজ সংস্কারেও রাজি হয় না। বলে, ওসব পরে। আগে তো দেশ স্বাধীন হোক। স্বাধীনতার জন্যে যারা সবচেয়ে অধীর, ধর্মসংস্কারের বেলা সমাজসংস্কারের বেলা তারা সবচেয়ে ধীর। এমনকী একেবারেই বিরূপ। জাতীয়তাবাদ প্রথমে ছিল ধর্মসংস্কারের সঙ্গে অভিন্ন। পরে দেখা গেল জাতীয়তাবাদীদের বৃহত্তর ভাগ ধর্মসংস্কারকে মনে করে জাতীয় ঐক্যবিরোধী। ঐক্যের যদি প্রয়োজন থাকে তবে যেসব প্রশ্নে তীব্র মতভেদ সেসব প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে হবে। নয়তো জোট ভেঙে যাবে। ভোটেও হারতে হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ তার প্রথম পাদের প্রতি বিমুখ। রেনেসাঁসের প্রতি বিমুখ কাউন্টার রেনেসাঁস। রিফর্মেশনের প্রতি বিমুখ কাউন্টার রিফর্মেশন। আধুনিক ইউরোপের প্রতি বিমুখ প্রাচীন ভারতীয় পুনরুজ্জীবন বা রিভাইভাল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বিমুখ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। তা সত্ত্বেও নতুন বিদ্যার প্রসার বন্ধ থাকে না। সেই সূত্রে ইউরোপ থেকে যে ভাবধারা আসে তা সাহিত্যকে ও শিল্পকে নতুন সঞ্জীবনী শক্তি জোগায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের তুলনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য একটা নতুন জগৎ। গদ্যবন্ধে লেখা হয় হালকা ও গম্ভীর বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ, উপন্যাস, জীবনী, নাটক। পরে রম্যরচনা ও ছোটোগল্প। পদ্যে একা মাইকেলই লেখেন এপিক, লিরিক, সনেট। বেশিরভাগই পশ্চিমের আদর্শে। বিষয়টা

যদিও স্বদেশি। এর পরে আর কেউ ভারতচন্দ্রকে বা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে পূর্বসূরি বলে গ্রহণ করেন না। করেন মাইকেলকে। মাইকেলের প্রদর্শিত পন্থায় চলতে যাঁদের অনাগ্রহ তাঁরা বৈষ্ণব পদাবলি, কালিদাস ও শেলি কিটস ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের পথে চলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালি কবিদের সঙ্গে তাঁদের মনের অমিল। নাটক যাঁরা লেখেন তাঁরা শেক্সপিয়রকেই আদর্শ করেন। কালিদাস ভবভূতিকে নয়। বিষয় হয়তো পৌরাণিক হিন্দু, কিন্তু রীতি এলিজাবেথান বা ভিক্টোরীয়।

বাংলার আধুনিক শিক্ষা যেমন প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় শিক্ষার থেকে ভিন্ন, বাংলার আধুনিক সাহিত্যও তেমনি প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় সাহিত্যের থেকে ভিন্ন। এই ভিন্নতাকে আর অভিন্নতায় পরিণত করা যেত না। সিপাহি বিদ্রোহের ফলাফল অন্যরূপ হলেও রেনেসাঁসের ফসল অন্যরূপ হত না। অমন যে স্বাধীন দেশ জাপান তার আধুনিক যুগ যখন এল তখন মধ্যযুগের ঐতিহ্য ধীরে ধীরে অপগত হল। নতুন বিদ্যা সে-দেশেও প্রবর্তিত হয় ইংরেজি ফরাসি জার্মান ইটালিয়ান ভাষায়। এক-একটা বিষয় এক-একটা ভাষায় পড়ানো হত। সাহিত্যে যারা পড়ত তারা ফরাসিতে। চিকিৎসাবিদ্যা যারা পড়ত তারা পড়ত জার্মান ভাষায়। আইন ও রাজনীতি যারা পড়ত তারা পড়ত ইংরেজিতে। ইটালিয়ান ভাষায় কী পড়ত জানিনে, বোধ হয় আর্ট।

আলো হাওয়ার যেমন দেশ-দেশান্তর নেই জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও তেমনি দেশ-দেশান্তর নেই। সাহিত্যের বেলাও সেই কথা খাটে। বাংলা সাহিত্যের পুরাতন যুগেও আরবি ফারসি থেকে বড়ো কম নেওয়া হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও গবেষণায় সেই লুপ্ত অধ্যায়টির উদ্ধার হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যই পুরাতন বাংলা সাহিত্যের একমাত্র উৎস ছিল না। সুতরাং ইংরেজি সাহিত্য যদি পরে অন্যতম উৎস হয়ে থাকে তার জন্যে লজ্জিত হবার কারণ নেই। ইংরেজিও তো বিভিন্ন উৎস থেকে রস সংগ্রহ করে নবীন হয়েছে। এর জন্যে ইংরেজরা কেউ লজ্জিত নয়।

রাজা রামমোহনই যে আমাদের রেনেসাঁসের সূত্রধার এ বিষয়ে রেনেসাঁস বিশ্বাসীরা একমত। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তাঁর নাম না থাকলেও নতুন বিদ্যার তিনিই যে প্রধান প্রবক্তা লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত তাঁর পত্রই এর প্রমাণ।

রামমোহনের বক্তব্য :

> It had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian Philosophy would not have been allowed to displace the system which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a liberal and enlightened system of instruction embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talent and learning, educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, implements and other apparatus.

পূর্ব প্রচলিত সিস্টেমটাই তাঁর মতে অজ্ঞতাকে অক্ষয় করার জন্যে কল্পিত। তার পরিবর্তে চাই একটি উদার আলোকিত সিস্টেম। তাতে থাকবে গণিত আর পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন আর শরীর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, তা ছাড়া অন্যান্য আবশ্যক বিজ্ঞান। রামমোহন একে উপরের দিকে নিবদ্ধ রাখতে চাননি। ইংরেজিতেও না। একে বাংলার সহায়তায় জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া চলে।

শিক্ষার সিস্টেম পরিবর্তন না করলে সমাজের বা রাষ্ট্রের পরিবর্তন করা যেত না। তা বলে এমন কথা বলা চলে না যে শিক্ষার সিস্টেম পালটালেই আর সব সিস্টেম পালটাবে। একটি অতি পুরাতন দেশের হাজার হাজার বছরের বদ্ধমূল ধর্মের সিস্টেম, সমাজের সিস্টেম, রাষ্ট্রের সিস্টেম, উৎপাদনের সিস্টেম অত সহজে

উৎপাটিত হতে পারে না। ইউরোপেও যাঁরা নতুন বিদ্যার প্রবর্তক তাঁরাও অতদূর যাবার কথা ভাবতে পারেননি। আমাদের রেনেসাঁসের নায়করাও আমূল পরিবর্তনের বিধান দেননি। কিন্তু যেখানে পরিবর্তন মাত্রেই নিষিদ্ধ সেখানে যদি পরিবর্তনের পথ সুগম হয় তবে সেই পথ দিয়ে একটার পর একটা পরিবর্তন আসে। কালে সেটা বৈপ্লবিক আকার ধারণ করে। রেনেসাঁস যদি ইটালিতে না হত রিফর্মেশন জার্মানিতে হত না, পার্লামেন্টের কাছে রাজশক্তির পরাজয় ইংল্যাণ্ডে হত না। রাজতন্ত্র সামন্ততন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব ফ্রান্সে হত না।

পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের ভিতরেই সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি নিহিত ছিল। মানুষ ইচ্ছা করলে এই জগৎকে ও এই জীবনকে সর্বতোভাবে পরিবর্তিত করতে পারে। মানুষের অসাধ্য কী আছে? মানুষ সর্বশক্তিমান। মানুষ সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে এই যে অভিনব চেতনা এটাই নতুন বিদ্যার মহত্তম দান। পাশ্চাত্য রেনেসাঁস থেকে এটা প্রাচ্য রেনেসাঁসেও সঞ্চারিত হয়। হত না যদি রামমোহনের মতো মনীষীরা অগ্রণী না হতেন। ইংরেজদের মধ্যেও দুই দল ছিলেন। একদল মনে করতেন প্রাচ্যদেশের লোকের পক্ষে প্রাচ্য বিদ্যাই শ্রেয়। বেশ তো শান্তিতে আছে ওরা। কেন বৃথা পাশ্চাত্য বিদ্যা শিখিয়ে ওদের অশান্ত করে তোলা? ওরা চাইবে চাঁদ পেড়ে আনতে। পারবে কেন? আরেক দল ভাবতেন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকবর্তিকা প্রাচ্যের পক্ষেও শ্রেয়। সেই আলোর ছোঁয়া লেগে যাদের ঘুম ভাঙবে তারাই আর সবাইকে জাগাবে। একটি পুরাতন, পশ্চাৎপদ দরিদ্র জনসমষ্টি অমনি করেই আপনার ভাগ্য পরিবর্তন করবে। সেকাজ ইংরেজদের দিয়ে হবার নয়। সেদায়িত্ব ইংরেজদের নয়। এই যে দ্বিতীয় দলটি এঁরাই নতুন বিদ্যা প্রবর্তনে উৎসাহী ভারতীয়দের পক্ষ নেন। মেকলের কাস্টিং ভোট এঁদের জিতিয়ে দেয়।

ইংরেজদের মধ্যে যাঁদের আপত্তি ছিল তাঁদের আপত্তির একটা কারণ ছিল এই যে, স্কুল কলেজের পড়া সেরে যারা জীবিকার সন্ধানে বেরোবে তাদের জন্যে সরকার এত চাকরি পাবেন কোথায়? তার জন্যে যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন চাই তার সম্ভাবনা কতদূর? ইংল্যাণ্ডে ততদিনে শিল্পবিপ্লব জোরকদমে চলেছিল, কিন্তু ভারতেও যদি শিল্পবিপ্লব চলে তবে ভারত হবে ইংল্যাণ্ডের ঘোর প্রতিযোগী। তাকে কাঁচামালের জোগানদার ও তৈরি মালের বাজার করে রাখাই যদি ব্রিটিশ পলিসি হয় তবে শিক্ষিত বেকারদের নিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে। কিন্তু দেখতে দেখতে রেল স্টিমার ডাকঘর টেলিগ্রাফ এদেশেও এসে হাজির হয়। এখানেও নতুন কর্মের সুযোগ মেলে। যারা সরকারি চাকরি পায় না তারা ওকালতি করে। কিংবা মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে ডাক্তারি। জমিদার ঘরের ছেলেরা জমিদারি থেকে অনর্জিত আয় পায়। কারণ রেললাইন ও শহর বিস্তারের দরুন জমির দাম বেড়ে যায়। তারাও স্কুল বসায়, ডাক্তারখানা বসায়। স্কুলমাস্টার ও ডাক্তারকে কাজ দেয়। জেলা ও মহকুমা নিয়ে যে নতুন প্রশাসনের প্রবর্তন হয় তার উপরের দিকে ইংরেজ থাকলেও বাকিটা দেশীয়দের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ইউরোপের মতো এদেশেও রেনেসাঁসের স্তম্ভ বলতে বোঝায় জমিদার, বার্গার বা বণিক, উকিল, ডাক্তার, সরকারি আমলা। ওদেশের ক্লার্জির একাংশ রেনেসাঁসের পক্ষপাতী ছিল, এদেশেও ব্রাহ্মণদের একভাগ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিক আর নাই দিক রেনেসাঁসের পক্ষপাতী হয়। সর্বপ্রথমেই মনে আসে যাঁর নাম তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি সংস্কৃত কলেজের ভার পেয়ে সেখানে পাশ্চাত্য দর্শন পড়ানোর ব্যবস্থা করেন। যেমন জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনাবলি। একখানি চিঠিতে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এই বলে :

> For certain reasons, which it is needless to state here, we are obliged to continue the teaching of the Vedanta and Sankhya in the Sanskrit College. That the Vedanta and Sankhya are false systems of philosophy is no more a matter of dispute. While teaching these in the Sanskrit course we should oppose them by sound philosophy in the English course to counteract their influence.

পুরাতন বিদ্যার পাশাপাশি নতুন বিদ্যাও চলবে এই ছিল বিদ্যাসাগরের নীতি। তিনি যেমন সংস্কৃতশিক্ষাকে সাধারণের পক্ষে সহজ করতে *ব্যাকরণ কৌমুদী* প্রভৃতি বই লিখেছিলেন তেমনি ইংরেজি শিক্ষাকে সুলভ করতে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সংস্কৃত ছিল ব্রাহ্মণদের একচেটে, হল নতুন বিদ্যালয়গুলিতে শূদ্রদেরও অবশ্যপাঠ্য। এমনকী মুসলমানরাও ইচ্ছা করলে সংস্কৃত পড়তে পারত। আর ইংরেজি তো সর্বজনপাঠ্য হলই। বাংলাও।

সমসাময়িক ইউরোপের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় আমাদের নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সেকুলার ছিল। এর জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয় একদিকে যেমন রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কারমুক্ত ভারতীয়দের, অন্যদিকে ডেভিড হেয়ার ও মেকলে প্রমুখ সংস্কারমুক্ত ইউরোপীয়দের। ইতিহাসে দৈবাৎ এরূপ মণিকাঞ্চনযোগ ঘটে। বলা বাহুল্য এর মধ্যে একটা বিদ্যা বেচাকেনার ব্যাপার ছিল। পাঠ্যপুস্তক লিখে বিদ্যাসাগরও যে অর্থোপার্জন করেননি তা নয়। রেনেসাঁস অর্থোপার্জনের যেসব নতুন পন্থা খুলে দেয় এটাও তার একটা। সংবাদপত্র সম্পাদনা করে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অর্থোপার্জন করেন। কাব্য লিখে মাইকেল ও উপন্যাস লিখে বঙ্কিমচন্দ্রও অর্থলাভ করেন। স্বাধীনভাবে বাস করতে হলে স্বাধীন জীবিকা চাই। সরকারের বা জমিদারদের বা ধনিকের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করলে স্বাধীনভাবে বাঁচতেও পারা যায় না, লিখতেও পারা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ আমলেই এটা বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে সম্ভব হয়। ছাপাখানা ও শিক্ষাবিস্তার এটাকে সম্ভব করে।

তা ছাড়া স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করাও একটা নতুন অভিজ্ঞতা। মুঘল বা মারাঠা রাজত্বে স্বাধীন জীবিকা কারও ভাগ্যে জুটলেও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কারও নাগরিক অধিকারের অঙ্গ ছিল না। সিভিল লিবার্টির জন্যে স্বদেশে রক্তপাত করে ইংরেজরা বুঝত ওর কী মূল্য। এদেশেও হিকি প্রভৃতি সাংবাদিক তার জন্যে সংগ্রাম করেন। রামমোহনকেও তার জন্য সজাগ থাকতে হয়। এদেশে যেসব ইংরেজ রাজপুরুষ আসতেন গোড়া থেকেই তাঁদের একভাগ ছিলেন রক্ষণশীল ও আরেক ভাগ উদারনীতিক। রবীন্দ্রনাথ যাঁদের বলতেন ছোটো ইংরেজ ও বড়ো ইংরেজ। প্রশাসনের প্রত্যেক স্তরেই এঁদের দেখা যেত। উচ্চতর আদালতে উদারনীতিকদেরই ছিল প্রাধান্য। বিলেতের বিচার ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তিত হওয়ায় সাধারণ নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা আইনত স্বীকৃত হয়। কার্যত হতে বহু বাধা। উদারনীতিক ইংরেজ ও উদারনীতিক ভারতীয় এই এক জায়গায় মিলিত হন।

ইংরেজরা তাদের পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র এদেশে প্রবর্তন করতে প্রস্তুত ছিল না। তাদের স্বদেশেই তার ব্যাপ্তি হয়নি। এদেশের জনসাধারণ যে তার জন্যে প্রস্তুত ছিল তা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উদারনীতিক ইউরোপীয় ও উদারনীতিক ভারতীয় মিলে যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন তার কিছুদিন আগে থেকেই পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগে। এটা জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষার সমান্তরাল ও পরিপূরক। সারা ইউরোপ জুড়ে একই আকাঙ্ক্ষা। এর দক্ষিণে ছিল স্বৈরাচার ও বামে বিপ্লববাদ। এসব তরঙ্গ ভারতের মাটিতেও আছড়ে পড়ে। বিশেষত বাংলার মৃত্তিকায়। রেনেসাঁস যেখানে সবচেয়ে সক্রিয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর সর্বত্র বৈশ্যদের ধনবল ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল ও শূদ্রদের শ্রমবল তার প্রতিপক্ষরূপে তার সঙ্গে মোকাবিলার জন্যে ক্রমে ক্রমে তৈরি হচ্ছিল। ভারতও এর বাইরে ছিল না। কিন্তু ভারতের পরাধীনতা এটাকে আড়াল করেছিল। তা সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দের মতো দূরদর্শী পুরুষ সমাজতন্ত্রের কথা ভাবতে পেরেছিলেন। যদিও সেটা ধর্মনিরপেক্ষও নয়, নিরীশ্বরও নয়, মার্কসবাদীও নয় তবু সেটা সামাজিক ন্যায়। যা না হলে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র অপরিপূর্ণ থাকবে। সাম্যের চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্রও করেছিলেন। শ্রমজীবীদের জন্যে কেশবচন্দ্রেরও দরদ ছিল। জমিদারের প্রজাদের জন্যে রামমোহনও ব্যথা বোধ করতেন।

নারী ও শূদ্র সমাজের এই দুটি উপেক্ষিত ও উপেক্ষিতার মধ্যে নারীর জন্যেই কাজ হয় বেশি। সতীদাহ নিবারণ ও বিধবাবিবাহ প্রচলন তো রামমোহন বিদ্যাসাগরের অবিস্মরণীয় কীর্তি। নারীকে ব্রাহ্মমন্দিরের

বেদিতে আচার্যের আসনে বসানো তেমনি কেশবচন্দ্রের। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কন্যারা পুরুষের সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েন। ইউরোপেও সহশিক্ষা তখনও বেশিদূরে যায়নি। নতুন বিদ্যালয়ে নর-নারী উভয়ের জন্যে এটুকু স্বীকার করতেই চার শতাব্দী লেগে যায়। অবশ্য মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ঘরোয়া ব্যবস্থা ধনাঢ্য পরিবারে ছিল, কিন্তু তাদের কলেজে পড়তে পাঠানো—বিশেষ করে ছেলেদের কলেজে—গত শতাব্দীর মধ্যভাগেও ছিল রক্ষণশীলদের কাছে দৃষ্টিকটু। ঘরোয়া ব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডক্টর জনসন মন্তব্য করেছিলেন, 'কুকুর হাঁটছে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে এটা যেমন বিচিত্র ওটাও তেমনি।'

বাঙালির মেয়েরা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভরতি হবার পরে এক মার্কিন মেয়ে স্বদেশে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ না পেয়ে জার্মানিতে যান ও সেখানেও কেউ তাঁকে পড়তে দেয় না। শেষকালে একটি কলেজ তাঁর জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে রাজি হয়, কিন্তু একটি কি দুটি বিষয় নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ। এসব কথা যখন শুনি তখন ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজসংস্কারকদের শতবার সাধুবাদ দিই। বেথুন বলে পরিচিত বিটন সাহেবের মতো ইউরোপীয় শুভাকাঙ্ক্ষীদেরও বহু ধন্যবাদ। নর-নারীর সাম্যবিধানের সাধনায় জাতিধর্মনির্বিশেষে যাঁরাই কাজে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরাই আমাদের নমস্য। এককভাবে এ সাধনা এত কম সময়ের মধ্যে সিদ্ধ হত না। পরবর্তীকালে ইংল্যাণ্ডের সাফ্রাজেটরা সংগ্রাম করে যে অধিকার লাভ করেন সেঅধিকার বিনা সংগ্রামে এদেশের মেয়েরাও পান।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যে পুরাতন বিদ্যার পরিবর্তে নতুন বিদ্যার প্রবর্তন চেয়েছিলেন এর তাৎপর্য তাঁরা স্থিতাবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। যাঁরা ছিলেন তাঁরা সমাজের প্রবল ও সুবিধাভোগী অংশ। জনগণের তখন নিজের স্বার্থ বুঝে নেবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি নেই। বিদ্যাবুদ্ধি আসতে পারত টোল চতুষ্পাঠী মক্তব মাদ্রাসা থেকে নয়, স্কুল কলেজ থেকেই। তবে এটাও তাঁদের কাম্য ছিল যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ইংরেজির সহায়তায় যুগোপযোগী হয়ে জনশিক্ষার বাহন হয়। তার জন্যে তাঁরাও পাঠ্য প্রণয়ন করেছিলেন। বাংলা এর আগে পাঠশালার উপরে উঠতে পারেনি। তাকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করাই ছিল তৎকালীন কর্তব্য। সেস্তরে বাংলা হল অবশ্য শিক্ষণীয়। নীচের দিকে শিক্ষার মাধ্যম। লোকে যাকে ইংরেজি বিদ্যালয় বলত তাতে বাংলারও স্থান ছিল। বাংলার মতো অন্যান্য ভারতীয় ভাষাও অন্যত্র স্থান পায়। এসব ভাষাকে বলা হত দ্বিতীয় ভাষা। মর্যাদার দিক থেকে এরা ইংরেজির চেয়ে খাটো। পরে এটা অসহ্য হয়।

অসহ্য হবার কারণ বাংলার অভূতপূর্ব উন্নতি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক-খানাই বা পুথি লেখা হয়েছিল। আর কীই-বা ছিল তার মান। সংস্কৃত পন্ডিতরাও তাকে অবজ্ঞা করতেন। তার নিজের কোনো নাম পর্যন্ত ছিল না। শুধু 'ভাষা' বলে উল্লেখ করা হত। বিদেশিরাই নাম রাখে 'বেঙ্গলি'। তার থেকে আসে 'গৌড়ীয়'। পরে 'বাঙ্গলা'। অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে ঊনবিংশ শতাব্দীই বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। সোনার কাঠির পরশ লেগে রাজকন্যার ঘুম ভাঙে। ছুঁইয়ে দেয় ভিনদেশি রাজপুত্র। সেই যে জাগরণ, তার চিহ্ন জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগে—ধর্মে, সমাজে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, নগরবিন্যাসে, প্রাসাদনির্মাণে, থিয়েটারে, যানবাহনে। দেশটা হয়ে ওঠে কলকাতাকেন্দ্রিক। আর কলকাতা নিজে লণ্ডনকেন্দ্রিক।

এর নাম ঔপনিবেশিকতা। আমাদের সভ্যতা হয় কলোনিয়াল সভ্যতা। আমাদের সংস্কৃতিও কলোনিয়াল ধারায় চলেছে দেখে আমাদের মনীষীরা বিদ্রোহী হন। বঙ্কিমচন্দ্রের *বঙ্গদর্শন* এই বিদ্রোহের সংকেত। গোড়ায় এটা সাংস্কৃতিক বিদ্রোহ। পরে অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও সঞ্চারিত হয়। এরই চূড়ান্ত পরিণতি 'কুইট ইন্ডিয়া'। সঙ্গে সঙ্গে 'ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট'। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের ভিতরেই উভয়ের বীজ নিহিত ছিল।

ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধটা ছিল এই যে এপার থেকে জাহাজ ভরতি করে কাঁচামাল যেত ওপারে। আর ওপার থেকে জাহাজ ভরতি করে তৈরি মাল আসত এপারে। তেমনি এপার থেকে পুরাতত্ত্ব যেত ওপারে। আর ওপার থেকে আধুনিক বিদ্যা, আধুনিক চিন্তা, আধুনিক বিচার, আধুনিক নিয়মকানুন, আধুনিক কলাকৌশল, আধুনিক সংস্কার বা বিপ্লব আসত এপারে। পশ্চিম থেকে আসত বলেই তার সঙ্গে একটা

পশ্চিমা পোশাক ছিল। সেটা যাঁদের ভালো লাগত তাঁরা পোশাকটাতেই মুগ্ধ। আধুনিকতা তাদের চোখে নিছক সাহেবিয়ানা। আবার সেটা যাঁদের খারাপ লাগত তাঁরা পোশাক দেখেই রুষ্ট। আধুনিকতা তাদের চোখে সাহেবিয়ানা ছাড়া আর কিছু নয়। কোনটা যে পাশ্চাত্য আর কোনটা যে আধুনিক, কোনটা যে বিদেশি আর কোনটা যে স্বযুগী, এটা প্রথম দৃষ্টিতে পরিষ্কার ছিল না।

বিদেশির বিরুদ্ধে স্বদেশি খাড়া করতে গিয়ে যেটা হল সেটা স্বযুগীর বিরুদ্ধে বিযুগী। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর বিরুদ্ধে অষ্টাদশ শতাব্দী। যাঁরা মুসলিমবিরোধী তাঁরা পারসিকবিরোধী হওয়ায় তাঁদের বেলা অষ্টাদশ শতাব্দীই যথেষ্ট বিযুগ নয়। তাঁরা আরও উজানে গিয়ে হাজির হন দ্বাদশ শতাব্দীতে। সংস্কৃত যখন ছিল একচ্ছত্র। তাঁদের অনেকে আরও উজিয়ে যান কালিদাসের কালে। কেউ কেউ আরও দূরে উজিয়ে যান মুনিঋষিদের কালে। ইসলাম এঁদের বাঞ্ছিত সংস্কৃতির ত্রিসীমানায় ছিল না। খ্রিস্টধর্মও না। তা বলে যে এঁরা বৌদ্ধ ধর্মের উপর সদয় ছিলেন তা নয়। বুদ্ধ সম্বন্ধে এঁদের ধারণা জয়দেবের মতোই। *বুদ্ধ* নাকি *বিষ্ণুরই* একটি অবতার। যদিও বৌদ্ধদের মতে *বুদ্ধই* সব দেবতার উপরে। প্রাচীন বিদ্যা সম্বন্ধে যতখানি মুক্ত মন চাই ততখানি এঁদের ছিল না। নতুন বিদ্যা সম্বন্ধে তো নয়ই। অথচ প্রেরণা আসছে যেখান থেকে সেটা হচ্ছে স্বদেশবোধ ও স্বদেশের স্বাধীনতাকামনা।

অথচ ওদিকে টেলিগ্রাফ উদ্ভাবিত হয়েছে। রোজ তার আসছে বিদেশ থেকে। ছাপা হয়ে যাচ্ছে খবরের কাগজে। জাহাজের খবরের জন্যে কেউ সবুর করবে না। দুনিয়া এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমের আধুনিকতার সঙ্গে পা ফেলে। প্রাচ্যের প্রাচীনতার সঙ্গে পা ফেলবে কে? দেশের লোকও পাশ্চাত্য না হোক আধুনিক হতে চায়। বাহ্যত আধুনিক। অন্তর থেকে আধুনিক হওয়া অত সহজ নয়। তেমন একজন মানুষ ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তেমন একজন মানুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর। এঁরা এঁদের পরবর্তীদের চেয়েও অগ্রগামী ছিলেন কারণ রেনেসাঁস তখনও তার গতিবেগ হারিয়ে রিভাইভালের মরুপথে ক্ষীণধারায় প্রবাহিত হয়নি।

দেশাভিমানীদের মতে ভারতীয় সাহিত্যের, দর্শনের, শিল্পের বিচার হবে ঐতিহ্যবাহিত স্বকীয় স্ট্যাণ্ডার্ডে। আন্তর্জাতিক স্ট্যাণ্ডার্ডে নয়। আন্তর্জাতিক স্ট্যাণ্ডার্ড তো প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় স্ট্যাণ্ডার্ড। তাকেই যদি প্রামাণিক বলে মেনে নেয় তবে ভারত তার আপনাকে হারাবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য, গ্রামীণ কারুশিল্প সব একে একে গেছে। এক সভ্যতার বাসগৃহে অপর এক সভ্যতা এসে জবরদখল নিয়ে বসেছে। থাকবার মধ্যে আছে ভারতীয় সংস্কৃতি। সেও কি তার নিজ বাসগৃহে পরমুখাপেক্ষী হবে? না, আমাদের দুর্গ আমরা পরকে ছেড়ে দেব না। সাংস্কৃতিক বিজয় ঘটতে দেব না। ভারতের আত্মা অপরাজিত। ধর্মেই এর সমধিক প্রকাশ। ধর্মের পরেই সংস্কৃতি। সংস্কৃতিকে যারা ফেরঙ্গ সংস্কৃতিতে পরিণত করতে চায় তারা স্বদেশের শত্রু।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে প্রতিরোধ দেখা দিয়েছিল সেটা হিন্দু নামক একটি ধর্ম বা সমাজের তরফ থেকে। শেষের দিকে যেটা দেখা দিল সেটা ভারত নামক একটি দেশের তরফ থেকে। নামে ভারত, কার্যত হিন্দু ভারত। দেশের আত্মাকে বিজিত হতে দিলে এদেশ কোনোদিন স্বাধীন হতে পারবে না। সাংস্কৃতিক বিজয় সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, সকলেই এ বিষয়ে একমত। দিকে দিকে স্বদেশি চারুশিল্প ও কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবন হয়, জাতীয় শিক্ষার আত্মরক্ষা করে ও পরবর্তী কালে রাজনৈতিক বল পরীক্ষার জন্যে শক্তি সংগ্রহ করে। নৈতিক ও মানসিক শক্তি। সামনে একটা সংগ্রাম রয়েছে একথা যদি মনে রাখি তা হলে পুনরুজ্জীবনবাদী প্রযত্ন দেখে আশ্চর্য হব না। দুর্বল দেশ এমনি করে প্রবল দেশের সঙ্গে লড়তে সাহস পায়।

রেনেসাঁস এসেছিল মানুষকে সর্বদেশে সর্বপ্রকারে মুক্ত করতে। শাস্ত্রের হাত থেকে, দেবতার হাত থেকে, গুরুর হাত থেকে, পুরোহিতের হাত থেকে, রাজার হাত থেকে, সামন্তের হাত থেকে। কুসংস্কারের হাত থেকে, কুপ্রথার হাত থেকে, অসাম্যের হাত থেকে। এক দিনে বা এক শতাব্দীতে নয়। ধাপে ধাপে। সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। সেই হচ্ছে বিদ্যা যা মুক্তি দেয়। রেনেসাঁস এসেছিল তেমন বিদ্যা নিয়ে। আমাদের বহু

ভাগ্য যে অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি কতক লোকের মন তার জন্যে উন্মুখ ছিল। মহাসৌভাগ্য যে কলকাতা ছিল রাজধানী ও সমুদ্রপথে ইউরোপ আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত। সেই সূত্রে তথ্য ও আইডিয়ার চলাচল ছিল অবধারিত। কিন্তু জনগণ তার অংশীদার ছিল না ও প্রাচীনপন্থীরা ছিল বিরূপ। পরে দেশাভিমানীরাও হয় বিমুখ।

আমাদের রেনেসাঁসের পরাকাষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার। তাতে করে প্রমাণিত হয় যে আন্তর্জাতিক স্ট্যাণ্ডার্ড বলে একটা-কিছু আছে আর বাংলা সাহিত্য সেই স্ট্যাণ্ডার্ডে উপনীত হয়েছে। অধিকন্তু এটাও প্রমাণিত হয় যে, ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতি একটি বিজিত দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি নয়। ভারত সেক্ষেত্রে অপরাজিত। এতে আমাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ বেড়ে যায়। আমরাও পশ্চিমের সঙ্গে পাল্লা দেবার সামর্থ্য রাখি। 'জগৎ কবিসভায় মোরা তোমার করি গর্ব। বাঙালি আজ গানের রাজা বাঙালি নহে খর্ব।' সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এই উক্তি সব গ্লানি ভুলিয়ে দেয়।

তখনও কারও জানা ছিল না যে প্রথম মহাযুদ্ধ আসছে, তার পিঠ পিঠ রুশবিপ্লব ও তার শেষে ভারতের গণজাগরণ। যেমন পশ্চিম ইউরোপে তেমনি ভারতেও একটা যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর আরও বিশটা বছর টেনে আনলে বলতে পারা যায় ওটা ঊনবিংশ শতাব্দীরও শেষ। সব দেশের লিবারলরা অস্তংগমিতমহিমা। এমনতরো মোহভঙ্গ এর পূর্বে আর কখনো ঘটেনি। সভ্যতার স্বরূপ দেখে সভ্য মানুষ বর্বরের দিকে ঈর্ষার সঙ্গে তাকায়। কতক সভ্য মানুষ বর্বর বনে যায়ও। ইটালিতে ও জার্মানিতে। তাদের চেহারা দেখে কে বিশ্বাস করবে যে তাদের দেশে একটা রেনেসাঁস ও রিফর্মেশন হয়েছিল? প্রমাণ কোথায় যে মানবিকবাদ বিকশিত হয়েছিল?

ইউরোপের উপর মোহভঙ্গ আমাদের আপনার দেশের দিকে ফিরে তাকাতে উদবুদ্ধ করে। মোহভঙ্গটা শুধু পশ্চিমের উপর নয়, আধুনিকের উপরও। নাগরিকের উপরও। আমরা গ্রামে যাই। জনগণের সঙ্গে অভিন্ন হতে চেষ্টা করি। আমরা মনেপ্রাণে স্বদেশি হতে গিয়ে স্বদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যেই আমাদের চিৎপ্রকর্ষের, আমাদের বৈশিষ্ট্যের ও আমাদের সৃজনীশক্তির উৎস আবিষ্কার করি। আমাদের সত্যিকার শিকড় যেমন গ্রামে, গ্রামীণ শিল্পে ও কৃষিকর্মে, তেমনি লোকসংস্কৃতিতে ও তারই উপর ভিত্তি করে রচিত বা গ্রথিত রামায়ণে মহাভারতে। রামায়ণ মহাভারতই আমাদের ভিতরকার ইতিহাস।

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তাকে বাদ দিলে ভারতীয় সভ্যতার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এসেছে রামায়ণ ও মহাভারত। এই দুই মহাকাব্য অবলম্বন করে হাজার হাজার বছর ধরে লেখা হয়েছে হাজার হাজার খন্ডকাব্য, আঁকা হয়েছে হাজার হাজার ছবি, গড়া হয়েছে হাজার হাজার মূর্তি। নাচা হয়েছে হাজার হাজার নাচ, গাওয়া হয়েছে হাজার হাজার গান, শোনানো হয়েছে হাজার হাজার কথকতা, অভিনীত হয়েছে হাজার হাজার নাটক বা যাত্রা। কোথায় তার ছেদ বা ডিসকন্টিনিউইটি!

রামায়ণ বা মহাভারত একজন লেখকের একজীবনে লেখা হয়েছে বলে মনে হয় না। হয়ে থাকলে বহুযুগ ধরে প্রচলিত বহুজনের গাওয়া লোকগীতি বা গাথা অবলম্বন করে হয়েছে। মূল কাহিনির সঙ্গে শাখা-প্রশাখা জুড়ে জুড়ে কাব্যকে যে বিশাল আয়তন দেওয়া হয়েছে তা কোষগ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয়। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি এইভাবে আপনাকে দুটি কোষগ্রন্থে সংহত ও সংক্ষিপ্ত করে ভাবীকালের জনসাধারণের জন্যে রেখে যায়। মধ্যযুগের ভারত এই দুটির অঙ্গে আর কিছু সংযোজন করেনি। তবে সংস্কৃত থেকে বাংলা প্রভৃতি ভাষার ভাবানুবাদ যাঁরা করেন তাঁরা যেমন কতক অংশ বাদ দেন তেমনি কতক অংশ জুড়ে দেন আর চরিত্রগুলিকেও এমনভাবে রূপান্তরিত করেন যে তারা হয়ে ওঠে স্বকালের ও স্বপ্রদেশের নর-নারী। তার থেকে বিষয় নিয়ে যখন যাত্রা অভিনয় হয় তখন দর্শকদের রুচি অনুসারে নতুন নতুন চরিত্রের উদ্ভাবন হয়। রামায়ণ ও মহাভারত জনতার অনুরোধে গ্রামে গ্রামে সৃষ্ট হয়ে চলেছে। কেবল ভারতে নয়, ইন্দোনেশিয়ায় ও ইন্দোচীনে। তথা সিংহলে।

একদা যা ছিল ক্ষত্রিয়দের বীরগাথা ও রাজসভাতেই গীত বা অভিনীত হত তা এখন সর্বজনপ্রিয়। তার সঙ্গে মিশে গেছে ধর্ম আর দর্শন, পুরাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব, ধনুর্বিদ্যা ও রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র। জনতা এর সবটা চায় না ও পায় না। তারা বোঝে বীরত্ব ও যুদ্ধ, সেইসঙ্গে কয়েকটি মূলনীতি। পিতৃসত্যের জন্যে রাম বনে গেলেন, পত্নী উদ্ধারের জন্যে তিনি যুদ্ধ করলেন, প্রজারঞ্জনের জন্যে তিনি পত্নীকে বনবাসে পাঠালেন। যুধিষ্ঠির সর্ব অবস্থায় সত্যনিষ্ঠ, সেইজন্যে স্বর্গের পথে তার পতন ও মৃত্যু হল না, তিনি সশরীরে স্বর্গে গেলেন, কিন্তু একবার একটি অর্ধসত্য ও অর্ধ অসত্য উচ্চারণের কর্মফল হল নরক দর্শন। সত্যের উপর এই পরিমাণ জোর আর কোনো দেশের মহাকাব্যে আছে কি না বলতে পারব না। তবে কয়েকটা মূলনীতি ইলিয়াডেও আছে, ওডিসিতেও আছে। আছে জার্মানদের নিবেলুঙ্গেনলিড নামক প্রাচীন কাব্যে। কার কাছে কোনটা বড়ো সেটাই সার কথা।

রামায়ণ মহাভারত যতদিন বহমান থাকবে ততদিন জনমানসে ধারাভঙ্গ ঘটবে না। কিন্তু সেটা কতদিন তা কেউ ভবিষ্যদবাণী করতে পারবে না। শিল্পবিপ্লব ভারতেও সক্রিয়। সমাজবিপ্লব না হোক সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন ভারতীয়দেরও অন্বিষ্ট। কালক্রমে রামায়ণ মহাভারতের মহিমাও অস্তংগমিত হবে। সেক্ষত্রিয়সমাজ তো আর নেই। রাজারাজড়াদের যুগ গেছে। পরে বীরগাথার পাত্ররা হবে অনভিজাত। অতিপ্রাকৃতেও লোকের বিশ্বাস শিথিল হবে। সূর্য যে কী তা একবার জানবার পর তাকে বগলদাবা করা বীর হনুমানেরও অসাধ্য হবে। গন্ধমাদন বয়ে আনাও অবিশ্বাসের উদ্রেক করবে। তেমনি কুন্তীর ও গান্ধারীর পুত্রলাভের প্রক্রিয়াও সন্দেহজনক হবে। তা বলে রামায়ণ ও মহাভারতের আবেদন ব্যর্থ হবে না। রামায়ণ মহাভারত নতুন করে লেখা হবে। যতদিন না জননায়করা ফতোয়া দিচ্ছেন যে, ওই দুটি মহাকাব্য ফিউডাল সমাজ ব্যবস্থার ধারক ও বাহক। সুতরাং পরিত্যজ্য। যেমন পরিত্যজ্য চীন দেশে কনফিউসিয়াসের শিক্ষা।

ভবিষ্যতে ধারাভঙ্গ হবে না এমন কথা কেউ বলতে পারে না। আমিও বলব না। জীবন কখনো একই খাতে প্রবাহিত হয় না। বড়ো বড়ো নদীকেও মাঝে মাঝে খাত বদল করতে দেখা যায়। বড়ো বড়ো সভ্যতাও যদি তাই করে তবে আশ্চর্য হবার কী আছে? ভারত অনেককাল ধরে বিচ্ছিন্ন ছিল বলে এতদিন হয়তো একটা ব্যতিক্রম ছিল। এখন আর তা নয়। জলপথে জাহাজ এসে তার বিচ্ছিন্নতা দূর করছে। আকাশপথে বিমান এসে তাকে অবিচ্ছেদ্য করছে। ব্যতিক্রমের মোহভঙ্গ হলে অতীতের সঙ্গে ধারাভঙ্গও হতে পারে। তবে সেটা আমাদের কাম্য নয়। আমরা চাই অতীতের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করে অগ্রসর হতে। অন্বয়রক্ষা মানে কিন্তু অতীতরক্ষা নয়। অতীতের স্থান যাদুঘরে। সেখানেই তাকে রক্ষা করতে হবে। জীবনে স্থান দিতে হবে বর্তমানকে ও তার পরে ভবিষ্যৎকে। জীবনেও যারা অতীতরক্ষা করতে চায় তাদের সঙ্গে অগ্রসর দলের ছাড়াছাড়ি ঘটবেই।

রেনেসাঁসের সময়ও অতীতরক্ষীদের সঙ্গে অগ্রসর দলের ছাড়াছাড়ি ঘটেছিল। প্রথমে সতীদাহের প্রশ্নে। পরে ইংরেজি শিক্ষার প্রশ্নে। আরও পরে উপবীত ত্যাগের প্রশ্নে, জাতিভেদের প্রশ্নে, নারীর অধিকারের প্রশ্নে, অসবর্ণ বিবাহের প্রশ্নে। আরও পরে বহুবিবাহের প্রশ্নে। ছাড়াছাড়ি বলতে বোঝায় একটা পা-কে পেছনে রেখে আরেকটা পায়ে এগিয়ে যাওয়া। পেছিয়ে থাকা পা চিরদিন পেছনে পড়ে থাকে না। সেও তার নিজের সময়ে এগোয়। হয়তো একশো বছর সময় নেয়। কিংবা আরও বেশি। সংস্কারবদ্ধ মন সহজে সংস্কারমুক্ত হয় না। এই তো সেদিনও আমাদের ধারণা ছিল হিন্দুমতে বিয়ে হয়ে থাকলে বিবাহবিচ্ছেদ অসম্ভব। এর যাতে পুনর্বিচার হয় তার জন্যে আমি কত কষ্ট করে উপন্যাস লিখলুম। এখন দেখছি হিন্দুরা ক্যাথলিকদেরও হার মানিয়ে দিয়েছে। রক্ষণশীল পরিবারেও বিবাহবিচ্ছেদ চলতি হয়ে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িও হচ্ছে। এ অসম্ভব সম্ভব হল কী করে? হল এইজন্যে যে মেয়েরাও শিক্ষিত হয়েছে। তারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করতে রাজি নয়, বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হয়ে থাকলে নতুন করে আরম্ভ করতে চায়। একই মনোভাব ছেলেদের মধ্যেও।

পুনর্বিচার, পুনর্মূল্যায়ন, পুনরারম্ভ এইসব হল রেনেসাঁসের মর্ম। অগ্রসর অংশটাই ঐতিহ্যের দ্বারা সম্মোহিত না হয়ে তার উপর স্বাধীন বিবেক ও মুক্ত বুদ্ধির প্রয়োগ করে। অহেতুক বর্জনও করে না, অহেতুক সংরক্ষণও করে না। অপরিবর্তনীয় বা সনাতন বলে তাকে নিরস্ত করতে যায় পশ্চাৎপদ অংশ। তার উপর নির্যাতনও করে। তাকে দুর্ভাগ্যের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। ধীরে ধীরে জনমতের গতি হয় অগ্রমুখী। ইতিহাসও তাই চায়। অগ্রসর অংশের কার্যকলাপ ইতিহাসের অভিপ্রায় সিদ্ধ করে। বলতে পারা যায় যে মানুষের ভিতর ইতিহাস কাজ করে যায়। এই প্রাচীন দেশের ইতিহাসের এটাও একটা পটপরিবর্তন। এই যাকে বলা হচ্ছে রেনেসাঁস। রেনেসাঁস সম্পূর্ণ হলে প্রাচীন আর প্রাচীন থাকে না। সেহয় নবীন। ভারতকে আমরা নবীন ভারত বলতে পারব যখন দেখব পশ্চাৎপদ অংশও অগ্রসর অংশের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিয়েছে।

বিশ্বাসী খ্রিস্টানরা মানুষকে পুড়িয়ে মারত এই ভেবে যে তার দেহ ভস্মীভূত হলেও তার আত্মার কল্যাণ হবে। বিশ্বাসী হিন্দুরাও সদ্যবিধবাকে পুড়িয়ে মারত এই মনে করে যে সাধ্বী স্ত্রীর যথার্থ স্থান হল স্বামীর সঙ্গে, যেমন ইহলোকে তেমনি পরলোকে। নয়তো সেসাধ্বী নয়। তার সতীত্ব অপরীক্ষিত। রামমোহন ও তাঁর সমসাময়িক অগ্রবর্তীরা এর পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়ন করেন। যে স্বামীর চিতায় পুড়ে মরল ও যে তা করল না তাদের একজন কি সাধ্বী, অপরজন অসতী? এটা পুরাতন বিচার। নতুন বিচার এ নয়। বেঁচে থেকেও যদি সাধ্বী হওয়া যায়, অগ্নিপরীক্ষা না দিয়েও যদি সতী হওয়া যায় তবে কেন ওই অনাবশ্যক মৃত্যু? যা কখনো আত্মহত্যা, কখনো প্রথাসিদ্ধ হত্যা। অসভ্য মানুষের নরবলির সভ্য সংস্করণ। শিক্ষিত ভদ্র হিন্দুরাও এই প্রশ্নে রামমোহনের বিপক্ষে দাঁড়ান ও প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত ধাওয়া করেন। আইন করে সতীদাহ নিবারণ সম্বন্ধে রামমোহনেরও দ্বিধা ছিল। বেন্টিঙ্কের ছিল না। ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্ট বেন্টিঙ্কের মধ্যেই মূর্ত হয়েছিল। জনমতের জন্যে তিনি অপেক্ষা করেননি। ক্ষমতার সুপ্রয়োগ করে অমানবিককে রহিত করেন। জানতেন না যে তাতে করে সিপাহি বিদ্রোহকে ইন্ধন জোগানো হবে। সিপাহিরা ছিল পশ্চাৎপদ অংশ। অগ্রসর অংশ তাদের সমর্থন করে না। করে ইংরেজ রাজেরই সমর্থন।

বিধবাবিবাহের প্রবর্তনের পেছনেও ছিল পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়ন। যে নারী দশ ও বারো বছর বয়সে বিধবা হয়েছে সেতার স্বামীসঙ্গ থেকে ও মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হলেই কি তার সেই বঞ্চিত থাকাটাই হবে সতীত্ব? সারাজীবন মৃত স্বামীর ধ্যান ও অমানুষিক কৃচ্ছ্র সাধনই হবে সতীত্বের পরীক্ষা? তাই যদি হয় তবে সেটা হোক ঐচ্ছিক। কিন্তু সবাইকে বাধ্য করা কেন? যখন দেখা যাচ্ছে যে অনেকেরই জীবনে ঘটছে স্খলন পতন ও সেটা প্রকৃতির সঙ্গে যুঝতে গিয়ে। নতুন করে ঘরসংসার পাতার সুযোগ পেলে তারাও হত সুচরিতা পত্নী ও জননী। তারাও সতী, যদি সতীত্বের সংজ্ঞাকে উদার করি।

সতীদাহের পেছনে ছিল সতীত্ব সম্বন্ধে বহুকালের সংস্কার। তাকে টলিয়ে দিয়ে যান রামমোহন। সেটা না টললে সতী নারীর বৈধব্যের পর পুনর্বিবাহ বিরোধী সংস্কার টলত না। এটাকে টলিয়ে দেন বিদ্যাসাগর। এর পরের ধারা হল বহুবিবাহ নিরোধ। বিদ্যাসাগর এর জন্যেও একটা আইন পাস করাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের পর সরকার হয়েছিলেন বিষম সতর্ক। আইন পাস না হলেও জনমত ধীরে ধীরে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে যায়। এখানেও সেই পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়ন চলছিল। একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী এতকাল কারও চোখে বিসদৃশ ঠেকেনি। লোকে এই ভেবে সমর্থন করত যে পিন্ডের জন্যে পুত্রের প্রয়োজন ও পুত্রের জন্যে ভার্যার। একটি ভার্যার যদি পুত্র না হয় তবে আরেকটি বিবাহ করাই তো সঙ্গত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মানবিকবাদ নারীর মূল্য বাড়িয়ে দেয়। পুত্র যার হয়নি সেও তো একটি নারী। সেবেঁচে থাকতে আর একটি নারী গ্রহণ করা কি অন্যায় নয়? এই যে অন্যায়বোধ এটা নতুন। বংশরক্ষা যদি নাও হয়, পিন্ডদান যদি নাও হয় তা হলেও এক স্ত্রী থাকতে আর এক স্ত্রী গ্রহণ করা চলবে না। পরিশেষে এটা আইন পাশ করে নিষিদ্ধ হল স্বাধীনতার পরে।

সাহিত্যে এই নূতন মূল্যবোধের প্রতিফলন হয়। ভার্যার মূল্য তো বেড়ে যায়ই, নারী মাত্রেরই মূল্য যায় বেড়ে। তাই বিধবা পায় পুনর্বিবাহের অধিকার, কুমারী পায় নিজের পতি মনোনয়নের অধিকার, সধবা পায়

বিবাহবিচ্ছেদের শর্তাধীন অধিকার, পতিতা পায় সংশোধনের পর সম্মানিত জীবনের অধিকার। সব ক-টি অধিকারের মূলে সাম্য ও স্ব-স্বাধীনতা, যেমন পুরুষের বেলা তেমনি নারীর বেলা। রেনেসাঁস না হলে এ কি কখনো হত? রেনেসাঁস যে হয়েছে এই তার মোক্ষম প্রমাণ।

তবে এটাও ঠিক যে দেশের লোক কোনোরকম পরিবর্তনই কেবলমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য বলে বা ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নিত না। সেইজন্যে পদে পদে সংস্কৃত শাস্ত্র থেকে বচন উদ্ধার করে বোঝাতে হত যে শাস্ত্রেও এর অনুমোদন আছে। তেমনি মহাভারত থেকে দৃষ্টান্ত চয়ন করে প্রাচীন ভারতের নজির দেখাতে হত। সেইভাবেই ঐতিহ্যের অন্বয় রক্ষা করতে হয়। ডিসকন্টিনিউইটি এড়াতে হয়।

৩

ওদের রেনেসাঁস আর আমাদের রেনেসাঁস এই দুই রেনেসাঁসের মধ্যে মৌল প্রভেদ ছিল একটি জায়গায়। ওদের রেনেসাঁস এসেছিল প্রাচীন গ্রিস রোমের সঙ্গে ছিন্ন যোগসূত্র পুনরুদ্ধার করতে। আমাদের বেলা প্রাচীন ভারতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি, সুতরাং পুনরুদ্ধারের কথা ওঠে না। আমাদের রেনেসাঁস এসেছিল আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে নতুন করে যোগসূত্র স্থাপন করতে। মাঝখানে ছিল বহু সমুদ্রের তথা বহু শতাব্দীর ব্যবধান। সমুদ্র লঙ্ঘন করা তত কঠিন নয় শতাব্দী লঙ্ঘন করা যত কঠিন। একটা পেছিয়ে-পড়া দেশকে এগিয়ে যাওয়া কালের সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে, এই ছিল আমাদের রেনেসাঁসের আহবান। তার জন্যে রাখতে হবে অগ্রসর যাত্রীদের উপর দৃষ্টি।

আমাদের রেনেসাঁসের নায়কদের দৃষ্টি ছিল অগ্রসর যাত্রীদের উপরে। তাই ভারতও দিন দিন আধুনিক হয়ে ওঠে। আধুনিক ভারত আর মধ্যযুগের ভারত নয়। যদি মধ্যযুগের ভারত হয়ে থাকে তবে আধুনিক ভারত নয়। কিন্তু কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিলেও এদেশের প্রাচীনের সঙ্গে এদেশের আধুনিকের একটা যোগসূত্র ছিল। সেটার সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে অগ্রসর হলে ঐতিহ্যবোধ হারিয়ে যেত। ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্বয়রক্ষাও ছিল আমাদের অন্যতম অবশ্য কর্তব্য। আমাদের রেনেসাঁসের নায়করা প্রাচীন ভারতের সঙ্গে অন্বয়রক্ষা করতে যত্নবান ছিলেন। কেমন করে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের সমন্বয় ঘটানো যায় এটা ছিল তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন।

পরবর্তীকালের চিন্তানায়কদের কাছে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হল কেমন করে পরাধীন ভারতকে স্বাধীন ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়। যেমনটি পলাশির পূর্বে ছিল বা পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের পূর্বে ছিল। কারও মতে পরাধীনতা হয় পলাশির পর থেকে। কারও মতে পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের পর থেকে। যাঁদের মত মুসলিম-শাসিত ভারতও ছিল পরাধীন ভারত, তাঁরা স্বাধীন ভারত বলতে বুঝতেন প্রাচীন ভারত। সেই প্রাচীন ভারতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা বা সেইখানে ফিরে যাওয়াই ছিল তাঁদের মতে স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এর নাম রেনেসাঁস নয় রিভাইভাল। রিভাইভালের নায়করা আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে সমন্বয়ের কথা ভাবতেন না। বরং ভাবতেন কেমন করে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ঝগড়াটা শুধু ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে নয়। ইংল্যাণ্ড যাকে বয়ে নিয়ে এসেছে সেই আধুনিক তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গেও। পুনরুজ্জীবনবাদীরা প্রাচ্যের দেশরক্ষী ও কালরক্ষী।

পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব যদি না মেলে রেনেসাঁসপন্থীরা বলবেন বৈজ্ঞানিকটাই সত্য আর রিভাইভালপন্থীরা বলবেন পৌরাণিকটা সত্য। পুরাণের সঙ্গে ইতিহাসের বিবরণ যদি না মেলে রেনেসাঁসপন্থীরা বলবেন ইতিহাসের বিবরণটাই প্রামাণিক আর রিভাইভালপন্থীরা বলবেন পুরাণের বিবরণটাই প্রামাণিক। দুই পক্ষই ইংরেজি শিক্ষিত, দুই পক্ষই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার ফসল। অথচ রিভাইভালপন্থীদের কথাবার্তা শুনলে মনে হবে তাঁরা স্কুল-কলেজ থেকে কিছুই শেখেননি কিংবা যা শিখেছেন সব ভুল। তা বলে যে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের টোল চতুষ্পাঠীতে পাঠাবেন তা নয়। যাবে তারা ওইসব স্কুল-কলেজেই কিংবা নবপ্রতিষ্ঠিত গুরুকুলে বা ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। যুগটাকে তাঁরা সরাসরি অস্বীকারও করতে পারেন না। নবপ্রতিষ্ঠিত

বিদ্যালয়েও মাতৃভাষায় একালের ভূগোল ইতিহাস পড়ানো হয়। অথচ মনটা পড়ে আছে সুদূর অতীতে। যখন চারিদিকের আবহাওয়া ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালিয়ানরাও তো দু-হাজার বছর পূর্বের গ্রিসের পুনর্জন্ম কল্পনা করেছিল। হোমরের গ্রিস, পেরিক্লিসের অ্যাথেন্স ছিল তাদের কল্পলোক। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালিরাও যদি বেদ উপনিষদের তপোবন তথা রামায়ণ মহাভারতের রাজসভার বা রণাঙ্গনের কল্পনা করে কেনই-বা তার নাম হবে পুনরুজ্জীবন? পুনর্জন্মের জন্যে কেনই-বা তাদের স্বদেশের বাইরে তাকাতে হবে? আধুনিক ইউরোপের কাছে পাঠ নিতে হবে? তাহলে তো ইউরোপকেই ভারতের উপর জিতিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে কি ভারত তার স্বাধীনতা ফিরে পাবে? হেরে যাওয়া দেশের মানসিক বল নির্ভর করে বিজেতার দান প্রত্যাখ্যানের উপর। নতুন বিদ্যাও তো সেইরূপ একটা দান।

রিভাইভালের সঙ্গে রেনেসাঁসের তফাতটা হচ্ছে ভক্তির সঙ্গে যুক্তির, বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের, পূর্বপুরুষ পূজার সঙ্গে আত্ম-স্বাধীনতার। শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে বাস্তবজ্ঞানের, আপ্তবাক্যের সঙ্গে পরীক্ষানিরীক্ষার, স্থিরসিদ্ধান্তের সঙ্গে কৌতূহলী জিজ্ঞাসার, সংস্কারের সঙ্গে সংস্কারমুক্তির, আচারের সঙ্গে আচার লঙ্ঘনে, স্থিতাবস্থার সঙ্গে অভিনবত্বের। বর্ণাশ্রমের সঙ্গে বর্ণাশ্রম বর্জনের, যজ্ঞের সঙ্গে যজ্ঞত্যাগের, মন্ত্রের সঙ্গে খোলা মনের। রিভাইভালপন্থীদের কথা হল সেকালে যা হয়নি একালে তা হবে না, সেকালের মতো হবে। রেনেসাঁসপন্থীদের কথা হল পুনর্জন্ম মানে পূর্বজন্ম নয়, দেশ তার পূর্বজন্মে ফিরে যেতে পারে না। দেশকে বাঁচাতে হবে কালের সঙ্গে তাল রেখে। কালকে বদলে দিতে পারা যাবে না দু-হাজার বা দু-শো বছর বাদে।

অশনে বসনে স্বদেশি, শিক্ষায় দীক্ষায় স্বদেশি হতে গিয়ে সত্যযুগের মতো যোগী ঋষি ও বর্ণাশ্রমী, এই যে বিবর্তন এটা স্বদেশের দুর্গরক্ষার জন্যে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাতীয়তাবাদ ছিল না, তাই পুনরুজ্জীবনবাদও ছিল না। নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদই পুনরুজ্জীবনের উত্থানের কারণ। *আনন্দমঠ* থেকে *গোরা* পর্যন্ত সময়টা ছিল রিভাইভালবাদের মধ্যাহ্নকাল। রবীন্দ্রনাথ প্রভাব কাটিয়ে ওঠেন। 'সবুজপত্রে' যাঁকে পাই তিনি রেনেসাঁসের রবীন্দ্রনাথ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর দেখা গেল রেনেসাঁসের পাল থেকে হাওয়া সরে গেছে। কারণ খাস ইউরোপেই একটা হাওয়াবদল হয়েছে। জীবনের মূল প্রত্যয়গুলোই মার খেয়েছে বা ধ্বংস হয়েছে। কবিদের কেউ কেউ নিশ্চিত অন্বেষণে ক্যাথলিক ডগমার আশ্রয় নিয়েছেন। রেনেসাঁস মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার পরিণতি কমিউনিজম ও ফ্যাসিজম? না রেনেসাঁসের আদর্শের ভিতরেই বিনাশের বীজ নিহিত ছিল? দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে একটা হিসাবনিকাশের পালা চলে। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে আরেক দফা মার দেয় ও আরও বিধ্বংস ঘটায়। বাইরের ভাঙন পুনর্গঠিত হয়। কিন্তু ভিতরের ভাঙন চায় নতুন নিশ্চিতি, নতুন বিশ্বাস, নতুন স্বপ্ন, নতুন কল্পনা। কেউ কেউ তার জন্যে রাশিয়ার বা চীনের দিকে চেয়ে আছেন। কেউ কেউ-বা আমেরিকার দিকে। ইউরোপের নিজের বলতে যেটা ছিল সেটা আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত। সেও করছে তার দুর্গরক্ষা। তারও স্বাধীনতা বিপন্ন। যদিও ঠিক আক্ষরিক অর্থে নয়। ইউরোপ যাকে রক্ষা করতে চায় তা দু-হাজার বছর আগেকার ইউরোপ নয়, গত তিন-চার শতকের ইউরোপ।

এই যখন খাস ইউরোপের অবস্থা তখন তার কাছে থেকে যাঁরা প্রেরণা পেতেন তাঁদের অবস্থা করুণ। দেশ স্বাধীন হয়েছে। পুনরুজ্জীবনবাদের পুরোনো অজুহাত আর নেই, তবু পরাধীন ভারতের মতো স্বাধীন ভারতেও পুনরুজ্জীবনবাদ নতুন অজুহাতে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলাম তার শত্রু, কমিউনিজম তার শত্রু। কিংবা তারাও নয়, প্রগতিশীল মতবাদ তার শত্রু। দেশের একভাগই অপরভাগের শত্রু। নূতনই পুরাতনের শত্রু। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় হতে পারে, কারণ একটার অস্তিত্ব অপরটার নাস্তিত্ব নয়। কিন্তু নূতন ও পুরাতনের সঙ্গে সমন্বয় কেমন করে সম্ভব? একটার অস্তিত্ব যে অপরটার নাস্তিত্ব। নূতন থাকলে পুরাতন থাকে না, পুরাতন থাকলে নূতন থাকে না। তাদের মধ্যে সম্ভব যেটা, সেটা অন্বয়রক্ষা। তার বেশি রক্ষা

করতে গেলে নূতনের বাড় বাধা পায়। বিদেশের হাত থেকে মুক্তি মিলবে কবে? যে যুগ পৃথ্বীরাজেরও পূর্বের?

রেনেসাঁস মানুষকে ধর্ম নির্বিশেষে জাতি নির্বিশেষে, বর্ণ নির্বিশেষে ও শ্রেণি নির্বিশেষে যে মহত্ত্ব দিয়েছে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী তা দেয়নি। জাতীয়তাবাদও না, পুনরুজ্জীবনবাদও না, কমিউনিজমও না। আরও পুরাতন হিন্দু ধর্মও না, ইসলামও না। সেইজন্যে মানব-ইতিহাসে রেনেসাঁসের একটি মহৎ স্থান নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে ও থাকবে। তার আয়ুকাল যতই ক্ষীণ হোক-না কেন। রেনেসাঁসের দরুন মানুষের মহত্ত্ব যদি বেড়ে গিয়ে থাকে তবে সেমহত্ত্ব স্বীকার করেছেন যাঁরা তাঁদেরও মহত্ত্ব বেড়ে গেছে। ধর্মযাজকদের চেয়ে বৈজ্ঞানিকদের মহত্ত্ব বেশি, দার্শনিকদের মহত্ত্ব বেশি, কবি ও নাট্যকারদের মহত্ত্ব বেশি, ভাস্কর ও চিত্রকরদের মহত্ত্ব বেশি, এটা গত চার-পাঁচ শতাব্দীর লাভ। এই চার-পাঁচ শতাব্দীর বেশিরভাগ ভারতের বাইরে ছিল বলে ভারত তার থেকে কম লাভবান হয়নি। ভারত যদি নেপালের মতো পুরোপুরি তার বাইরে থাকত তা হলে সেই লাভ থেকে বঞ্চিত হত। কূপমন্ডূকের মতো স্বাধীন থেকে আফগানিস্তান যা পেয়েছে বাংলাও তাই পেত। তাতে তার অষ্টাদশ শতাব্দী প্রলম্বিত হত। ঊনবিংশ শতাব্দী বন্ধ্যা যেত।

একথা সত্য যে রেনেসাঁস জনগণের মধ্যে ছড়ায়নি। ধর্মই সেখানে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। ধর্মকে স্থানচ্যুত করে কমিউনিজম তার জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে বসতে চায়, যেমন বসেছে রাশিয়ায় ও চীনে। এটা নাকি ইতিহাসের লিখন। কিন্তু এখনও এই লিখন সব দেশের মানুষের কপালে লেখা হয়নি। লেখা হয়ে থাকলে পড়া যাচ্ছে না। ভারতের ভাগ্য অনিশ্চিত। ভারতের সাধারণ লোক ধর্মের কাছ থেকে যা পেয়েছে তাকে ভবিষ্যতের আশায় হাতছাড়া করতে চায় না। তেমনি শিক্ষিত মহল রেনেসাঁসের কাছ থেকে যেটুকু পেয়েছে সেইটুকুর মূল্য বোঝে। তার থেকে বঞ্চিত হলে তাদের চেহারা হত টোলের পন্ডিত ও মাদ্রাসার মৌলবির মতো। তা দেখে জনগণ পায়ে লুটিয়ে পড়ত। কিন্তু জনগণের তাতে মাথা উঁচু হত না। যেটুকু হয়েছে সেটাও রেনেসাঁসের হাওয়া লেগে রয়েছে। এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে। গত শতাব্দীর নবজাগরণ ও বর্তমান গণজাগরণ তাদের উঠে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। একটির অগ্রপথিক রামমোহন, অপরটির গান্ধী।

রামমোহন কেবল রেনেসাঁসের নন, রিফর্মেশনেরও অগ্রণী। যদি রেফরমেশন শব্দটা প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হয়। রেনেসাঁসও কি যুক্তিযুক্ত নাকি? রামমোহনের যেমন দ্বৈত ভূমিকা গান্ধীজিরও তেমনি। তিনি ভারতের মুক্তি চেয়েছিলেন যেমন ব্রিটিশ শক্তির হাত থেকে তেমনি আধুনিক সভ্যতার হাত থেকেও। এই দ্বিতীয় ভূমিকায় তাঁকে মনে হতে পারে পুনরুজ্জীবনবাদীর মতো। কিন্তু তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষার স্বাধীনতা অবিকল বৈজ্ঞানিকদের মতো। সেস্বাধীনতা তিনি গুরু পুরোহিত বা পন্ডিতদের পায়ে সঁপে দেননি। করুণার অনুরোধে গোবৎস বধের বিধান দিয়েছেন। সাম্যের অনুরোধে হরিজন পাত্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণ পাত্রীর বিবাহ দিয়েছেন। জন্মত দ্বিজ হয়েও উপবীত ধারণ করেননি। পেশা কী জানতে চাইলে বলেছেন চাষি ও তাঁতি। যে রামরাজ্যের স্বপ্ন তিনি দেখেছেন তা ত্রেতাযুগের রাজা রামের রাজ্য নয়, যিশু যাকে বলতেন ভগবানের রাজ্য। সেটাও একপ্রকার ইউটোপিয়া।

তবে এটাও ঠিক যে আধুনিক সভ্যতা বলতে ইউরোপে যা বোঝায় তা তিনি ইউরোপের পক্ষেও অহিতকর মনে করতেন। তাঁর মতে সেটা একটা রোগ। ইউরোপ থেকে সেটা ভারতেও সংক্রামিত হচ্ছে। তার আগে যে ইউরোপ ছিল তার সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল না। পুঁজিবাদ ও শিল্পায়ন মিলে তাকে বিপথগামী করে। বিপথগামিতাকেই সেসভ্যতা বলে ভুল করে। একই ভুল করবে ভারত, যদি একইভাবে বিপথগামী হয়! আবহমানকালের পাশ্চাত্য সভ্যতার কতটুকু অংশ এই আধুনিক সভ্যতা! শুধু এই অংশটুকুর সঙ্গেই তাঁর কলহ, সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে নয়। দেশ স্বাধীন হয়ে যদি এই বিপথ ধরে তা হলে দেশের সঙ্গেও তাঁর কলহ বাধবে। আধুনিকতার সংজ্ঞা তাঁর কাছে ছিল নেহাত সংকীর্ণ। আরও প্রশস্ত হলে তাঁর বিচার অন্যরূপ হত। সব দিক দেখার সুযোগ তিনি পাননি। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বা পরাধীন ভারত থেকে

সব দিক দেখা যায় না। তা ছাড়া সমকালীন ইউরোপীয়দের অনেকে আধুনিক সভ্যতার বিরূপ সমালোচক ছিলেন। নীতির দৃষ্টিতেই তাঁরা দেখতেন। গান্ধীজির দৃষ্টিও নীতির দৃষ্টি। টলস্টয়ের মতো, রাস্কিনের মতো।

'দেশকে স্বাধীন করতে সকলেই পারে। আমি চাই জনগণকে জাগাতে।' গান্ধীজি বলেছিলেন আগস্ট আন্দোলনের প্রাক্কালে। স্বাধীনতার সংগ্রাম তাঁর আগেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু জনগণের জাগরণ তাঁর অপেক্ষায় ছিল। কোনো পুনরুজ্জীবনবাদী নেতা এই কাজটি পারতেন না। জনগণকে বিভ্রান্ত করা সহজ, কিন্তু তাদের আস্থা অর্জন করা সহজ নয়। প্রাচীন ভারতে জনগণ বলতে বোঝাত শূদ্র বা ছোটোলোক। শূদ্র মানেই ক্ষুদ্র। কোনো অধিকারই তাদের ছিল না। প্রাচীন ভারতকে ফিরিয়ে আনা বা সেখানে ফিরে যাওয়া তাদের দিক থেকে প্রতিক্রিয়া। কেনই-বা তারা তেমন এক আদর্শের জন্যে লড়বে। পুনরায় শৃঙ্খলিত হতে কে চায়!

আমাদের রেনেসাঁস, রিফর্মেশন ও এনলাইটেনমেন্ট ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ঘটেছিল। বাকি ছিল ফরাসি বিপ্লব। তারই সঙ্গে তুলনীয় এই গণজারণ। এটা একদিনে ঘটেনি। এর জন্যে মানসিক প্রস্তুতি চলেছিল শতখানেক বছর ধরে। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা তিনটি বনিয়াদি আদর্শ ছিল এর পশ্চাতে। মৈত্রীরই অন্য নাম অহিংসা। আমাদের রেনেসাঁস যেমন ইউরোপীয় রেনেসাঁসের হুবহু নকল নয় তেমনি আমাদের ফরাসি বিপ্লবও ইউরোপের ফরাসি বিপ্লবের নির্বিচার অনুকরণ নয়। দেশ অনুসারে কাল অনুসারে পাত্র অনুসারে ভিন্ন। একই স্পিরিট কাজ করছিল এদেশেও, সেইজন্যে এদেশেও রাজতন্ত্র তথা সামন্ততন্ত্রের পতন হল। তবে পুরোহিততন্ত্রের পতন হয়নি, তার বদলে হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রবর্তন আমাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম। ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে গান্ধীজিকেই বলতে শোনা যায় আমাদের রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার। ইতিমধ্যেই তিনি নিরীশ্বরবাদীদের কোল দিতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে সত্যই ভগবান। নিরীশ্বরবাদীও সত্যের সাক্ষাৎকার পেতে পারেন। এক শিষ্যকে এই মর্মে লিখেছিলেন, 'কে জানে তোমার নিরীশ্বরবাদ হয়তো আমার ঈশ্বরবাদের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। হয়তো উৎকৃষ্ট।' সেই ব্রাহ্মণ শিষ্যের কন্যার বিবাহ হরিজন পাত্রের সঙ্গে নিরীশ্বরবাদী পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে তাঁরই আশ্রমে ও তাঁরই উপস্থিতিতে, এই অনুরোধে সম্মত হবার পরেই তিনি নিহত হন। হত্যাকারীরা বর্ণাশ্রমবাদী হিন্দু।

ফরাসি বিপ্লব রুশ বিপ্লব নয়। ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ তার অন্বিষ্ট নয়। সুতরাং ভারতের গণজাগরণ ততদূর যায়নি বলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। গান্ধীজিকেও দোষী করা যায় না। মার্কসবাদ ভারতে এসে পৌঁছোয় প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। মার্কসবাদী চিন্তার প্রসার হয় আরও দুই দশক বাদে। মার্কসবাদীরা যখন কোনো বিপ্লবের উদ্যোগ করেন তার আগেই দেশ হয়েছে স্বাধীন। জনগণ নতুন কোনো অগ্নিপরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত নয়। গান্ধীজি তাঁদের বার বার তিন বার অগ্নিপরীক্ষায় ফেলে তাদের শক্তির সঞ্চয় নি:শেষিত করেছিলেন। বাকি যেটুকু ছিল সেটুকু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায় লক্ষ্যভ্রষ্ট। লক্ষ্যে ফিরিয়ে না এনে নতুন কোনো পরীক্ষায় নিযুক্ত করা ছিল গান্ধীজিরও অসাধ্য। তাই তিনি অসহায়ভাবে দেশভাগ মেনে নেন। মার্কসবাদীরাও যে ব্যর্থ হবেন এটা বিচিত্র নয়। বিচিত্র এই যে তাঁরা রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে একনিশ্বাসে ধনতন্ত্রের পতনও প্রত্যাশা করেছিলেন। যেখানে সাম্প্রদায়িকতার আগুন গান্ধীজিকেই দগ্ধ করেছে সেখানে মার্কসকেও কি করত না?

মার্কসবাদের উদ্ভবও পশ্চিম ইউরোপে। সেযখন পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়ায় তখন সেটা অসঙ্গত মনে হয় না। অসঙ্গতির কথা ওঠে রেনেসাঁসের বেলা। আসলে বৌদ্ধ ধর্মের মতো, খ্রিস্টধর্মের মতো, ইসলামের মতো আধুনিক যুগের বড়ো বড়ো মুভমেন্টগুলিও সর্বত্রসঞ্চারী। আজকের দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশ কে দেশ ন্যাশনালিজম, ডেমোক্রেসি আর সোশ্যাল জাস্টিস এই তিনটি সত্ত্ব স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক মেনে নিচ্ছে। তিনটির উৎপত্তি পশ্চিম ইউরোপে। যে পশ্চিম ইউরোপ আরও আগে রেনেসাঁস, রিফর্মেশন ও এনলাইটমেন্টের ভিতর দিয়ে গেছে। এইসব পর্যায় মানুষের মনের দুয়ার একটু একটু করে খুলে দিয়েছে। দুয়ার খোলা পেয়ে ওইসব আইডিয়া বা আইডিয়াল ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করেছে।

তবে সব দেশের বিবর্তন একইরকম নয়। আফ্রিকার দেশগুলিতে রেনেসাঁসের পূর্বেই ন্যাশনালিজম গিয়ে হাজির হয়েছে। তেমনি আরব দেশগুলির কয়েকটিতে ডেমোক্রেসির পূর্বেই সোশ্যাল জাস্টিস।

জব চার্নক কলকাতা বন্দর প্রতিষ্ঠা করার পর পিটার দ্য গ্রেট করেন পিটার্সবুর্গ বন্দর প্রতিষ্ঠা। সমুদ্রপথে পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে রাশিয়াকে যুক্ত করে দেন। জার্মানির এক রাজকুমারী পরে হন রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী। ক্যাথরিন দ্য গ্রেট অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মানির মতো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। গড়ে ওঠে একটি বিদ্বৎসমাজ। এর পূর্বে রাশিয়াকে কেউ ইউরোপের অঙ্গ মনে করত না। রাশিয়ানরাও না। এরপরেও উভয়পক্ষেরই দ্বিধা যায় না। ইউরোপ সম্বন্ধে বঙ্কিমের যে মনোভাব টলস্টয় ও ডস্টয়েভস্কিরও সেই মনোভাব। অপরপক্ষে মাইকেলের যে মনোভাব টুর্গেনিভেরও সেই মনোভাব। লেনিন ছিলেন ইউরোপমনস্ক, স্টালিন ছিলেন রুশমনস্ক। রাশিয়া এখনও এ দোটানা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বোধ হয় চায়ও না।

রাশিয়ার বরাত ভালো যে সে-দেশে পিটার দ্য গ্রেট ও ক্যাথরিন দ্য গ্রেট গোড়াপত্তন করেছিলেন। চীনে তো এই শতাব্দীর প্রথম দশকেও দরজা জুড়ে বসেছিলেন মাঞ্চুসম্রাজ্ঞী। সাংহাই প্রভৃতি কয়েকটি জানালা দিয়ে ঢুকেছিল বাইরের আলো-হাওয়া। তার ফলে যেটা হয়েছিল সেটা হয়তো একপ্রকার রেনেসাঁস, কিন্তু যেমন বিলম্বিত তেমনি দুর্বল। এরকম দেশ মার্কসবাদী হতে পারে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে যেতে পারে, কিন্তু ‘একশোটি ফুল’ ফোটাতে চাইলে কী হবে, একটিও ফুল ফোটাতে পারে না। রাশিয়ায় ও-কাজটি বিপ্লবের পূর্বে এগিয়ে রয়েছিল, পরে এগিয়েছে, কিন্তু সাহিত্যে নয়, বিজ্ঞানে। রাশিয়ার লোক সাবেক আমলের ব্যালেকে চক্ষের মণির মতো রক্ষা করেছে, যদিও তা অভিজাতকুলের।

রেনেসাঁস যেখানে ঘটে সেখানে ধর্মযাজক বা মান্দারিন বা ব্রাহ্মণ বা উলেমার চেয়ে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক বা নাট্যকার বা ভাস্করের মহত্ত্ব বৃদ্ধি পায়। রেনেসাঁসের পূর্বে কেউ ভাবতেই পারত না লিওনার্দো বা শেক্সপিয়ার বা গ্যালিলিয়ো বা বেকনের কী মহত্ত্ব। মানুষকে এঁরা কত বড়ো উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। সেসব এভারেস্ট বা কাঞ্চনজঙ্ঘায় আরোহণের জন্যে শত শত মানুষ জীবন পণ করেন। কেড-বা পৌঁছোন, কেউ-বা পথে মারা যান। পৃথিবীকে দেশ অনুসারে ভাগ না করে যুগ অনুসারে ভাগ করলে তিনটি যুগে ভাগ করা যায়। প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ। আধুনিক যুগ কোথাও আগে এসেছে, কোথাও পরে, কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে এটা একটাই যুগ। এ যুগে যেখানেই যিনি কাজ করে থাকুন-না কেন সকলের জন্যেই করেছেন, সকলের হয়ে করেছেন। সেইজন্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালিরা এত সহজে শেক্সপিয়ারকেও রোমান্টিক কবিদের আপনার করে নেন। দেশ কিংবা ভাষা সেখানে অন্তরায় হয় না। পরাধীনতা কিংবা পুঁজিবাদী শোষণ সেখানে রসভঙ্গ করে না। লোকে যেমন কবিরাজ ছেড়ে ডাক্তার ডাকে তেমনি *মঙ্গলকাব্য* ছেড়ে *স্কট ডিকেন্স* পড়ে। এই যে রুচিবদল এর থেকে আসে পালাবদল। সাহিত্যে নবযুগ। পুরাতনের সঙ্গে যার ভাষার মিল, কিন্তু ভাবের মিল পরদেশির সঙ্গে। পরদেশি হলেও সেস্বকালের। কালগত ব্যবধান না থাকায় শেলি, কিটস, বায়রন নিকটতর; রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র দূরতর।

কিন্তু নিজের দেশেও যখন বায়রন ও স্কট জন্মালেন তখন বিদেশের বায়রন ও স্কট হলেন দূরতর। দেশগত ব্যবধান না থাকায় মাইকেল ও বঙ্কিম হলেন নিকটতর। স্বদেশীয়রা পৃষ্ঠপোষকতা না করলে স্বদেশি কারুশিল্প দাঁড়াতে পারবে না এটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য স্বদেশীয়রা পৃষ্ঠপোষকতা না করলে স্বদেশি চারুকলাও দাঁড়াতে পারবে না। চারুকলার মধ্যে পড়ে কাব্য উপন্যাস নাটক। এই স্বদেশি মনোভাব থেকে আসে শেক্সপিয়ার ছেড়ে কালিদাসের দিকে দৃষ্টিপাত। বায়রন ছেড়ে মহাভারতের দিকে দৃষ্টিপাত। হারিয়ে যাওয়া খেই ফিরে পেতে আকাঙ্ক্ষা জাগে। অজন্তার খেই ফিরে পেয়ে চিত্রকরদের হাত খুলে যায়। পুরাণের খেই ফিরে পেয়ে নাট্যকারদের। এরই নাম রিভাইভাল। কিন্তু উপন্যাসের বা ছোটোগল্পের বা প্রবন্ধের কোনো প্রাচীন আদর্শ পাওয়া গেল না, অগত্যা আধুনিক ইউরোপের দিকেই দৃষ্টিপাত করতে হল। বিষয়টা রইল স্বদেশি, কিন্তু আঙ্গিকটা হল আধুনিক, আধুনিকতর, অত্যাধুনিক। বিদেশের সঙ্গে তাল রেখে। প্লট চুরি করে বা ধার করে বিদেশিকেও স্বদেশি বলে চালিয়ে দেওয়া গেল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে আসে গান্ধী উদবোধিত গণজাগরণ। গত শতাব্দীর নবজাগরণের মতো এই শতাব্দীর গণজাগরণও জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। গণসত্যাগ্রহও একপ্রকার বিপ্লব। এতে নীচের মানুষকে উপরে তুলে দেওয়া হয়, উপরের মানুষকে নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়। রেনেসাঁসের সময় যেমন বৈজ্ঞানিক দার্শনিক প্রভৃতির মহত্ত্ব বেড়ে যায়, রেভোলিউশনের সময় তেমনি সাধারণ লোকের, বিশেষ করে চাষি মজুরের। গণসত্যাগ্রহের দিন এরাই গণ। বিপ্লবের দিন এরাই বরযাত্রী।

সাহিত্যের আসরে কিন্তু এদের হাজির করা শক্ত। ক-জন সাহিত্যিক আছেন যাঁরা এঁদের সঙ্গে জুটে মাঠেময়দানে রাজদ্বারে শ্মশানে গেছেন। আন্দোলনের ভিতর থেকে এঁদের দেখেছেন? পারতেন যাঁরা তাঁরাও রাজদ্রোহের ভয়ে পারেননি। তার চেয়েও ভয় নেতারা কী মনে করবেন। বাস্তবানুগ ছবি আঁকলে নেতাদের তো দেবতার মতো করে দেখানো যাবে না। দোষে-গুণে মানুষের মতো করে আঁকতে হবে। দোষগুলো সাহিত্যে অমর হলে কোন নেতা সেটা ক্ষমা করবেন? কাজগুলোও সবসময় বীরোচিত নয়। অথচ তাকে যদি মানুষের মতো করে আঁকা হয় তো আপত্তি উঠবে, আঁকতে হবে তাকে শয়তানের মতো করে।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের তথা গণজাগরণের বাস্তবানুগ কাহিনি অল্পই লেখা হয়েছে। একদিন হয়তো তা নিয়ে একটা মহাভারত লেখা হবে। যিনি লিখবেন তাঁকে দল ও মতের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী তাঁদের পক্ষে এটা শক্ত। আর যাঁরা পাঁচজনের মুখে শুনেছেন তাঁদের বিবরণ হয়তো ঘটনার দিক থেকে শুষ্ক শীতল নিষ্প্রাণ।

ত্রিশের দশকের আগেই বস্তিবাসীকে সাহিত্যে আনা হয়েছিল, এর পরে আনা হল চাষাভুসা জেলে মাঝিদের। এরা হয়তো সংগ্রামরত নয়। পরে যাদের আনা হল তারা সংগ্রামী জনতা। কিন্তু তাদের সংগ্রাম দেশের জন্যে নয়, শ্রেণির জন্যে। এটা জাতীয়তাবাদী লেখকদের পক্ষে অসম্ভব। সাম্যবাদী বা প্রগতিবাদী লেখকদের পক্ষেই সম্ভব। দেশ স্বাধীন হবার পূর্বেই শ্রেণিসংগ্রাম সাহিত্যের আসরে জায়গা করে নেয়। স্বাধীনতার পরে জাতীয়তাবাদকে কোণঠাসা করে, যদি-না সেটা হয় সন্ত্রাসবাদ।

কিন্তু গণজাগরণ থেকে যে জিনিসটি আশা করে গেছিল সেই জিনিসটি হল না। শিক্ষিত স্তরের সঙ্গে অশিক্ষিত স্তরের ব্যবধান লোপ। বামপন্থী কবির রচনাও শিক্ষিত ভিন্ন আর কেউ পড়ে না। আর কেউ বোঝে না। কেমন করে বলব ইনি জনগণের সভাকবি!

নবজাগরণের যুগেও যে প্রশ্ন উঠেছিল সেই একই প্রশ্ন গণজাগরণের যুগেও অন্যভাবে উঠেছে। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের নায়করা ছিলেন ল্যাটিন ভাষায় শিক্ষিত, ল্যাটিন রচনায় নিপুণ। তা সত্ত্বেও তাঁরা ইচ্ছে করেই লিখলেন ইটালিয়ান ফরাসি ইংরেজি প্রভৃতি লোকভাষায়। যাতে দেশের লোকের সঙ্গে মানসিক ব্যবধান না থাকে। এদেশেও তেমনি রামমোহন ও বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষিত, বিদ্যাসাগর তো সংস্কৃত রচনায় নিপুণ। তবু ইচ্ছা করেই তাঁরা লিখতেন বাংলা ভাষায়। যাতে দেশের লোকের সঙ্গে মানসিক ব্যবধান দূর হয়। ইউরোপে যেমন ল্যাটিন, তেমনি সংস্কৃত। ইউরোপে যেমন ইটালিয়ান ফরাসি ইংরেজি তেমনি ভারতে বাংলা হিন্দি মারাঠি। তা ছাড়া পারসিক শিক্ষিতমহলও ছিলেন পারসিক রচনায় সিদ্ধহস্ত। রামমোহনও তাঁদের একজন। কিন্তু নবজাগরণের সময় স্থির হয়ে যায় যে লোকভাষায় লিখতে হবে। পরবর্তীকালের ইংরেজি শিক্ষিতরাও ইংরেজি রচনায় নৈপুণ্য সত্ত্বেও বাংলায় লেখার সিদ্ধান্ত নেন। যেমন মাইকেল ও বঙ্কিম। যাতে দেশের লোকের সঙ্গে মানসিক ব্যবধান না থাকে।

রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরি প্রমুখ বাংলা ভাষার লেখকরা ক্রমে উপলব্ধি করেন যে এও যথেষ্ট নয়। সাধু ছেড়ে চলতি বাংলায় লিখতে হবে। এরূপ উপলব্ধি চীনের লেখকদেরও হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরি মহাশয়ের প্রচেষ্টা এতদিনে সফল হয়েছে। চলতি বাংলার প্রচলন বেশি। যদিও এ রীতি পূর্ব বাংলার নয় তবু পূর্ব বাংলার সাহিত্যিকরাও একে উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এতদূর আসার পরও দেখা যাচ্ছে এ ভাষা শিক্ষিত মহলেরই ভাষা। ইংরেজি শিক্ষিত না হয়ে বাংলা শিক্ষিত হলেও তাঁরা শিক্ষিত। তাঁরা

সংস্কৃতিমান। কালচারের মধ্যে দিয়ে একটা কর্ষণের ভাব আছে। তাঁরা কর্ষণ করেছেন। লাঙল দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে, বিদ্যা দিয়ে। তাঁদের ভাষা ঠিক জনগণের ভাষা নয়, যদিও লেখেন কথ্যরীতিতে।

এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরি মহাশয় একবার আমাকে বলেছিলেন এই মর্মে, 'যে ভাষায় আমি লিখি সেটা কথ্যভাষা, কিন্তু সাধারণ লোকের মুখের ভাষা নয়। তাদের কাছে এখনও পৌঁছোতে পারিনি।' এর জন্যে তাঁর মনে আফশোস ছিল।

সেআফশোস তাঁর একার নয়। বিদগ্ধ নাগরিকদের মার্জিত ভাষা যেন ভিটামিনবর্জিত ছাঁটা সিদ্ধ চালের ফ্যানগালা ভাত। তাতে না থাকে স্বাদ, না হয় পুষ্টি। তা ছাড়া তাঁর মননও তাঁকে দূরের মানুষ করে। কথ্যরীতির দরুন ব্যবধান কমতে পারে কিন্তু উচ্চচিন্তার দরুন দূরত্ব থেকে যায়।

গণজাগরণের পূর্বেই বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরির কথ্যরীতিতে লেখা আরম্ভ হয়ে যায়। গণজাগরণের পরে এটা আরও ব্যাপক হয়। কিন্তু প্রশ্নটা ব্যাপ্তির প্রশ্ন নয়। ব্যবধানলোপের প্রশ্ন। আমাদের বামপন্থী লেখকরা গণজাগরণের পরে এসেছেন। এঁদেরই তো লোকমুখের ভাষার সঙ্গে লেখনীরূপ ভাষার কোনোরূপ ব্যবধান না রাখা। কিন্তু লেখেন যাঁরা তাঁরা ভদ্রলোক। পড়েন যাঁরা তাঁরাও ভদ্রলোক, ভদ্রলোকদের পালিশ করা ভাষাতেই লেখা হয়। আঙ্গিক তো আরও সোফিস্টিকেটেড। এর জন্যে যে নাগরিকত্বের দরকার সেজিনিস জনগণের নাগালের বাইরে। যে নাগরিকত্বের দরকার সেটাও বহুপুরুষার্জিত। মতবাদ হয়তো অভিন্ন, কিন্তু মনের গড়ন যে ভিন্ন। একইরকম ইউনিফর্ম পরিয়েও একজন ভদ্রলোককে একজন শ্রমিকের সঙ্গে একাকার করতে পারা যাবে না। শ্রমিককে ভদ্রলোক করলেও করতে পারা যায়, কিন্তু ভদ্রলোককে শ্রমিক করা কারও সাধ্য নয়। যদি-না তাঁকে জেলে পাঠিয়ে ঘানি ঘোরাতে বাধ্য করা হয়। কিংবা সমস্ত দেশটাকে একটা কারাগারে পরিণত করা হয়। তার মানে প্রোলেতারিয়েতের ডিকটেটরশিপ।

আমাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কী না ঘটেছে! এটাই-বা না-ঘটবে কেন? গণতন্ত্রকে অন্তহীন সুযোগ কেউ দেবে না। যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তার সদব্যবহার না করলে রাজতন্ত্রের মতো গণতন্ত্রও একদিন যাবে। তখন ডিকটেটরশিপ ব্যতীত আর কী বিকল্প। ডিকটেটরশিপ মাত্রেই প্রোলেতারিন নয়। দৃষ্টান্ত স্পেন। দৃষ্টান্ত গ্রিস। তা ছাড়া দেশটা বৃহৎ ও বহুভাষী। সুতরাং আবার ভাগ হয়ে যেতে পারে। তারপরে কোথাও গণতন্ত্র, কোথাও একনায়কত্ব, কোথাও শ্রমিকের রাজত্ব, কোথাও সৈনিকের রাজত্ব। আমরা চেষ্টা করছি সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলতে। ধর্ম নির্বিশেষে। ভাষা নির্বিশেষে। শ্রেণি নির্বিশেষে। মতবাদ নির্বিশেষে। এটা শুধু গণতন্ত্রেই সম্ভব। গণতন্ত্র যদি সকলের শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা পায়।

গণজাগরণের পর থেকে জনগণের গুরুত্ব বেড়ে গেছে, অথচ নবজাগরণ যাদের গুরুত্ব দিয়েছিল সেই ভদ্রলোকশ্রেণির গুরুত্ব কমেনি। কেনই-বা কমবে? ভদ্রলোকরা কি সংস্কৃতির দায়িত্ব পালন করেননি? সাহিত্যকে বিজ্ঞানকে সংগীতকে নাট্যকে ললিতকলাকে এগিয়ে দেননি? এই দেড়শো বছরের ইতিহাস কি অগ্রগতির ইতিহাস নয়? অগ্রগতি সবসময় সরলরেখায় হয় না, নদীর মতো আঁকাবাঁকা গতিও অগ্রগতি, স্পাইরালের মতো উঁচু-নীচু গতিও অগ্রগতি। যেখানে রিভাইভালবাদ পেছনে টানছে সেখানে রেনেসাঁসবাদ সামনে টেনে নিয়ে যেতে বাধা পায়। তা সত্ত্বেও যদি আমাদের সংস্কৃতি চার-পাঁচ শতাব্দীর পথ দেড় শতাব্দীতেই অতিক্রম করে থাকে তবে আমি তো বলব অসাধ্যসাধন করেছে। এদেশ শুধু যে পরাধীন ছিল তা-ই নয়। ছিল জগতের কালপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন মরা গাং। এখানে যে আবার প্রবাহ ফিরে এসেছে, জোয়ার-ভাটা খেলছে, জাহাজ চলাচল করছে, এর জন্যে আমাদের ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মুক্তমনা সাহিত্যিকদের ধন্যবাদ দিতে হয়।

তাঁদের প্রেরণা আসত প্রধানত দুটি উৎস থেকে। একটি তো প্রাচীন ভারত, অপরটি আধুনিক ভারত। ক্রমে ক্রমে দুটি উৎসই শুকিয়ে আসে। সংস্কৃত কাব্য ও নাটক থেকে নতুন কিছু পাওয়া যায় না। রামায়ণ মহাভারত থেকে পাওয়া যায়, কিন্তু নতূন রূপ দিতে সাধ্যে কুলায় না। রবীন্দ্রনাথ একবার আমাকে বলেছিলেন অর্জুনের চোখের উপর কৃষ্ণের পরিবারের নারীদের হরণ করে নিয়ে যায় দস্যুরা, কেউ কেউ

স্বেচ্ছায় হৃত হয়, যেন আগে থেকে ঠিক করা ছিল যে তাদের প্রেমিকরা তাদের হরণ করে নিয়ে যাবে দস্যু সেজে। কেমন চমৎকার একটি বিষয় যা নিয়ে নাটক লেখা যায়। কিন্তু লিখবে কে? কবির বয়স গেছে, সাহস হয় না। লিখব আমরাই। কিন্তু আমরাও লিখিনে। কারণ লিখলে সেটা হবে ধর্মদ্রোহ। ভাগ্যিস *মহাভারত* লেখা হয়ে গেছল কৃষ্ণের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে। *রামায়ণ*ও রামের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে। এসব গ্রন্থ থেকে বিষয় নিয়ে তাকে নতুন রূপ দিলে ভক্তরা প্রকাশ বন্ধ করে দেবেন।

তার চেয়ে সোজা ইউরোপ থেকে ভাব সংগ্রহ করা ও তাকে নূতন রূপ দেওয়া। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ ও রুশ বিপ্লবের পর পশ্চিম ইউরোপের মহিমা ক্রমেই অস্তাচলমুখী হয় ও আমাদের লেখকদের দৃষ্টি পড়ে রাশিয়ার উদয়াচলের উপর। পরে সেদিক থেকেও প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। বিনা বিচারে বা নামমাত্র বিচারে বা স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে শত শত ব্যক্তির প্রাণদন্ড মধ্যযুগের খ্রিস্টীয় ইনকুইজিশনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পোপ যদি অভ্রান্ত না হয়ে থাকেন স্টালিনও কি অভ্রান্ত? সেই যে খটকা বাঁধে সেটা পরে আরও দৃঢ় হয়। পশ্চিম ইউরোপের মতো রাশিয়ার মহিমাও হ্রাস পায়। বাইরের দিকে তাকানো ছেড়ে আমরা ঘরের দিকে তাকাই, কিন্তু পুরাণের দিকে নয়। লোকসংস্কৃতির বহমান ধারার দিকে। এর থেকে রস আহরণ করি। কিন্তু আলো পাইনে। রূপও কি পাই? লোকসংগীত যেমন মার্গসংগীতের অভাব পূরণ করতে পারে না লোকসাহিত্যও তেমনি মার্গসাহিত্যের।

তবে প্রাণশক্তির অভাব হলে জনগণের জীবন সেঅভাব পূরণ করতে পারে। যদি তারা থাকে মাটির কাছাকাছি। কিন্তু তারা যদি শহরে চলে আসে ও মাটির সঙ্গে সম্পর্ক না রাখে তবে তাদেরও প্রাণশক্তিতে টান পড়বে। সব ক-টি উৎস শুকিয়ে এলে সাহিত্য রচনাও অবক্ষয়ী হবে। মাটির সঙ্গে সংযোগ থেকেই প্রাণশক্তি। বিয়োগ থেকেই অবক্ষয়।

সাহিত্যকে ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এর দায়িত্ব যদি ভদ্রলোকদের হাত থেকে আর কোনো শ্রেণির হাতে যায় আমি একটুও দুঃখিত হব না। এই সম্প্রতি কারো কারো ভাগ্যে ধনসম্পদ জুটছে, নয়তো সরস্বতীর সেবকরা লক্ষ্মীর কৃপা থেকে চিরদিন বঞ্চিত। যে গাধাখাটুনি তাঁদের খাটতে হয় তার অনুপাতে পারিশ্রমিক তাঁদের অকিঞ্চিৎকর। শ্রমিক হলে তাঁরা পর্যাপ্ত মজুরির দাবিতে ধর্মঘট করতেন, ওভারটাইমের জন্য বাড়তি মজুরি চাইতেন, নিয়মিত ছুটি চাইতেন। শ্রমিকদের অবস্থার যখন আরও উন্নতি হবে তখন দেখা যাবে শ্রমিক হওয়াই অধিকতর লাভজনক। দুটি-একটি বিভাগ বাদ দিলে সাহিত্যকর্মী অর্থকরী নয়। আর সেই দুটি-একটি বিভাগে এত বেশি কর্মী যে অধিকাংশের বরাতেই লাভের ঘরে শূন্য। জীবিকার জন্যে অন্য কিছু করতে হয় বলেই সাহিত্যকর্মে শ্রমদান পোষায়। কিন্তু এমনও হয় যে সেই অন্য কিছুর পেছনে সমস্ত শক্তি যায়, সাহিত্যকর্মের জন্যে উদবৃত্ত যেটুকু থাকে সেটুকু অতি সামান্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ এর একটা সামাধান করেছিল। লেখকদের অনেকের ছিল বাপ-খুড়োর পিসি-মাসির রেখে যাওয়া টাকা বা সম্পত্তি। এদেশে তার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ। বিংশ শতাব্দীতে করবৃদ্ধির ফলে লেখকদের সেই প্রাইভেট আয়ের স্বর্গসুখ গেছে। তবে পাঁচ রকমের উপার্জনের পন্থা খোলা আছে। এদেশে সেটারও অভাব।

মোট কথা সাহিত্যের কাজ হচ্ছে প্রেমের শ্রম। যে প্রেমিক সে-ই শ্রমিক। পারিশ্রমিক কেউ পায় কেউ পায় না। যে পায় সেপাওনার চেয়ে কম পায়। এইভাবেই এতদিন কাজের লোক পাওয়া গেছে। এরপরে যদি না পাওয়া যায় তবে সাহিত্যের অনেকগুলি বিভাগ অপুষ্ট থাকবে। উপন্যাসের অতিস্ফীতিই সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নয়। যাঁর উপন্যাস লেখার কথা নয়, তিনিও বছরে চারখানা উপন্যাস লিখছেন। কবিতার হাত হারাচ্ছেন, প্রবন্ধের জন্যে সময় করে উঠতে পারছেন না। সেকালে অভিজাত শ্রেণির পক্ষে কতকগুলি অবশ্যকরণীয় কৃত্য ছিল, যার বিনিময়ে তাঁরা পেতেন সম্মান। তাঁদের সেই কৃত্যকে বলা হত নোবলেস অবলিজ। তেমনি ভদ্রলোক শ্রেণির পক্ষে অবশ্যকরণীয় একটি কৃত্য হচ্ছে সংস্কৃতির জন্যে শ্রম। এটাও একরকম নোবলেস অবলিজ।

একদা অভিজাত শ্রেণির যে সাংস্কৃতিক দায় ছিল সেদায় এখন ভদ্রলোক শ্রেণির উপর বর্তেছে। এই শ্রেণি যদি সংস্কৃতিকে কেনা-বেচার একটা ব্যাপার করে তোলে ও তাই নিয়ে ব্যাবসাদারি করে তবে তার শেষ ফল হবে লোভে পাপ ও পাপে মৃত্যু। কতক সাহিত্যিককে মনে মনে বেছে নিতে হবে এমন এক পথ যেটা বিত্তময়ী সৃঙ্কা নয়। অথবা নয় সাহিত্যকে দিয়ে সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির পন্থা। সাহিত্যিকদের সত্যিকার কমিটমেন্ট সত্যের কাছে, সৌন্দর্যের কাছে, প্রেমের কাছে। প্রথমটা বৈজ্ঞানিকের মতো, দ্বিতীয়টা শিল্পীর মতো, তৃতীয়টা ধার্মিকের মতো। এর কোনোটিই রাজনীতিকের মতো বা সৈনিকের মতো নয়। তবে কোনো সাহিত্যিক যদি অন্তরে তেমন কোনো বিপদ অনুভব করেন সেস্বাধীনতা তার আছে। তখন সেটাই তাঁর কর্তব্য। এর জন্যে তাঁর হয়তো বহু দুর্ভোগ পোহাতে হবে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে ঝাঁপ দিতে গেছিলেন কয়েক জন ইংরেজ লেখক। আরও এক শতক আগে গ্রিসের যুদ্ধে বায়রন। এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানেরও নজির আছে।

সংস্কৃতিকে এগিয়ে দেওয়া এক কথা। সমাজকে পালটে দেওয়া আরেক। এই দ্বিতীয় কৃত্যটি স্বেচ্ছায় ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন রুশো, ভলতেয়ার ও দিদেরো। তা বলে সেটি লেখক মাত্রেরই ঘাড়ে তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাপিয়ে দেওয়া যায় না। সমাজকে পালটানোর ভার নিলে সাহিত্যসৃষ্টির উপর লক্ষ রাখা শক্ত। লক্ষ্যভ্রষ্ট রচনা সামাজিক পরিবর্তন ঘটালেও সাহিত্যে উচ্চ স্থান পায় না। সাহিত্যিককে সেইজন্যে ফরমাশ করতে নেই, করলে সেটা হবে লক্ষ্যভ্রষ্টতার নির্দেশ। যাঁরা ভিতর থেকে অনুশাসন পান তাঁরা তাকে প্রতিরোধ করতে পারেন না। সেটাও একপ্রকার নোবলেস অবলিজ। মানুষের আরও পাঁচটা দিক আছে। একজন সাহিত্যসৃষ্টি করেন বলে সমাজসংস্কারও করেন না তা নয়। একই লেখনী দুই কাজে নিযুক্ত হয়। যাঁর কাজ সমাজসংস্কার তিনিও করেন সাহিত্যসৃষ্টি। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকের ছিল একাধিক সত্তা। বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল, কিন্তু তিনি সমাজসংস্কার না সমাজসংস্করণ কোনটার সহায়তা করেছিলেন বলা কঠিন। শরৎচন্দ্র তাঁর বিধবা নায়িকাদের বিয়ে দেননি। একথা তিনি নিজেই লিখেছিলেন আমাদের এক বিখ্যাত মহিলা কবিকে।

রেনেসাঁসের মূল্যগুলি ইউরোপের যেসব দেশে অনেক দুঃখে অর্জিত হয়েছে সেসব দেশ সামাজিক ন্যায়ের অনুরোধেও পাঁচ শতাব্দীর পথ পিছু হটতে রাজি নন। যখন ছিল কর্তার ইচ্ছায় কর্ম তা তিনি যিনিই হোন—রাজা অথবা পোপ। একালে তার প্রতিরূপ রাষ্ট্রের অধিনায়ক ও পার্টির পরিচালক। আমাদের এখনও দেড় শতাব্দী যায়নি। অর্জনের জন্যে তেমন কিছু দুঃখও পোহাতে হয়নি। চিন্তার স্বাধীনতা, বচনের স্বাধীনতা, ছাপার হরফের স্বাধীনতা, প্রকাশের স্বাধীনতা, সভাসমিতির স্বাধীনতা, আন্দোলনের স্বাধীনতা যখনই বাধা পেয়েছে তখনই বিলেতের লিবারল বন্ধুরা তার জন্যে লজ্জিত হয়ে সেখানকার কর্তাদের কাছে আপিল করেছেন ও তাঁরা হস্তক্ষেপ করেছেন। দেশের স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া যেমন দুঃসাধ্য হয়নি, তেমনি ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করাও সহজ হয়নি। সরকারেরও জবাবদিহির দায় ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও জনমতের কাছে। ব্রিটিশ শাসন বাদশাহি শাসন ছিল না। ব্যক্তিস্বাধীনতা অনায়াসলভ্য ছিল বলেই সরকারি চাকুরিতে থাকার সময় বিদ্যাসাগর, মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল অমন অবাধে অজস্র লিখতে পেরেছিলেন। কিন্তু সরকারি চাকুরি করলেও এঁরা কেউ কর্তার ইচ্ছায় লেখনী ব্যবহার করেননি। প্রশস্তি রচনা করেননি। সভাকবি বা দরবারি সাহিত্যিক হননি। ব্রিটিশভারত দেশীয় রাজ্য ছিল না। তার পাশেই ছিল অপর এক ঐতিহ্য। কিন্তু আমাদের রেনেসাঁস সেঐতিহ্য অনুসরণ করেনি। তাই আমাদের লেখকরা ছিলেন স্বাধীন লেখক। স্বাধীন দেশের লেখক না হয়েও স্বাধীন লেখক হওয়া যেত। এটা ছিল ব্রিটিশ রুদ্রের দক্ষিণ মুখ।

দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে। এখন তো সবাই আমরা স্বাধীন লেখক। ব্যক্তিস্বাধীনতা আমাদের সংবিধানসম্মত অধিকার। একে প্রাণপণ রক্ষা করতে হবে। রক্ষা করার শ্রেষ্ঠ উপায় সদব্যবহার করা। যারা স্বাধীনতার সদব্যবহার করে না তারা তার যোগ্য নয়। সেটা আপনি হারিয়ে যায় বা অপহৃত হয়। লেখকের স্বাধীন লেখনীই তার সেরা সম্পদ। স্বাধীনতার বিনিময়ে আর কোনো সম্পদ কখনো সেরা সম্পদ হতে পারে

না। আজকের দিনে যে প্রলোভন আমাদের সামনে ঝুলছে তেমন কোনো প্রলোভন আগেকার দিনে ছিল না। প্রলোভন মানুষকে পরীক্ষা করে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই মনুষ্যত্ব। নির্যাতনের পরীক্ষাও অন্তর্হিত হয়েছে তা নয়। ক্ষুরধার পন্থা। একধারে হেললে প্রলোভন, আরেক ধারে হেললে নির্যাতন। অপ্রমত্ত হতে হবে।

যে-দেশ যে সরকারের যোগ্য সে-দেশ সেই সরকার পায়। তেমনি যে জাতি যে সভ্যতার বা যে সংস্কৃতির যোগ্য সেজাতি সেই সভ্যতা বা সেই সংস্কৃতি পায়। আমরাও পেয়েছি। আমি এর জন্যে গৌরব বোধ করি। এই দেড় শতকের মধ্যে আমরা স্বাধীনতাহীনতার হীনতা কাটিয়ে উঠেছি। তেমনি আধুনিকতাহীনতার দীনতা। আমাদের সাহিত্য এখন স্থিতিশীলতা নয়, গতিশীল তথা প্রগতিশীল। তবে সব অঙ্গ সমান পুষ্ট নয়। সামনের দেড়শো বছর হয়তো অপুষ্ট অঙ্গের পুষ্টি হবে। সাংস্কৃতিক যেসব বিভাগ সাহিত্যের তুলনায় পশ্চাৎপদ তারাও অগ্রসর হয়ে সাহিত্যের সঙ্গে পা মেলাবে। ফ্রান্সে যেমন সাহিত্য ও চিত্রকলা পরস্পরের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলে।

ভারতকে একটা উপদ্বীপ বলা হয়। আসলে কিন্তু এটা একটা মহাদ্বীপ। হিমালয়ও এককালে একটা সমুদ্র ছিল। এখনও সমুদ্রের মতো পথ রোধ করে রয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের লোক দ্বৈপায়ন। তাদের মনটাও ইনসিউলার। চার যুগ, চার বর্ণ, চার আশ্রম তাদের মনের চার দেওয়াল। সেই চার প্রাচীরের অন্তরালে জনমানস অবরুদ্ধ। ইংরেজি শিক্ষার পন্ডিতরাও সংস্কৃত শিক্ষার পন্ডিতদের ভাষায় কথা বলেন। এরপরে যখন বাংলা শিক্ষার পন্ডিতরা সমাসীন হবেন তাঁদের কথাবার্তাও হয়তো একইরকম হবে। শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের শিক্ষা যদি নতুন মোড় না নিত আমাদের সাহিত্যও নতুন মোড় নিত না। প্রাচীন কালের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সংস্কৃতিভিত্তিক। ব্রাহ্মণরাই তার সুযোগ পেতেন। তাই সাহিত্যও ছিল ব্রাহ্মণদের হাতে-গড়া। আধুনিক কালের শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে ইংরেজিভিত্তিক। ভদ্রলোকরাই তার সুযোগ পান। তাই সাহিত্যও ভদ্রলোকদের হাতে-গড়া। প্রাচীন কালের সাহিত্যের মতো আধুনিক কালের সাহিত্যেরও পায়ের তলার মাটি সংকীর্ণ। শিক্ষা যদি বাংলাভিত্তিক হয় ও জনগণ তার সুযোগ পায় তাহলে শিক্ষার মোড় থেকে আসবে নতুন সাহিত্য। এটা যেমন একটা প্রিয় সম্ভাবনা আর একটা তেমনি হচ্ছে বিশেষ মুখ্য স্রোতের সঙ্গে ভারতের অন্তঃস্রোতের সংযোগ যেটুকু ঘটেছিল সেটুকু ছিন্ন করে দ্বৈপায়নত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এবার জনগণের কতৃত্বে।

নবজাগরণ থেকে আধুনিক সাহিত্য ও আধুনিক সংস্কৃতি, এর মধ্যে একটা পারম্পর্য আছে। তেমনি গণজাগরণ থেকে গণসাহিত্য ও গণসংস্কৃতি, এর মধ্যেও আর একটা পারম্পর্য। দুই পারম্পর্যের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করতে হবে আমাদের উপর এই ভার পড়েছে, যেমন আমাদের পূর্বসূরিদের উপর পড়েছিল প্রাচীন ভারত ও আধুনিক ইউরোপ দুই পক্ষের মধ্যে সমন্বয়সাধনের ভার। নবজাগরণের লাভগুলিকে ত্যাগ করলে জনগণেরও ক্ষতি হবে। সেটা বুঝতে ওদের সময় লাগবে। যারা বোঝে তাদের কর্তব্য হবে লাভগুলিকে হাতছাড়া না করা। উপরন্তু গণজাগরণ থেকে যা লাভ করা গেছে ও যাবে সেসব লাভকেও হাত পেতে নেওয়া। জনগণের মধ্যে নতুন একটা জগৎ নিহিত রয়েছে। বীজের মধ্যে যেমন বনস্পতি। তাকে সাদরে বরণ করতে হবে। তেমনি তার কাছেও আশা করতে হবে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি।

গণজাগরণ যখন খুশি যেখানে খুশি ঘটানো যায় না। তার আগে নবজাগরণ ঘটে থাকা চাই। ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায় আগে রেনেসাঁস, তার পরে রিফর্মেশন, তারপরে এনলাইটেনমেন্ট, তারপরে ফরাসি বিপ্লব। মোটামুটি এই পরম্পরা রাশিয়াতেও অনুসৃত হয়েছে। ভারতেও। যদিও আমাদের গণজাগরণকে বিপ্লব বলে গণ্য করা হয় না। বিপ্লব হয়তো ভবিষ্যতে আসবে। কিন্তু তার আগে যেসব পর্যায় পার হওয়া গেছে সেগুলিকে অস্বীকার করে নয়। রেনেসাঁস যেখানে ঘটেনি রেভোলিউশন সেখানে ঘটে না। ঘটলে ধোপে টেকে না।

মানুষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বিপ্লব যে কখনো কোথাও ঘটেনি তা নয়, কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের আগে কোনো দাগ রেখে যায়নি। ফরাসি বিপ্লব একসঙ্গে চার্চকে ও রাষ্ট্রকে, পোপকে ও রাজাকে, শাস্ত্রকে ও শস্ত্রকে নস্যাৎ

করতে চেয়েছিল। আমাদের গণজাগরণ ততদূর যায়নি, যেতে সাহস পায়নি। শাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের নেতাদের মনোভাব ছিল সংস্কারের। বিপ্লবীর নয়। শাস্ত্র সম্বন্ধে মহাত্মাজির মনোভাব অহিংস অর্থে বৈপ্লবিক, কিন্তু অন্যান্য নেতাদের মনোভাব জাতীয়তাবাদী। চার্চ তো আমাদের ছিলই না, পোপের মতো যাঁরা ছিলেন তাঁরা ক্ষমতাহীন। রাষ্ট্র আর রাজার বিরুদ্ধেই আমাদের গণজাগরণ। সঙ্গে সঙ্গে রাজন্য ও জমিদারদেরও বিরুদ্ধে। তবু এর মধ্যে একটা mystique ছিল। সেটা সঞ্চার করেছিলেন আমাদের মহান নেতা গান্ধীজি। তিনি ছিলেন নৈরাজ্যবাদী। রাষ্ট্র তাঁর হাতে পড়লে তার বিকেন্দ্রীকরণ হত। প্রত্যেকটি গ্রামই হত স্বাধীন ও স্বাবলম্বী। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবাণিজ্যেরও হত বিকেন্দ্রীকরণ। সৈন্যদল থাকত না। থাকলে অতি ক্ষুদ্র আকারে। দেশ বিপন্ন হলে প্রত্যেকটি নাগরিক নিরস্ত্রভাবে লড়ত। কেমন করে লড়তে হয় গান্ধীজিই সেটা শেখাতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু গান্ধীজির পেছনে ভারতের কোনো ভাবুক পরম্পরা ছিল না। পরম্পরা যেটা ছিল সেটা পশ্চিমে। থোরো, রাস্কিন, টলস্টয় ও তাঁদেরই মতো কয়েক জন ভাবুক তাঁর পূর্বসূরি। ভারতীয়দের মধ্যে যাঁদের তিনি মানতেন তাঁরা রেনেসাঁসের নায়ক নন রিভাইভালের নায়ক। এক গোখলে বাদে। প্রাচীন ভারতে নৈরাজ্যবাদের মূল সন্ধান করা বৃথা। সে-ভারত ছিল ঘোরতর রাজতন্ত্রী ও পুরোহিততন্ত্রী। তাকে পুনরুজ্জীবিত করলে তার বিরুদ্ধে নতুন করে লড়তে হত। গৃহযুদ্ধের ভিতর দিয়ে যেতে হত। গান্ধীজি স্বয়ং রিভাইভালের ঊর্ধ্বে উঠলেও তাঁর শিষ্যরা এখনও তার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছেন। এঁরা টলস্টয়, থোরো, রাসকিনের নামও করেন না। এঁদের পেছনে তেমন কোনো ভাবুক পরম্পরা নেই। আছেন যাঁরা তাঁরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাধক ও সাধু। রেনেসাঁস থেকে এঁরা শতহস্ত দূরে। শুধুমাত্র নৈতিক প্রভাবের দ্বারা কোথাও কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেনি। ইতিহাস কী চায়, কোন অভিমুখে যাচ্ছে, কেমন করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছোবে, সবচেয়ে কম রক্তপাতে বা কম হিংসায় সবচেয়ে বেশিদূর অগ্রসর হবার উপায় কী, এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে নেতৃত্ব তাঁদের হাত থেকে চলে যাবে।

মার্কস শিষ্যদের কাছে হয়তো বিকল্প নেতৃত্ব প্রত্যাশা করা যেত। কিন্তু তাঁদেরও ধারণা ইতিহাস রেনেসাঁস, রিফর্মেশন ও এনলাইটেনমেন্ট নামক ধাপগুলি ডিঙিয়ে একলম্ফে রেভোলিউশনে পৌঁছোতে পারে। এরকম ধারণা স্বয়ং মার্কসের ছিল না। রেভোলিউশনের ভবিষ্যদবাণী তিনি করেছিলেন পশ্চিম ইউরোপের জন্যে। যেখানে ওই ধাপগুলি আগেই পার হওয়া গেছিল। রাশিয়ার বিপ্লবীরা তাকে সে-দেশেও ঘটাতে চাইলেন। পারলেন যে তার অন্যতম কারণ সে-দেশেও কতক পরিমাণে রেনেসাঁস ও এনলাইটেনমেন্ট সম্পন্ন হয়েছিল। রিফর্মেশন যদিও হয়নি তবু এনলাইটেনমেন্টের প্রভাবে রুশ দেশের মার্কসপন্থীরা সকলেই ছিলেন নিরীশ্বরবাদী। ধর্মকে তাঁরা মনে করতেন জনগণের আফিম। এসব কথা চীন সম্বন্ধেও মোটামুটি খাটে। চীনারা বৌদ্ধই হোক আর কনফিউসিয়ানই হোক ঈশ্বরবাদী নয়। মানুষের মন বদলে না দিয়ে শুধুমাত্র বাইরের অ্যাকশন দিয়ে যা হয় তা বিপ্লব নয়, বিদ্রোহ বা বিক্ষোভ। যেমন সিপাহি বিদ্রোহ।

আমাদের রেনেসাঁসের নায়কদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল দেশের লোককে আধুনিক যুগের লোক করে তোলা। আধুনিকতা নিছক সমকালীনতা নয়। সমকালীন হলেই আধুনিক হয় না। আধুনিক শব্দটির অর্থ আর একটু সূক্ষ্ম। সেঅর্থে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আধুনিক কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নন। মধ্যযুগেও এমন কবি দু-চার জন ছিলেন যাঁরা এই সূক্ষ্মতর অর্থে আধুনিক। প্রাচীন গ্রিসে তেমন কবি বা নাট্যকার দার্শনিক অনেক বেশি ছিলেন। মহাভারত পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে মনে হয় যিনি বা যাঁরা লিখেছিলেন তিনি বা তাঁরা কারও চেয়ে কম আধুনিক ছিলেন না। আসলে যুগটা আধুনিক বলে সব সৃষ্টি আধুনিকতাসম্পন্ন নয়। আবার যুগটা আধুনিক নয় বলে সব সৃষ্টি আধুনিকতাবর্জিতও নয়।

আধুনিকতা তাহলে কী? এর সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয়। এর লক্ষণ হচ্ছে, সব কিছু জানার জন্যে সব কিছু বোঝার জন্যে সব কিছু নেড়েচেড়ে দেখার জন্যে স্বাভাবিক কৌতূহল। তার জন্যে অবাধ স্বাধীনতা। বিপজ্জনক অ্যাডভেঞ্চার। অবিরত পরীক্ষানিরীক্ষা। শাস্ত্রবাক্য গুরুবাক্যকে শেষ কথা বলে ধরে না নেওয়া। ব্যক্তির বিচার-বিবেকের উপর আত্মকতৃত্ব। দেহের সৌন্দর্যে আনন্দ। ইন্দ্রিয়ের বিচিত্র বোধ। হৃদয়ের বিচিত্র

অনুভূতি। সত্যের জন্যে নিত্য ব্যাকুলতা, নিত্য উদ্যোগ। নিজের মতো করে বাঁচা। জীবনকে ভরিয়ে নেওয়া। মরণকে ভয় না করা। পরকাল বা পরলোক নিয়ে মাথা না ঘামানো। ইহকাল ও ইহলোকের কাজ নিখুঁতভাবে করে যাওয়া। আদর্শকে এই জগতেই ও এই জীবনেই যথাসাধ্য রূপায়িত করা। নূতনের জন্যে মনের দুয়ার সবসময় খোলা রাখা। অতীতকেই ভবিষ্যতের ধ্রুবতারা না করা।

আজকাল সব দেশের উপরের স্তরে দিনযাপন ও নিশিবিহারের ধারা প্রায় একই প্রকার। শিল্পবিপ্লব থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলোও প্রায় একই জাতের। এর নাম সমকালীনতা, আধুনিকতা নয়। সত্যিকার আধুনিকতা আরও গভীর স্তরের ব্যাপার। রেনেসাঁস, রিফর্মেশন, এনলাইটেনমেন্ট যেসব দেশে হয়নি সেসব দেশ আধুনিক যন্ত্রপাতির বা অস্ত্রশস্ত্রের দৌলতে ভারতের তুলনায় সম্পদশালী বা শক্তিশালী হতে পারে কিন্তু গভীরতর অর্থে আধুনিক নয়। এই দেড়শো বছরে আমরা তাদের তুলনায় আরও আধুনিক হয়েছি। নবলব্ধ স্বাধীনতা আমাদের আধুনিকতা সহায়ক হবে। তা বলে ইংরেজ আমলও যে সহায়ক ছিল না তা নয়। মনটাকে প্যাশনমুক্ত করে বিচার করলে বোঝা যাবে ইংরেজ আমল নানা দিক দিয়ে পূর্বের চেয়ে প্রগতিশীল ছিল। প্রত্যেক পুরুষেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। সব মিলিয়ে যা ঘটে তা ঐতিহাসিক বিবর্তন। তাতে ভারতীয়দের যেমন হাত ছিল তেমনি ইংরেজদেরও হাত। হাতাহাতি হয়নি তা নয়, কিন্তু হাত ধরাধরিও হয়েছে। যে যুগ চলে গেছে তার ষোলো আনা নিন্দাবাদ করা সত্যভাষণ নয়। আমরা এগিয়েছি ঠিকই। হয়তো আরও বেশি এগোতে পারতুম। বাধা পেয়েছি।

কিন্তু বাধা কেবল বাইরে থেকেই আসেনি। আমাদের অতি পুরাতন ঐতিহ্যও আমাদের বাধা। কিন্তু সেক্ষেত্রেও মনটাকে প্যাশনমুক্ত করে বিচার করতে হবে। এ দেশটা ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকা নয়, রাশিয়া বা জার্মানি নয়। এটা ভারত। ভারতেরও একটি মুখ্য স্রোত আছে। সেস্রোত আর্যপূর্ব যুগ থেকে প্রবহমাণ। কত জাতি, কত ভাষা, কত ধর্ম, কত দার্শনিক তত্ত্ব তার সামিল হয়ে তার বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছে। তাকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছেও। ভারতের যে ঐতিহ্য তাকে তুলনা করতে পারি গঙ্গার সঙ্গে। গঙ্গার মতো সেআদিকালের গঙ্গোত্রী থেকে নির্গত হয়ে একালের গঙ্গাসাগর সঙ্গমে বহির্জগতের মহত্তর ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই যে মহত্তর সাগর, এর জোয়ার এসেছে গঙ্গার বুকে বঙ্গোপসাগরের জোয়ারের মতো।

আর্য ও আর্যপূর্ব, বৌদ্ধ ও বৌদ্ধপূর্ব, মুসলিম ও মুসলিমপূর্ব, আধুনিক ও আধুনিকপূর্ব, ভারতের বিবর্তনের এই চারটি পর্বকেই ইতিহাসের বিধান বলে মেনে নিতে হবে। এক-একটি পর্বের ভালো আর মন্দ দুটি করে দিক। দুই দিকই সত্য। মন্দের জন্যে ভালোকে অস্বীকার করা ভুল। মানবিক ব্যাপারে ভালো-মন্দ একসঙ্গে জড়িয়ে থাকে। রেনেসাঁসের ভিতরেও প্রচুর কলুষ ছিল, যেমন ইটালিতে তেমনি ইংল্যাণ্ডে। রিফর্মেশনও ছিল রেভোলিউশনের মতো রক্তাক্ত, যেমন জার্মানিতে তেমনি ফ্রান্সে। আর এনলাইটেনমেন্ট সম্বন্ধেও একালের সমালোচকরা তেমন সপ্রশংস নন। তার নায়করা নাকি বিশ্বাস করতেন যে একজন প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী রাজা যতখানি মঙ্গলসাধন করতে পারবেন একটা অনাচারী গণতন্ত্র ততখানি নয়। এতে সাধারণ ভোটদাতার উপর অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। আখেরে মানবপ্রকৃতির উপর। পক্ষান্তরে এটাও তো দেখা গেল—জার্মানির সাধারণ ভোটদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েই হিটলার চান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত হন ও তারপর সর্বময় ক্ষমতা করায়ত্ত করে চরম অমঙ্গল সাধন করেন।

ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার সামঞ্জস্য এখনও বাকি। ঐতিহ্য যে বাধা দেয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, অথচ ঐতিহ্য যদি আদৌ না থাকে তবে তার শূন্যতাও অপূরণীয়। ভারত যদি প্রাচীন না হয়ে অর্বাচীন হত সেটাও কি আনন্দের বিষয় হত? তাহলে তো আমাদের আদিম অবস্থা থেকেই আরম্ভ করতে হত। যে উত্তরাধিকার আমরা বিবর্তনসূত্রে লাভ করেছি তার সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও তাও তেমনি অমূল্য। দেশাভিমান বা শ্রেণিসচেতনতা যেন আমাদের পূর্ণ উত্তরাধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত না করে। কিন্তু গ্রহণ করলেও আমরা নির্বিচারে গ্রহণ করতে বাধ্য নই। পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়ন সারাক্ষণ চলবে। রেনেসাঁসের মূল কথাই তাই।

আজকের ভারতে সবচেয়ে রক্ষণশীল শক্তি ঐতিহ্য নয়, ধর্ম। প্রাগৈতিহাসিক কুসংস্কার, প্রাচীন যুগের আচার-অনুষ্ঠান, মধ্যযুগের যুক্তিহীন ভক্তি ও অন্ধবিশ্বাস, এসব বাদ দিলেও এমন কিছু থাকে যার জন্যে হিন্দুদের ধর্ম এখনও প্রাণবান। এখনও সৌন্দর্যসৃষ্টির আকর। এখনও নৃত্যে গীতে কারুশিল্পে অভিনব প্রেরণার উৎস। ধর্মীয়তার অন্তরালে আধ্যাত্মিকতার অন্তঃস্রোত এখনও বহমান। ঐতিহ্যের মুখ্য স্রোতের মতো আধ্যাত্মিকতার অন্তঃস্রোতের সঙ্গেও আধুনিকতার সামঞ্জস্য সন্ধান করতে হবে। মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিকাশও কি পড়ে না? নৈতিক বিকাশও পড়ে। এগুলি বাদ দিলে মানবিকবাদও ধর্মের মতো একপেশে হবে। সব দিক নিয়েই সমগ্র মানবসত্তা। নইলে অপূরণীয় শূন্যতা।

রেনেসাঁসের নবপর্যায়

ইতিহাসকে নতুন দৃষ্টিতে দেখা যায়, নতুন করে লেখা যায়, কিন্তু যা ঘটে গেছে তাকে ইচ্ছামতো পালটে দেওয়া যায় না। জাতীয় অহমিকায় বাধে, সামাজিক অভিমান আহত হয় তবু এটা মেনে নেওয়াই ভালো যে ভারত একটা অক্ষয় অব্যয় অনাদি অনন্ত চিন্ময় সত্তা নয়। সেকখনো গৌরবের কখনো অগৌরবের কখনো আলোকের কখনো অন্ধকারের কখনো উত্থানের কখনো পতনের কখনো স্বাধীনতার কখনো পরাধীনতার ভিতর দিয়ে গেছে। একই কথা বলতে পারা যায় ইউরোপীয় দেশগুলোর বেলায়ও। ইতিহাস কেবল একটানা সৌভাগ্যের ইতিহাস নয়, দুর্ভাগ্যেরও ইতিহাস। দুর্ভাগ্যকে জয় করতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে ঘটেছে এটা মেনে নিতে হয়।

মানবিক ব্যাপারে দুর্ভাগ্যও অবিমিশ্র দুর্ভাগ্য নয়। কালো মেঘেরও একটা রুপালি রেখা থাকে। পরাধীনতার সেই কালো মেঘের রুপালি রেখা ছিল বাংলার রেনেসাঁস। বাংলা ছিল ভারতের অঙ্গ। সুতরাং সেটা ছিল ভারতেরও রেনেসাঁস। বাংলায় শুরু হলেও সেটা সেইখানে সীমাবদ্ধ ছিল না। ক্রমে ক্রমে ভারতময় ব্যাপ্ত হয়েছিল। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিস্তৃত যে যুগ তার বিস্তার কেবল দশক থেকে দশকে নয়, প্রদেশ থেকে প্রদেশে। হিন্দি সাহিত্যের ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র, ওড়িয়া সাহিত্যের ফকিরমোহন সেনাপতি, অসমিয়া সাহিত্যের লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া—এঁরাও রেনেসাঁস যুগের নায়ক।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের ছ-বছর বাদে পরাধীনতারও অবসান। রবীন্দ্রোত্তর ও ব্রিটিশোত্তর মোটামুটি সমবয়স্ক। আমরা যারা এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে জন্মেছি তারা এক যুগ থেকে আরেক যুগে উপনীত হয়েছি। কিন্তু যাদের জন্ম স্বাধীন ভারতে তাদের জীবন তো আমাদের মতো অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তরণ নয়। তাদের কী করে বোঝানো যাবে যে অন্ধকার রাত্রেও আকাশে তারা ফোটে চাঁদ ওঠে আর জ্যোৎস্নায় দশদিক প্লাবিত হয়ে যায়। কী জানি কেমন করে সূর্যও উঠেছিল। রেনেসাঁস সত্যি সত্যিই একটা রুপালি রেখা ছিল। যদিও একালের লোক বিশ্বাসই করতে চায় না যে পরাধীন দেশে রেনেসাঁস হতে পারে। বিশ্বাস করলেও বলে তা অকিঞ্চিৎকর। যেহেতু তার সৃষ্টি স্থিতি ও বিলয় বুর্জোয়া শ্রেণিতে। ইংরেজদের মতো বুর্জোয়াদেরও আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে এসেছে। তাদের রেনেসাঁস তাদের সঙ্গেই সহমরণে যাবে।

ইতিহাসের পাতায় অনেক বৈদেশিক আক্রমণের বিবরণ আছে, কিন্তু এমনটি কোথাও লেখা নেই যে সাত সমুদ্রপারের একটি সওদাগর কোম্পানি প্রথমে ভারতের সাগর উপকূলে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতা নামে তিনটি বন্দর পত্তন করে, পরে সেই তিনটি বন্দর থেকে বাণিজ্য করতে করতে আত্মরক্ষার জন্যে তিনটি দুর্গ নির্মাণ করে, আরও পরে তিনটি অঞ্চলের রাজনীতির জালে জড়িয়ে পড়ে, আরও পরে ছলে-বলে-কৌশলে তিনটি আঞ্চলিক সরকার গঠন করে, পরিশেষে তিন দিক থেকে সারা ভারত ঘিরে ফেলে ও একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। আমাদের রাজা-বাদশারা ছিলেন একচক্ষু হরিণ। তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেননি যে সমুদ্রপথ দিয়ে শত্রু আসতে পারে, সামুদ্রিক বন্দর হতে পারে বৈদেশিক নৌবাহিনীর ঘাঁটি, সি পাওয়ার থেকে আসতে পারে ল্যাণ্ড পাওয়ার, অতিকায় মোগল ফৌজ ও দুর্ধর্ষ মারাঠা সেনা একমুঠো গোরা গোলন্দাজের কাছে হার মানতে পারে।

কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে আসলে ওটা ছিল আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় তিন শতাব্দী এগিয়ে থাকা একটি শক্তির কাছে তিন শতাব্দী পেছিয়ে থাকা অন্য কয়েকটি খন্ডশক্তির পরাজয়। এই খন্ডশক্তিগুলি যদি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে বলক্ষয় না করত তাহলে হয়তো পেছিয়ে থাকা সত্ত্বেও জাপানের মতো স্বাধীনতা রক্ষা করত। কিন্তু কলহ তাদের অস্থিমজ্জায়। দুই শতাব্দী পরাধীন থেকেও তারা একতাবদ্ধ হতে শিখল না। ফলে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশ হয়ে গেল দু-ভাগ। আমাদের ইতিহাসে এটা নতুন কিছু নয়। বরং এইটেই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কোনো একজন রাজচক্রবর্তী আর সবাইকে যুদ্ধে

হারিয়ে না দিলে ভারত কখনো আপনা হতে একশাসনাধীন হয়নি। তবে তাঁরা ছিলেন রাজচক্রবর্তী, সওদাগর শিরোমণি নন। মোগল বাদশারাও প্রকারান্তরে ক্ষত্রিয়, প্রকারান্তরে বৈশ্য নন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব ছিল বৈশ্য রাজত্ব। ভারতে তারা নিয়ে আসে বৈশ্য যুগ। তাদের স্বদেশেই ক্ষত্রিয় যুগের আয়ু শেষ হয়ে এসেছিল, ঠাটটা ক্ষত্রিয় রয়ে গেলেও চরিত্রটা বৈশ্য। ক্ষমতার আসনে ভূম্যধিকারীদের দল, কিন্তু ক্ষমতার রশি যাঁদের হাতে তাঁরা পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের দল। চার্চ বা ব্রাহ্মণশক্তি রাষ্ট্র বা ক্ষত্রিয়শক্তির কাছে বশ্যতাস্বীকার করেছিল। আবার রাষ্ট্র বা ক্ষত্রিয়শক্তিও পার্লামেন্ট বা ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের যৌথশক্তির কাছে নতি স্বীকার করেছিল। এর ফলে ইঙ্গদ্বীপী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের মধ্যে যে পরিমাণ একতা ছিল তেমন আর কোনোখানে ছিল না। ফ্রান্স, জার্মানি ইত্যাদি দেশ আত্মকলহে জর্জর।

ইটালিতে এবং তার পরে ফ্রান্সে স্পেনে ও ইংল্যাণ্ডে যে রেনেসাঁস হয় তার পটভূমিকা ও আমাদের এদেশে যে রেনেসাঁস হয় তার পটভূমিকা এক নয়। এক না হওয়ার কারণ এ নয় যে ওরা ছিল রেনেসাঁসের সময় স্বাধীন আর আমরা ছিলুম রেনেসাঁসের পরাধীন। ওদের রেনেসাঁস বৈশ্যযুগের পূর্বেই ঘটেছিল, আমাদের রেনেসাঁস বৈশ্যযুগের সূচনার পর। এই প্রভেদটা ভালো করে মনে রাখা দরকার। আমাদের রেনেসাঁসের নায়করা বুর্জোয়া শ্রেণিভুক্ত। ওদের রেনেসাঁসের নায়করা তখনও বুর্জোয়া বলে চিহ্নিত হয়নি। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকরা তাঁদের দেশের অভিজাত শ্রেণি। চার্চও গোড়ার দিকে পৃষ্ঠপোষক ছিল, কিন্তু রেনেসাঁসের স্বরূপ আবিষ্কার করার পর বিরূপ হয়। রেনেসাঁস থেকে আসে বিজ্ঞানে মতি। আর বিজ্ঞান তো যুক্তি বিনা এক কদমও এগোয় না। আর যুক্তি করাই যার প্রকৃতি সেকখনো বিনা বাক্যে শাস্ত্রবাক্য মেনে নিতে পারে না। সাহিত্যে আর চিত্রভাস্কর্যে আসে গ্রিকদের জীবনদর্শন। সেজীবনদর্শন খ্রিস্টীয় জীবনদর্শনের সঙ্গে মেলে না। দর্শনশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্রের থেকে পৃথক হয়ে যায়। পদে পদে বিরোধ বাঁধে। কিন্তু ওসব দেশের অভিজাত শ্রেণি রেনেসাঁসের গোড়ায় যেমন পক্ষপাতী ছিলেন শেষেও তেমনি। নাইটদের জীবনদর্শনের সঙ্গে রেনেসাঁসের জীবনদর্শনের তেমন কোনো বিরোধ ছিল না। রেনেসাঁসের ফলে তাঁদের জীবন আরও সমৃদ্ধ হয়। তাঁরা থিয়েটারে যান। অভিনয় দেখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। গ্রিক সাহিত্য পড়েন। অবজার্ভেটরিতে বসে টেলিস্কোপ দিয়ে গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করেন। স্টুডিয়োতে গিয়ে শিল্পীদের উৎসাহ দেন গ্রিক আদর্শে আঁকতে ও গড়তে। ওয়ার্কশপে গিয়ে কারিগরদের ফরমাশ করেন রকমারি তৈজসপত্র বানাতে। অভিজাত শ্রেণির অনুসরণে বুর্জোয়া শ্রেণিও পরবর্তীকালে রেনেসাঁসের পৃষ্ঠপোষক হন। কিন্তু এঁরা ছিলেন অভিজাতকুলের তুলনায় অধিকতর পরিমাণে চার্চের আঁচলে বাঁধা।

ষোড়শ শতাব্দীর রেনেসাঁস যখন ঊনবিংশ শতাব্দীতে পড়ে তার বহুপূর্বেই ইংল্যাণ্ডে একটা পটপরিবর্তন ঘটে যায়। বুর্জোয়া শ্রেণি ততদিনে জাঁকিয়ে বসেছেন। থিয়েটারের দর্শক, বইপত্রের পাঠক ও গ্রাহক, শিল্পদ্রব্যের ক্রেতা, ভোগ্যসামগ্রীর উদ্ভাবক অভিজাতদের পেছনে ফেলে বুর্জোয়া শ্রেণির কাঞ্চনকুলীন। এই কাঞ্চনকৌলীন্যই এদেশে আমদানি হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পলাশির পর। সূর্যাস্ত আইনে পুরোনো জমিদারি কিনে নেন নতুন জমিদারকুল। এঁরা মহাজনি তেজারতি ও ব্যাবসাদারি করে বড়োলোক। এঁদের অভিজাত না বলে কাঞ্চনকুলীন বলাই সমীচীন। এঁরা জাতে যা-ই হন বর্ণে বৈশ্য।

সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য কেন্দ্র মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতা অষ্টাদশ শতাব্দীতে হয় প্রশাসন কেন্দ্র। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র। তিনটির মধ্যে কলকাতাই হয় অগ্রগণ্য কারণ সারা ভারতের রাজধানী স্থাপিত হয় কলকাতায়। এই শহরের অবস্থান যদিও পূর্ব ভারতে তবু এই কেন্দ্র থেকে সমগ্র উত্তর ভারত ইংরেজদের অধিকারে আসে। ইংরেজ যেখানেই যায় বাঙালিও যায় সেখানে। সাংস্কৃতিক দিগবিজয়ে ইংরেজদের সহকারী সেনাপতি হয় বাঙালি। এতে তার মান বাড়ে বই কমে না। কিন্তু শতাব্দীর প্রারম্ভের এই সম্মানের সম্পর্কটা সিপাহি বিদ্রোহের পর থেকে ক্রমশ অসম্মানের হয়ে ওঠে। কিপলিং-এর 'হারি চান্ডার মুকার্জির' অপরাধ তিনি সাহেবদের সমকক্ষ হতে চান। সহকারী সেনাপতির সাধ কিনা সেনাপতি হতে। বামন হয়ে চাঁদে হাত। সাহেবখেদা আন্দোলনে বাঙালির নেতৃত্ব নতুন এক ইতিহাস

সৃষ্টি করে। কিন্তু ইতিমধ্যে রেনেসাঁসের দফারফা। সেপড়ে যায় দুই আগুনের মাঝখানে। সাম্রাজ্যবাদ বনাম জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদকে জোর জোগায় রেনেসাঁস নয়, রিভাইভালিজম অর্থাৎ পুনরুজ্জীবনবাদ।

পুনরুজ্জীবন বলতে বোঝায় প্রাচীন ভারতের আদর্শে আধুনিক ভারতের রূপায়ণ। কিন্তু প্রাচীন ভারত কি কেবল আর্য ভারত? বৈদিক ভারত? তার পূর্বেও তো প্রাচীনতর আর্যপূর্ব ভারত ছিল। আমাদের পুনরুজ্জীবনবাদীরা জানতেন না যে সিন্ধু সভ্যতা বলে একটি প্রাচীনতর সভ্যতা ছিল, সেটা আর্যদের জন্যে অপেক্ষা না করে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা খনন করতে গিয়ে দুটি অতুলনীয় নগর পাওয়া গেছে। বৈদিক আর্যদের তেমন কোনো কীর্তির সন্ধান মেলেনি। উৎখনন এখনও চলছে ও নিত্যনতুন সাক্ষ্য উদ্ধার হচ্ছে। সেই সভ্যতার বিস্তার কেবল সিন্ধুতটেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তার বিস্তার রাজস্থানকে ছাড়িয়ে আরও পূর্ব দিকে ও কাথিয়াবাড়কে ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণ দিকে এগিয়েছিল। বৈদিক আর্যদের সঙ্গে এই প্রাকবৈদিক প্রাগার্যদের বিরোধ বেঁধেছিল বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়, কারণ বেদ যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনায় মুখর। শত্রুরা দুর্জয় না হলে তাদের বধ করার জন্যে দেবতাদের স্তবস্তুতি করতে হত না। সিন্ধু সভ্যতারই-বা পুনরুজ্জীবন হবে না কেন, যদি পুনরুজ্জীবনই হয় লক্ষ্য? তারপর আর্য ভারতও যে সার্বভৌম ছিল তা নয়। আর্যাবর্তেই তার সীমাবদ্ধতা। তার বাইরে ছিল বঙ্গ, তার বাইরে ছিল দাক্ষিণাত্য। আর তার স্থিতিকালও হাজার বছরের বেশি নয়। আর্য ভারতের পরে মৌর্য ভারত। আর্য-অনার্যের মিশ্র ভারত। তার অধিকার প্রায় ভারতব্যাপী। ভারতের বাইরেও তার প্রভাব। ততদিনে বেদবিরোধী বৌদ্ধ জৈন ধর্ম সংঘবদ্ধ হয়ে রাজশক্তিকেও ধর্মান্তরিত করেছে।

মৌর্য ভারতের পরে যাকে সাধারণত হিন্দু ভারত বলে অভিহিত করা হয় তার মোহানায় মিশেছিল গ্রিক আর পারসিক, শক আর কুষাণ, হূন আর বহুপ্রকার মোঙ্গলীয় উপজাতি। এদের কেউ এসেছিল উত্তর-পূর্ব থেকে, কেউ উত্তর থেকে। প্রাচীন ভারত বলতে মুসলিমপূর্ব এই ভারতকেও বোঝায়। এই ভারতে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন ঐতিহ্যের বিরোধ চরমে ওঠে। ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যই জয়ী হয়, কিন্তু সেআর ক-দিনের জন্যে। দেখতে দেখতে ইসলামধর্মী আরব তুর্ক মোগল এসে পড়ে। মোগল যে সময়ে আসে সেই সময়ে আসে তার বিপরীত দিক থেকে খ্রিস্টধর্মী পোর্তুগিজ। তার পিছু পিছু ইংরেজ ফরাসি ওলন্দাজ। জার্মানও এসেছিল, কিন্তু স্বদেশেও গৃহবিবাহের দরুন গুছিয়ে বসতে পারেনি। পূর্ব দিক থেকে আসে আহোম। আহোমরা শাক্ত ও বৈষ্ণব দীক্ষা ও সংস্কৃত নাম গ্রহণ করে। কিন্তু অন্যেরা তা করে না। তার ফলে মুসলিম ভারত বলে একটি সত্তার সূচনা হয়। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ভারত, ফরাসি ভারত, পোর্তুগিজ ভারত এরাও উদয় হয়।

পুনরুজ্জীবনবাদীরা শেষের এই তিনটি ভারতের অবসান চেয়েছিলেন। এটা সবাই জানে। কিন্তু মুসলিম ভারতেরও অবলোপ চেয়েছিলেন কি? যদি চেয়ে থাকেন তা হলে আর মুসলিম পুনরুজ্জীবনবাদীদের দোষ দিয়ে কী হবে? মুসলিম ভারত হিন্দুর পক্ষে যতই অগৌরবের হোক-না কেন মুসলমানদের পক্ষে গৌরবের। মুসলিম ভারতকে হিন্দু ভারতের থেকে ভিন্ন করতে হলে দেশটাকেও ছিন্নভিন্ন করতে হয়। অতীতমুখী ভাবনার অনিবার্য পরিণাম ভারতভাগ। এর পরেও যদি কেউ পুনরুজ্জীবনের কথা ভাবেন তা হলে বলতে হবে তিনি আজকের এই খণ্ডিত ভারতকেও খণ্ড খণ্ড করতে চান। অত কিছুর পরেও কি সে-গৌরব ফিরবে? ফিরতে পারে না। কারণ তার আয়ু সেনি:শেষে ভোগ করেছে। দ্বিতীয় বার যদি সেআসে দ্বিতীয় বার সেযাবে। মাঝখানের স্থিতিকাল হয়তো বিশ-ত্রিশ বছর।

রেনেসাঁস ও রিভাইভাল আমাদের ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে দুটি বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রেনেসাঁসের যাঁরা ধারক ও বাহক তাঁরা সকলেই ইংরেজি শিক্ষিত। অনেকেই ইংল্যাণ্ডে ঘুরে এসেছেন। কেউ কেউ সেইখানেই দেহরক্ষা করেছেন। সমসাময়িক ইউরোপীয় চিন্তার সঙ্গে নিত্য ও অবিচ্ছিন্ন যোগ রক্ষা করতেন তাঁরা। তাঁদের সম্পাদিত সাময়িকপত্র পাঠ করলেই সেটা বোঝা যায়। কোনোটি ইংরেজীতে প্রকাশিত, কোনোটি আধুনিক ভারতীয় ভাষায়। কিন্তু একখানিও সংস্কৃত ভাষায় নয়। তার মানে

এ নয় যে তাঁরা সংস্কৃত জানতেন না বা পড়তেন না। প্রাচীন সংস্কৃতিকে তাঁরা শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন, তাকে সংরক্ষণ করতেই তাঁদের বাসনা। কিন্তু যে প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান বৃদ্ধি পেতে পেতে বহুকাল পূর্বে একটি জায়গায় এসে থেমে গেছে তাকে ক্রমবর্ধমান আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে কেমন করে মেলাবেন। খ্রিস্টীয় চার্চ যদি তা পারত তাহলে এতজন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিককে পুড়িয়ে মারতে হত না। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অজ্ঞান নয়। বস্তুজ্ঞান। বাস্তবজ্ঞান। তাকে সত্য বলে স্বীকার করলে প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বিদায় দিতে হয়। অন্তত আবার যাচাই করে শোধন করতে হয়।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বিদেশ থেকে এসেছে বলে তা বর্জনীয় নয়, বিজাতির সঙ্গে এসেছে বলে অনাচরণীয় নয়, বিজেতার সঙ্গে এসেছে বলে বিতাড়নযোগ্য নয়, পশ্চিম থেকে এসেছে বলে পাশ্চাত্য দোষে দূষিত নয়। পশ্চিম একটি দিকবাচক বা দেশবাচক শব্দ। আধুনিক একটি কালবাচক বা যুগবাচক শব্দ। আমরাও যদি আধুনিক কালের বা আধুনিক যুগের মানুষ হয়ে থাকি তবে আমাদের কালের সঙ্গে আমাদেরও তাল রাখতে হবে, আমাদের যুগের সঙ্গে আমাদের পা মিলিয়ে নিতে হবে। কালিদাস ভালোবাসি বলে কালিদাসের কালে নিশ্বাস নিতে পারি-নে। রামায়ণ ভালোবাসি বলে রামায়ণের যুগের সঙ্গে মনের মিল অনুভব করতে পারিনে। টলস্টয়ের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে আমি তার চেয়ে বেশি সহমর্মিতা বোধ করি। ব্রাউনিং-এর কবিতা আমাকে তার চেয়ে বেশি দোলা দেয়।

ঐতিহ্যের মাটিতে মূল থাকুক, মূলোৎপাটনের জন্য কেউ উৎসাহী নয়। দেশ থাকলে তার মূল্য থাকবেই। সেমূল আর্যই হোক আর আর্যপূর্বই হোক। তেমনি কাল থাকলে তার এক এক ঋতুতে এক একরকম ফুল ফোটাতে হবে। এক এক শতাব্দীতে এক একরকম আদর্শ বা তত্ত্ব মেনে চলতে হবে। ফরাসি সাহিত্যে তো এক এক দশকে এক-একটা 'ইজম' চলতি হয়। নব নব উন্মেষ না হলে সাহিত্য বা চিত্রকলা প্রাণবন্ত হয় না। যার প্রাণপ্রবাহ শুকিয়ে গেছে তার কাছে নতুন কিছু পাবার নেই। রসের জন্যে, রূপের জন্যে, আইডিয়ার জন্যে, জ্ঞানের জন্যে, আমাদের আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য বা আর্টের কাছে যেতে হয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যা পাই শুধুমাত্র তারই উপর নির্ভর করলে আমরাও কিছুদিনের মধ্যে ফুরিয়ে যাই বা বুড়িয়ে যাই। লিখব উপন্যাস অথচ ইংরেজি বা ফরাসি বা রুশ উপন্যাস পড়ব না, পড়ব শুধু কাদম্বরী ও দশকুমারচরিত এমনতরো ফতোয়া জারি হলে উপন্যাসের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যাবে, আর যিনি লিখবেন তিনিও বিশ্বসাহিত্যের দরবারে অপাঙক্তেয় হবেন। পুনরুজ্জীবনবাদীরা এমন কিছু দিতে পারেনি যা তাঁদের পূর্বপুরুষরা দিয়ে যাননি। অতীতের অনুকরণও একপ্রকার অনুকরণ।

স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের পর পুনরুজ্জীবনবাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কিন্তু তার প্রবক্তাদের বদ্ধমূল ধারণা তাঁরাই স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। ভাবী ভারত হবে প্রাচীন ভারতের ছাঁচে ঢালা। বিদেশির হাত থেকে স্বাধীনতা পেলেও অতীতের হাত থেকে স্বাধীনতা পাবে না। ইতিহাস না পড়ে পুরাণ পড়তে হবে, পৌরাণিক যুদ্ধবিগ্রহকে বলতে হবে ঐতিহাসিক যুদ্ধবিগ্রহ, পৌরাণিক যুদ্ধক্ষেত্রকে ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্র, পৌরাণিক বীরপুরুষদের ঐতিহাসিক বীরপুরুষ। এ বিভ্রম ঐতিহাসিকদের কারো কারো গবেষণায় লক্ষ করা যায়। পরাধীন ভারতে এঁদের পৃষ্ঠপোষকের অভাব ছিল। এখন এঁরা উচ্চপদস্থ। এই যেমন পুরাণের সঙ্গে ইতিহাসকেও একাকার করা তেমনি থিয়োলজির সঙ্গে ফিলসফিকে একাকার করাও লক্ষণীয়। মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় সাড়ে চার শতাব্দী পূর্বে ও-দুটোকে আলাদা করেছিল। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শুধু ফিলসফিই প্রবর্তিত হয়েছিল। এখন ফিলসফির বাঘের ঘরে থিওলজির ঘোগ বাসা বাঁধছে।

আবার এমনও দেখছি যে মোগল ও ব্রিটিশ আমলের জমিদারকুল নির্মূল, হিন্দু আমলের রাজবংশ নির্বীর্য। প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয় শ্রেণিকে পুনরুজ্জীবিত করতে দিচ্ছে কে? তাঁদের নি:ক্ষত্রিয় করাই তো যুগধর্ম। দেশে দেশে সেই কর্ম চলেছে। নেহাত ইংল্যাণ্ডের আশ্রয়ে ছিলেন বলেই তাঁরা এতদিন রক্ষা পেয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের অভিজাত শ্রেণী তাঁদের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ। ক্ষত্রিয় শ্রেণি যাগযজ্ঞ ও দানধ্যান না করলে ব্রাহ্মণ শ্রেণির পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর জমি ভূমিসংস্কার আইনের আওতায়

পড়ে। তা হলে বাকি থাকে বৈশ্যবর্ণ শুদ্রবর্ণ। ধনিক ও শ্রমিক। জোতদার ও চাষি। ক্ষমতার আসনে যাঁরা অধিষ্ঠিত তাঁরা শ্রেণিসংঘর্ষ পরিহার করতে চান। মহাত্মা গান্ধীও ট্রাস্টিশিপের মন্ত্র ও মন্ত্রণা দিয়ে গেছেন। পুনরুজ্জীবনে বৈশ্য বর্ণের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হতে পারত, কিন্তু শূদ্রবর্ণের অভিযোগ দূর হবার নয়। তারা বিদ্রোহী হলে তাদের দমন করার জন্যে সে-রামও নেই, সে-অযোধ্যাও নেই। শূদ্রের দিক থেকে শম্বুকবধ প্রার্থনীয় নয়। তার দৃষ্টি এখন রুশ চীনের উপরে। যেমন বৈশ্যের দৃষ্টি আমেরিকার উপরে।

না, এখন আর পশ্চিম দিকে তাকাতে কারও অভিমানে বাধে না। মুসলমানের যেমন মক্কা, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শ্রমিক শ্রেণির মস্কো আর ধনিক শ্রেণির নিউইয়র্ক। প্রতিদিন আকাশপথে পুষ্পক বিমান ছুটছে পশ্চিম ভূমন্ডলের দুই প্রান্তে। আজকাল পশ্চিম ভূমন্ডলকে দুই প্রান্তে ভাগ করা হয়েছে। পূর্ব প্রান্ত ও পশ্চিম প্রান্ত। পশ্চিম প্রান্তে আমেরিকা প্রমুখ ধনতন্ত্রী দেশ। পূর্ব প্রান্তে রাশিয়া প্রমুখ সমাজতন্ত্রী দেশ। সেকালে যেমন কিপলিং বলতেন পূর্ব আর পশ্চিম কস্মিনকালে মিলবে না একালেও তেমনি একদল সাহিত্যিকের ধুয়ো পূর্ব আর পশ্চিম কোনোদিনই মিলবে না। সেকালে যেমন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন পূর্ব আর পশ্চিম পরস্পরের পরিপূরক, মহামানবের সাগরতীরে তাদের মিলন হবে। একালেও তেমনি আরেক দল সাহিত্যিকের স্বপ্ন পূর্ব আর পশ্চিম তৃতীয় মহাযুদ্ধে নামবে না, তার আগেই মিটমাট করবে। তার লক্ষণ এই সেদিন হেলসিঙ্কি শহরে দেখা গেল। ফরাসি ভাষায় দুটো শব্দ আছে। আঁতাত আর দেঁতাত। মনে রাখবেন, দাঁতাত নয়। চন্দ্রবিন্দুটা প্রথম অক্ষরের মাথার উপরে। আপাতত দুই মহাশক্তির কাম্য দেঁতাত। আঁতাত বহু দূর। মহাশূন্যে সোয়ুজের সঙ্গে অ্যাপোলোর সাযুজ্য এক সুদূরবর্তী সম্ভাবনার আভাস।

রিভাইভালিজম যদি এই পরিবর্তিত পরিবেশে নিশ্বাস নিতে পারে তাহলে মানতে হবে সেএক মহত্তর শক্তি। জোর করে কিছুই বলা যায় না। কে জানত গ্যেটের জার্মানি একদিন নাতসি হবে। হিটলারের দল ক্ষত্রিয়ও ছিল না, বৈশ্যও ছিল না, ব্রাহ্মণ তো ছিলই না। নানা কার্যকারণের যোগাযোগে শূদ্রদেরই এক অংশ অপর অংশের জোটের বিপক্ষে জোট পাকায়। জার্মানিতে কমিউনিস্টরা যদি অত প্রবল না হত নাতসিরাও অত প্রবল হত না। প্রবলের সঙ্গে প্রবলের দ্বন্দ্বে প্রবলতর কে হবে রাজনৈতিক গনতকারদেরও গণনার বাইরে ছিল। শেষমুহূর্তে নাতসিদের দিকেই পাল্লা ভারী হয়। সেটার অন্যতম কারণ বিশুদ্ধ আর্যরক্তে অন্ধ বিশ্বাস আর গভীর ইহুদি বিদ্বেষ। জার্মানির ইহুদিদেরও ছিল বিশুদ্ধ সেমিটিক রক্তে অন্ধবিশ্বাস ও আদিবাসভূমির প্রতি প্রথম আনুগত্য। ভারতেও অনুরূপ কতরকম জটিলতা আছে। চক্রের ভিতরে চক্র। তার ভিতরে চক্র। বুর্জোয়া যাদের বলা হচ্ছে তারাও কি একজোট নাকি? পরস্পরের এত বড়ো শত্রু কি আর আছে? এত যে রাজনৈতিক খুনোখুনি হয়েছে, মেরেছে ও মরেছে কারা? শ্রেণিতত্ত্বে এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। ইডিয়োলজিতে থাকতে পারে। যেমন মেরেছে ও মরছে একই শ্রেণির হিন্দু-মুসলমান। ইডিয়োলজিও একপ্রকার ধর্ম।

সেদিন এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'রেনেসাঁস কি আছে না নেই?' এককথায় উত্তর দেওয়া শক্ত। থাকলে তিনি নিজেই দেখতে পেতেন। দেখতে না পেলে আমার সাক্ষ্যের কী মূল্য। এই পর্যন্ত বলতে পারি যে রামমোহন রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা এখনও শুকিয়ে যায়নি। পরে যদি শুকিয়ে যায় তা হলেও অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো বহমান থাকবে। রেনেসাঁসের ইতিহাসে কাউন্টার রেনেসাঁসও অজানা নয়। পালাবদল হলে ভিতরে ভিতরে মূল্যবোধও বদলে যায়। সকলের সেটা সহ্য হয় না। তারা বিদ্রোহী হয়। বুদ্ধির মুক্তিও অনেকের কাছে ভয়াবহ। তাদের কাছে যুক্তির চেয়ে ভক্তিই শ্রেয়।

ইডিয়োলজি যদি থিয়োলজির স্থান নেয় ও ফিলজফির সঙ্গে একাকার হয়ে যায় বা একাকারত্ব দাবি করে তা হলেও রেনেসাঁস তার তাৎপর্য হারায়। ইতিহাস লিখতে বসে যদি বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতাদের নাম মুছে ফেলা হয় বা ঘটনা চাপা দেওয়া হয় তা হলেও রেনেসাঁস তার গতিপথে বাধা পায়। নিজেদের বানানো আধুনিক পুরাণও পুরাণ। উদ্দেশ্য তার নতুন রাজবংশের মহিমাকীর্তন ও অভিনব ধর্মপ্রচার। প্রকৃত ইতিহাসের মর্মোদ্ধার ভাবীকালের ঐতিহাসিকদের পক্ষে দুরূহ হবে, যদি সরকারি ইতিহাস ভিন্ন আর কোনো

ইতিহাস প্রকাশিত না হয়। বিপ্লবোত্তর দেশগুলির বৈজ্ঞানিক প্রগতি বিস্ময়কর। তার জন্যে আমরা তাদের টুপি খুলে অভিবাদন জানাব। কিন্তু ফিলসফি ও থিয়োলজি যদি আবার একাকার হয়ে যায় তবে আমরা আবার মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন যুগে ফিরে যাব। তেমনি পুরাণ ও ইতিহাস যদি আবার অভিন্ন হয়ে যায় তা হলে আবার আমরা চার শতাব্দী পিছু হটব। বিজ্ঞান ও টেকনোলজি টানতে থাকবে সামনের দিকে আর থিয়োলজি ও পুরাণ পেছনের দিকে—এই দোটানার মধ্যে পড়ে শিক্ষিত মানস দিশাহারা হবে।

বুর্জোয়া আধিপত্য যাবার মুখে। মরা ঘোড়াকে চাবুক মেরে হাতের সুখ খুব বেশিদিন থাকবে না। তখন প্রশ্ন উঠবে, কোন সত্যের উপরে নতুন রেনেসাঁস প্রতিষ্ঠিত হবে? সেকি কেবল বিজ্ঞানের সত্য? টেকনোলজির সঙ্গে দর্শনের সত্য নয়? ইতিহাসের সত্য নয়? এসব ক্ষেত্রে কি থিয়োলজি ও পুরাণ আবার জমিয়ে বসবে? আর্টের সত্যও আরও একপ্রকার সত্য। ধর্মপ্রচার বা তত্ত্ব প্রচার তার কর্ম নয়। শিল্পীকে তার প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা না দিলে যা সেসৃষ্টি করবে তা স্বকীয়তাহীন ফরমায়েশি সৃষ্টি। সৃষ্টি নয় সৃষ্টির অপলাপ। এর লক্ষণ দেশে দেশে দেখা যাচ্ছে। এদেশেও দেখা যেতে পারে, যদি-না কতক শিল্পী স্বাধীনতা রক্ষা করেন।

যাঁদের বিশ্বাস বুর্জোয়া আমলে রেনেসাঁস হতে পারে না, বহু দেশ ও ইতিহাস তাঁদের অপূর্ব সুযোগ দিয়েছে। সমাজতন্ত্রী আমলের নতুন এক রেনেসাঁস-এর জন্যে পটভূমিকা এখন প্রস্তুত। উঠোনকে দোষ দেওয়া এ জমানায় আর চলবে না। এখন দেখাতে হবে নাচ। সেনাচ যারা দেখবে তারা একবাক্যে সাধুবাদ দিয়ে বলবে, 'কোথায় লাগে শেক্সপিয়র, গ্যেটে।' দেখাতে না পেরে সোভিয়েট রাশিয়াও বুর্জোয়া রাশিয়ার সাহিত্যের প্রতি সশ্রদ্ধ হয়েছে। ডস্টয়েভস্কি ও চেকভের উপর থেকে নিষেধ উঠে গেছে। টলস্টয়কে সকলেই মান্য করে। গোর্কিকে টুর্গেনেভের চেয়ে উচ্চতর স্থান দেয় না। রসের মূল্য, রূপের মূল্য বোঝে। কিন্তু এঁদের প্রতি সুবিচার যেমন আনন্দের বিষয় জীবিতদের প্রতি সুবিচারও তেমনি কাম্য। বোধ হয় জিনিসটাই শর্তাধীন। শর্তটা হচ্ছে মরণোত্তর কালোত্তীর্ণতা। কালজয়ীর সঙ্গে কে না চায় আত্মীয়তা দাবি করতে!

ইতিহাস পরাধীন ভারতকে যে সুযোগ দেয়নি স্বাধীন ভারতকে তা দিয়েছে। স্বাধীন ভারতের শ্রমিক কৃষক শ্রেণিকে যে সুযোগ দেয়নি পরে সমাজতন্ত্রী জমানায় তা দেবে। যারা প্রায় তিন হাজার বছর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের দাপটে মাথা তুলতে ও মুখ খুলতে পারেনি তাদের মধ্যে নিহিত রয়েছে অক্ষত সম্ভাবনা। তাদের মতো আমিও চাই তাদের সেই নিহিত সম্ভাবনাসমূহের পরিপূর্ণ প্রকাশ ও বিকাশ। মতভেদ শুধু এইখানে যে, সেটা কি ইংল্যাণ্ডের মতো ধীরে ধীরে বিবর্তনসূত্রে হবে না রুশ-চীনের মতো রাতারাতি বিপ্লবসূত্রে হবে? যদি বিপ্লবসূত্রে হয় তবে গান্ধীপন্থায় অহিংসভাবে হবে না লেনিনপন্থায় সহিংসভাবে হবে? সেটা যে সূত্রেই হোক, যেভাবেই হোক, ইতিহাসের গতি সেই অভিমুখে। একটা কথা আছে, অন্ধস্য বামা গতি। কথাটা বোধ হয় সমাজের বেলাও খাটে। সমাজেরও বাম দিকে গতি। বামাই সমাজের গতি। শূদ্র জাগরণ ও নারী জাগরণ স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে আরও ব্যাপকভাবে দেখব।

কিন্তু যেটা দেখতে চাই সেটা কেবল ক্ষমতার বামা গতি নয়, কেবল বিত্তের বামা গতি নয়, জ্ঞানেরও বামা গতি, রসেরও বামা গতি, রূপেরও বামা গতি। কেবল বিজ্ঞানের বামা গতি নয়, সংস্কৃতির বিবিধ বিভাগেরও বামা গতি। এখন আর উঠোনের দোষ নয়, নাচবে যারা তাদেরই দোষ। নতুন একটা রেনেসাঁসের জন্যে পটভূমিকা প্রস্তুত হচ্ছে, কিন্তু পটভূমিকাই তো সব নয়। কোথায় সেইসব শিল্পী ও দার্শনিক, রসিক ও ভাবুকের সমাবেশ যাঁদের বাদ দিয়ে রেনেসাঁস যেন ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট! হয়তো এখনও সময় হয়নি। বুর্জোয়ারা মঞ্চ জুড়ে রয়েছেন বলেই বোধ হয় তাঁরা মঞ্চে প্রবেশ করছেন না। সত্য-মিথ্যা বোঝা যাবে আরও বিশ-ত্রিশ বছর অতীত হলে।

সেরেনেসাঁস সত্য হলে এ রেনেসাঁস মিথ্যা হয়ে যাবে না। সেটা হবে এই নি:শেষিতপ্রায় রেনেসাঁসের নবপর্যায়। নবপর্যায়ের স্বরূপ এখন থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেটা যেন নিছক শ্রেণিবিদ্বেষে বা শ্রেণিগরিমায় পর্যবসিত না হয়। রেনেসাঁসের মঞ্চে যাঁরাই প্রবেশ করবেন তাঁদেরই দেখাতে হবে উচ্চাঙ্গের

নাটক। যাত্রা বা প্রহসন নয়। তাঁদেরও লিখতে হবে ক্ল্যাসিক। তাঁদেরও হতে হবে তত্ত্বদর্শী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতন্দ্র সন্ধানী হতে হবে তাঁদেরও। ইতিহাসকে আর দর্শনকে পুরাণ আর থিয়োলজির সঙ্গে একাকার করবেন না তাঁরাও। কোনটা যুক্তিসহ আর কোনটা ভক্তিপ্রবণ এই পার্থক্যবোধ তাঁদেরও থাকবে। পূর্ব ও পশ্চিম যেমন পরস্পরের পরিপূরক, প্রাচীন ও আধুনিক যেমন পরস্পরের পরিপূরক, তেমনি সেই রেনেসাঁসও হবে এই রেনেসাঁসের পরিপূরক।

একবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের নায়ক হবেন যাঁরা তাঁরাও অনুভব করবেন যে জীবনের যেকোনো বিভাগে নতুন কোনো কাজ দেখাতে হলে তার আগে চাই চিন্তার ও কল্পনার স্বাধীনতা, নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের স্বাধীনতা, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের স্বাধীনতা, বাক্যের ও প্রকাশের স্বাধীনতা, বিচারের ও বিবেকের স্বাধীনতা। সব স্বাধীনতার মূল প্রত্যয় ব্যক্তিসত্তার পরম মূল্য। ব্যক্তি আবার কে? সমাজই তো সব। ব্যক্তি আবার কে? রাষ্ট্রই তো সব। ব্যক্তি আবার কে? নেশনই তো সব। ব্যক্তি আবার কে? আর্যরক্ত বা সেমিটিক রক্তই তো সব। ব্যক্তি আবার কে? শ্রেণিই তো সব। এই যে ব্যক্তিবিরোধী সমষ্টিসর্বস্ব মনোভাব এ যদি থাকে তো রেনেসাঁস থাকে না। ক্ষণবিদ্যুতের মতো তার চোখ-ধাঁধানো দীপ্তি সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। ইলেকট্রিকের বাতির মতো রাতদিন জ্বলে না। রেনেসাঁস ব্যক্তিসত্তাকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করে। ব্যক্তিই দিয়ে যায় নতুন ভাবনা নতুন রস, নতুন ধ্যান নতুন রূপ। বুদ্ধ বা যিশু, হোমার বা কালিদাস, কনফুসিয়াস বা প্লেটো, হিপোক্রেটিস বা চরক, আভিসেনা বা গালিলিয়ো, শেক্সপিয়ার বা মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, ভলতেয়ার বা রুশো, মার্কস বা ফ্রয়েড, আইনস্টাইন বা গান্ধী, এঁদের প্রত্যেকেই এক একজন ব্যক্তি। যদিও সমাজের থেকে বা স্বজাতির থেকে বিচ্ছিন্ন নন।

ষোড়শ শতাব্দীর রেনেসাঁস রাতারাতি কোনো বিপ্লব বা বিদ্রোহ ঘটায়নি, কিন্তু ব্যক্তির উপর যে মূল্য আরোপ করেছে তার থেকে এসেছে প্রচলিত মূল্যরাজির পরিবর্তন ও বিবর্তন। স্থলে স্থলে সেপরিবর্তন বৈপ্লবিক হয়েছে। বৈপ্লবিক যে সর্বত্র হবেই তেমন কোনো কথা ছিল না। বৈপ্লবিক যে কোথাও হবে না এমন কোনো কথাও কি ছিল? তবে পুরাতন মূল্য একবার বদলাতে শুরু করলে কতদূর বদলাবে তা কেউ গণনা করে বলতে পারে না। পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের নায়করাও জানতেন না যে তাঁরা বিজ্ঞানের সত্য নির্ণয় করতে গিয়ে লোকের বদ্ধমূল সংস্কারে ঘা দিচ্ছেন ও তার ফলে চার্চ তার অথরিটি হারাচ্ছে। রেনেসাঁস বলে একটা অধ্যায় না থাকলে এনলাইটেনমেন্ট বলে আর একটা অধ্যায় থাকত না, সেটা না থাকলে পরে ফরাসি বিপ্লব বলে আরও একটা অধ্যায় থাকত না, সেটা না থাকলে আরও পরে রুশ বিপ্লব বলে আরও একটা অধ্যায় থাকত না। এই যে পারম্পর্য, এর মধ্যে শিল্পবিপ্লবও পড়ে। যারা একপ্রকার বিপ্লব এড়িয়েছে তারা আরেকপ্রকার বিপ্লব এড়াতে পারেনি।

কিন্তু অদৃষ্টের এমনই বিড়ম্বনা যে ব্যক্তির মূল্যটাই সমাজের বা দেশের বা রাষ্ট্রের বা নেশনের বা শ্রেণির দৃষ্টিতে খর্ব হয়েছে। মন্ডলী বা দলগঠন করতে না পারলে ব্যক্তি যেমন দুর্বল ছিল তেমনি দুর্বল কিংবা তার চেয়েও অসহায়। তাই সংকটকালে স্মরণ করতে হয় সেই সনাতন ভগবানকে।

ভগবানকে স্মরণ করলে আবার তর্ক ওঠে, এ কেমনতরো মানবিকবাদ যে ভগবানকে স্বীকার করে? রেনেসাঁসের সময় থেকেই মানবিকবাদ বা হিউম্যানিজম কথাটির চল হয়েছে। বস্তুটি বৌদ্ধ ও বাউলদের মধ্যেও ছিল। ছিল প্রাচীন গ্রিকদের মধ্যেও। তবে ভক্তিমূলক ধর্মেও প্রবল প্লাবনে মানবিকবাদ ছিল মজ্জমান। এবার এল দর্শননির্ভর মানবিকবাদ। দর্শনও হল বিজ্ঞাননির্ভর। বিজ্ঞানও হল নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণনির্ভর। অতীন্দ্রিয় বা অতিপ্রাকৃতের জন্যে মনের দরজা-জানালা খোলা রইল না। ভগবান তাহলে আসবেন কোন পথ দিয়ে? লাইব্রেরি, লেবরেটরি, অবজার্ভেটরি কোন আঙিনা দিয়ে?

তা বলে মানবিকবাদীরা সকলেই কিন্তু নিরীশ্বরবাদী নন। এক ভাগ এখনও ঈশ্বরবাদী। অপরাপর ভাগ নিরীশ্বরবাদী বা অজ্ঞেয়বাদী। মানবিক জিজ্ঞাসার মধ্যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও কি পড়ে না? মানুষের কি কেবল ইন্টেলেক্ট আছে, ইনটুইশন নেই? চোখ দিয়ে সব কিছু দেখা যায় না বলে টেলিস্কোপ ও মাইক্রোস্কোপ

লাগে। দূরের চেয়ে কি আরও দূর নেই? সূক্ষ্মের চেয়ে কি আরও সূক্ষ্ম নেই? সীমার বাইরে কি অসীম নেই? দৃশ্যমানের অন্তরালে কি অদৃশ্য নেই? সব জিজ্ঞাসার মীমাংসা যুক্তি দিয়ে হয় কি? তাই মানবিকবাদীরা সবাই রেনেসাঁস থেকে প্রেরণা লাভ করলেও ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক যাঁরা ছেদ করেননি তাঁরাও মানবিকবাদী। হিউম্যানিস্ট অথচ খ্রিস্টান এই যাঁদের পরিচিতি তাঁদের সংখ্যাও অল্প নয়।

রেনেসাঁস যদি খাস ইউরোপেও নি:শেষিত হয়ে এসে থাকে তবে তা বুর্জোয়া শ্রেণির শ্রেণিসত্তার ঐতিহাসিক প্রয়োজন ফুরিয়ে আসার জন্যই কি? না তার অন্য কোনো কারণ আছে? এমনও তো হতে পারে যে রেনেসাঁস মানুষকে প্রকৃতি মন্থন করার যে শক্তি দিয়েছে তার অতিপ্রয়োগ বা অপপ্রয়োগের ফলে অমৃতের সঙ্গে সঙ্গে গরলও উঠছে, কিন্তু সেগরলকে ধারণ করার জন্যে কোনো নীলকণ্ঠ নেই। আকাশ বাতাস জল স্থল সব বিষিয়ে গেছে। যেখানে যায়নি সেখানেও যাবে। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী রেনেসাঁসের পক্ষে অনুকূল নয়। হিংসা যে মানুষের ইতিহাসে নতুন তা নয়, কিন্তু এমন নির্বিবেক হৃদয়হীন নৈর্ব্যক্তিক হিংসা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে লক্ষিত হয়নি। তৃতীয় মহাযুদ্ধে এর পরাকাষ্ঠা ঘটবে, যদি-না মদমত্ত মানুষ স্বেচ্ছায় অস্ত্রত্যাগ করে। তা যদি সেকরে তবে সেটা হবে একটা নৈতিক বিপ্লব। তখন দেখতে পাওয়া যাবে মানুষ কত উচ্চে উঠতে পারে। মানুষের নৈতিক সত্তা রেনেসাঁসের সঙ্গে বেখাপ নয়। বরং বলা যেতে পারে রেনেসাঁসের জন্যেই ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ হল। বিশ্বমানবের সেই নৈতিক সত্তা একদিন তাকে অস্ত্রত্যাগেরও প্রবর্তনা দেবে।

যেসব মূল্য মরা পাতার মতো আপনি ঝরে পড়ছে সেসব পুরাতন মূল্যকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকলে নতুন মূল্যগুলিকে তাদের প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। ভালো-মন্দের কষ্টিপাথরে তাদের সব ক-টিই হয়তো সোনা নয়, তা হলেও তাদের পরখ করতে হবে ও যতক্ষণ না তারা মন্দ বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে ততক্ষণ তাদের জন্যে মনটাকে খোলা রাখতে হবে। এই খোলামন না হলে রেনেসাঁস হয় না। খোলা মন যেমন অত্যাবশ্যক, খোলা সমাজও তেমনি। আমাদের মধ্যযুগে না ছিল খোলা মন, না ছিল খোলা সমাজ। আধুনিক যুগের মহিমাই এইখানে যে মন এখন খোলা, সমাজ এখন খোলা। কিন্তু আবার যদি পুনরুজ্জীবনের নামে বা স্বয়ংসম্পূর্ণতার নামে বা বিপ্লবের নামে খোলা সমাজ বন্ধ হয়ে যায় তা হলে আধুনিক যুগের আধুনিকতা বলতে যা অবশিষ্ট থাকবে তা ওই নামটা। গুণগত আধুনিকতা কোথায় মিলিয়ে যাবে।

গুণগত আধুনিকতা প্রাচীন সংস্কৃতিকেও সম্মান করে। মধ্যযুগের সংস্কৃতিকেও শ্রদ্ধা করে। পুরাতন ক্লাসিক বা পুরাতন ক্যাথিড্রাল বা পুরাতন মন্দির বা পুরাতন মন্দির বা পুরাতন মসজিদ আধুনিকতাবাদীদেরও প্রিয়। মানবিকতাবাদীদের যে ভাগটি নিরীশ্বরবাদী সেভাগটিও পুরোনো মদ ভালোবাসে। সেইসঙ্গে পুরোনো ছবি বা মূর্তি। এমন কালাপাহাড় একালে কেউ নেই যে অসত্য বা অশুভ বলে কীর্তি ধ্বংস করবে। মানব বিবর্তন একের পর এক যেসব অতিক্রম করে এতদূর এসেছে তার প্রত্যেকটি অধ্যায়ের ধ্বংসাবশিষ্ট সম্পদ সযত্নে সংরক্ষণ করা হচ্ছে ভাবীকালের জন্যে। উত্তরপুরুষ যাতে পূর্বপুরুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুত না হয়। মাঝে মাঝে ধারাভঙ্গ ঘটেছে। তা সত্ত্বেও ধারাবাহিকতার সন্ধান চলেছে। সেটা হয়তো পাওয়া যাবে কারিগর শ্রেণির কারুশিল্পে। হরপ্পা মহেঞ্জোদরো থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত এদেশের লোকের উপজীব্য কৃষি ও কারুশিল্প। এই নিয়ে যারা ছিল ও আছে তাদের সৃষ্ট লোকগীতি, লোকগাথা, রূপকথা, কিংবদন্তি, প্রবাদবচন প্রভৃতির মধ্যে কি একটি ধারাবাহিকতা মেলে না? আমার তো মনে হয় মৃৎশিল্প, দারুশিল্প ও শিলাশিল্পর মধ্যেও তা মেলে। আমাদের দৃষ্টি সাধারণত লোকসংস্কৃতির বা লোকশ্রুতির উপর পড়ে না। তার সম্যক চর্চা থেকেও নতুন একটা রেনেসাঁস ঘটতে পারে। সেটা জনমানসের রেনেসাঁস।

সম্ভবত সেই নতুন রেনেসাঁস বাইরে থেকে নয়, উপর থেকে নয়, অতীত থেকে নয়, তল থেকে আসবে। তল থেকে আসাও ভিতর থেকে আসা। তার দিকে আমি তো আমার একটা হাত বাড়িয়েই রেখেছি।

বাংলার রেনেসাঁস : পুনর্ভাবনা

ইংরেজরা যখন এদেশে বাণিজ্য করতে আসে তার আগেই তারা রেনেসাঁসের ভিতর দিয়ে গেছে ও তখন রিফর্মেশনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ ক্যাথলিক থেকে প্রোটেস্টান্ট হয়ে উঠছে। বাণিজ্য করতে এসে রাজত্ব যখন হাতে পায় তার আগেই তাদের দেশে এনলাইটটেনমেন্ট শুরু হয়ে গেছে ও তখন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন শুরু হয়ে যাচ্ছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আরও দুটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে। আমেরিকার স্বাধীনতা ও ফরাসি বিপ্লব। এ দুটির সঙ্গেও এদেশের ইংরেজরা জড়িয়ে পড়ে। বস্টন টি-পার্টির চা যায় কলকাতা থেকে বস্টনে। আর এদেশের ফরাসি অধিকৃত অঞ্চলগুলির উপর ব্রিটিশ পতাকা ওড়ে।

তুর্ক আফগান মোগলের পরে নতুন একদল বিদেশি এসে এদেশের ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করল। কিন্তু এটাই একমাত্র সত্য নয়। তাদের জীবনকে অবলম্বন করে বইতে লাগল ইউরোপের ইতিহাসের বহমান স্রোত। রেনেসাঁস, রিফর্মেশন, এনলাইটেনমেন্ট। আমেরিকার স্বাধীনতা তথা ফরাসি বিপ্লব। আমেরিকার স্বাধীনতাকেও বিপ্লব বলা হয়। তা হলে যুগলবিপ্লব। এদেশের মানসেও তাঁর পরশ লাগল।

সুদূর ইউরোপ থেকে জাহাজ আসে। গঙ্গার ঘাটে নামিয়ে দেয় ইংরেজি ভাষায় লেখা বইপত্র। নাটক উপন্যাস কাব্য প্রবন্ধ। রাজনীতি অর্থনীতি দর্শন বিজ্ঞান সন্দর্ভ। ইংরেজদের ঘরে ঘরে ক্লাবে ক্লাবে বইপত্র জমে ওঠে। কিছু কি বাঙালিদের নজরে পড়ে না? ইংরেজদের জন্যে থিয়েটার গড়ে ওঠে। বাঙালিরা কেউ কি টিকিট কেটে অভিনয় দেখতে যায় না? ইংরেজদের জন্যে পাশ্চাত্য পদ্ধতির সুরম্য হর্ম্য নির্মিত হয়। বাঙালি অভিজাতরা কেউ কি অনুকরণ করেন না? ইংরেজদের জন্য আমদানি হয় ঘোড়ার গাড়ি। বাঙালি বড়োলোকরা কেউ কি কেনেন না? ইংরেজদের জন্য আমদানি বা তৈরি হয় পাশ্চাত্য ধরনের আসবাব। শৌখিন বাঙালিরা কেউ কি তা দিয়ে ঘর সাজান না? অলক্ষিতে বাঙালির জীবনেও ইউরোপের স্রোত সঞ্চারিত হয়। সেইউরোপ মধ্যযুগীয় নয়, আধুনিক। তাকে আধুনিক করে তুলেছে রেনেসাঁস, রিফর্মেশন, এনলাইটেনমেন্ট, আমেরিকান তথা ফরাসি বিপ্লব। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেই কলকাতা শহরের পত্তন। সারা অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে বিলিতি জাহাজের আনাগোনা। লণ্ডনের মানসলোক কলকাতায় প্রভাব বিস্তার করে। বাঙালিদের কেউ কি সেই মানসলোকের প্রভাব অনুভব করেনি?

আমার মনে হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বাংলার নবজাগরণের উন্মেষ ঘটেছিল, যদিও তার সমসাময়িক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলারা সংস্কৃতচর্চা করতেন, ফারসিচর্চা করতেন, সেইসঙ্গে বাংলাচর্চাও করতেন। বাঙালি কারিগরকে দিয়ে বাংলা হরফও তৈরি করিয়েছিলেন। বাংলার প্রতি এই মনোযোগ থেকে প্রণীত হয় হ্যালহেডের ব্যাকরণ। কোম্পানির আমলাদের ভাষাচর্চা খ্রিস্টীয় মিশনারিদের মতো ধর্মীয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়। তাঁরা হিউম্যানিস্ট। মানুষ সম্পর্কিত যেকোনো ব্যাপারে তাঁর ঔৎসুক্য। স্যার উইলিয়াম জোন্সের অনুবাদকর্ম সেই ঔৎসুক্যের থেকে সঞ্জাত। হিউম্যানিস্ট বলেই তিনি ইণ্ডোলজিস্ট। আর হিউম্যানিজম তো রেনেসাঁসের সঙ্গে ওতপ্রোত।

খ্রিস্টীয় মিশনারিদের ব্রিটিশ ভারতে আসা নিষিদ্ধ ছিল। তাঁদের আসতে দেন শ্রীরামপুরের দিনেমার কতৃপক্ষ। সেইখান থেকেই তাঁরা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ ছেপে বার করেন। উদ্দেশ্যটা রেনেসাঁসের দ্যোতক নয়, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পুস্তক প্রকাশ রেনেসাঁসের সহায়ক। তাঁরা এর পরে সংবাদপত্রও প্রকাশ করেন বাংলায়। তাতে থাকে নানা দেশের বিচিত্র বিবরণ। প্রথম প্রসঙ্গটাই ছিল আমেরিকা বলে এক অজানা ভূখন্ডের। ধর্মপ্রচার যদিও মূল উদ্দেশ্য তবু বৃহত্তর জগতের জ্ঞান পরিবেশনও কর্তব্য। মানুষকে মানুষের জীবন সম্পর্কে সচেতন করা হিউম্যানিজমের আওতায় পড়ে। মিশনারিরা সেদিক থেকে হিউম্যানিস্ট। তাঁরা যেসব বিদ্যালয় স্থাপন করেন সেসব বিদ্যালয়ে ভূগোল, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি যুগোচিত বিদ্যার প্রচলন ছিল। যারা খ্রিস্টান নয় ও হবে না তাদের কাছেও ছিল

সেসব বিদ্যাসত্র অবারিত। কোম্পানির সরকার ভারতীয় বিদ্যার্থীদের জন্য ততখানি উদ্যোগী ছিলেন না যতখানি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত খ্রিস্টীয় মিশন। এঁরা পরে ব্রিটিশ ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ পান। কেরি সাহেবের সহযোগিতায় কোম্পানির আমলের রাজকর্মচারীদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হয়ে ওঠে বাংলা, হিন্দি, উর্দু প্রভৃতি ভার্নাকুলারের গদ্যসাহিত্যের আঁতুড়ঘর।

ইটালি, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের রেনেসাঁসের অন্যতম কর্ম ছিল ইটালীয়, ফরাসি, ইংরেজি প্রভৃতি ভার্নাকুলারের গদ্যসাহিত্য সৃষ্টি। মাতৃভাষা তাদের বেলা ল্যাটিন গ্রিক নয়। এদেশের বেলা সংস্কৃত আরবি ফারসি নয়। ভার্নাকুলার আগে ছিল অবজ্ঞাসূচক। রেনেসাঁসই তাকে মর্যাদা দেয়। তবে জার্মান গদ্যসাহিত্যের সূচনা রিফর্মেশন থেকে। মার্টিন লুথারই জার্মান গদ্যের জনক। আবার জার্মানরাই সর্বপ্রথম তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ল্যাটিনের জায়গায় জার্মান মাধ্যম প্রবর্তন করে।

রেনেসাঁস ও রিফর্মেশন একই জিনিস নয়। রিফর্মেশন হল খ্রিস্টধর্মের সংস্কার। আর সেনেসাঁস হল পরলোকের বা পরকালের বা অতিপ্রাকৃতের স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে ইহলোকের তথা প্রকৃতির মধ্যে মানবজীবনের পরিপূর্ণতার অন্বেষা। মানুষ এই জগতের নিয়মগুলো জেনে নিয়ে এই জগতেই উন্নতির চরম শীর্ষে উত্তীর্ণ হতে পারে। যেমন হয়েছিল প্রাচীন গ্রিকরা। কত উন্নত ছিল তাদের কাব্য নাটক দর্শন বিজ্ঞান। তাদের নাট্য নৃত্য ভাস্কর্য স্থাপত্য! রেনেসাঁস ধর্ম বা খ্রিস্ট বা ঈশ্বরকে বাদ দিতে চায়নি। যা চেয়েছে তা নতুন করে ভাববার স্বাধীনতা, আঁকবার স্বাধীনতা, গড়বার স্বাধীনতা, করবার স্বাধীনতা। এতখানি স্বাধীনতা খ্রিস্টীয় সংস্কারকরা সহ্য করতেন না। তাই রিফর্মেশন আর রেনেসাঁসের মধ্যে একটা তফাত ছিল। ক্রমে ব্যবধান হ্রাস পায়।

এদেশের রেনেসাঁসের মূলে গ্রিস রোম নয়, ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স। ইংরেজ ফরাসিরা এদেশে না এলে এদেশের রেনেসাঁস ভিতর থেকে ঘটত না। সংস্কৃত বা পারসিক শিক্ষা থেকেও নয়। তার জন্যে আমাদের বিদ্যার্থীদের ইউরোপ যেতে হত। সংস্কৃত বা পারসিকচর্চা এদেশে একদিনের জন্যেও বন্ধ হয়নি। সেই উৎস থেকে রেনেসাঁস প্রবাহিত হলে বহু পূর্বেই প্রবাহিত হত। মানতেই হবে যে তার জন্যে ইংরেজ ফরাসির প্রয়োজন ছিল। ইংরেজির তুলনায় ফরাসিচর্চা সামান্যই হয়। ইংরেজরা না হয়ে ফরাসিরা আমাদের শাসক হলে আরও বেশি ফরাসিচর্চা হত। রেনেসাঁসের পক্ষে সেটাও হত অনুকূল। রামমোহন, দ্বারকানাথ, মধুসূদন তিন জনেই ইংল্যাণ্ডে তথা ফ্রান্সে যান। মধুসূদন তো ফরাসি সহধর্মিণীর সঙ্গে ফ্রান্সে বসবাস করেন।

তা বলে আমাদের মনীষীরা কেউ প্রাচীন গ্রিস বা প্রাচীন রোমে তাঁদের শিকড় খুঁজতে যাননি। শিকড় তাঁদের এই দেশের অতীতেই। ইলিয়াডে ওডিসিতে নয়, রামায়ণ মহাভারতেই। তবে ইলিয়াড না পড়লে *মেঘনাদবধ* লেখা যেত না। তার জন্যে শুধুমাত্র রামায়ণ পড়াই যথেষ্ট ছিল না। আমাদের রেনেসাঁস প্রাচীন ভারতের সঙ্গেও একপ্রকার ধারাবাহিকতা ফিরে পায়। ইউরোপের রেনেসাঁস যেমন ফিরে পেয়েছিল প্রাচীন গ্রিস রোমের সঙ্গে ধারাবাহিকতা। প্রাচীন ভারতের পুনরাবিষ্কারে ইউরোপীয় ভারততত্ত্ববিদদের কাছে আমাদের ঋণ অশেষ। গোটা বৌদ্ধ যুগটাই তো হারিয়ে গেছিল। কেই-বা মনে রেখেছিল মৌর্যসম্রাট অশোককে। কিংবা কুষাণসম্রাট কনিষ্ককে! কিংবা মহাকবি অশ্বঘোষকে! কিংবা বৌদ্ধ জাতককে! অনবদ্য ভাস্কর্য অবহেলিত অজ্ঞাত অবস্থায় পড়ে রয়েছিল। আমাদের রেনেসাঁস বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান বাদ দিয়ে কেবল ব্রহ্মণ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবলম্বন করতে গেলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এর জন্যে চীন জাপান তিব্বতের দিকে তাকাতে হবে। সেসব দেশে সংরক্ষিত হয়েছে আমাদের বৌদ্ধ উত্তরাধিকার।

অথচ আমাদের রেনেসাঁস বৌদ্ধ উত্তরাধিকার সমন্ধে অজ্ঞ বা উদাসীন বললে চলে। ব্যতিক্রম কেবল রবীন্দ্রনাথ ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যতদূর মনে পড়ে। বৈদিক ধারাটাই প্রাচীন ভারতের একমাত্র ধারা ছিল না। কিন্তু বৌদ্ধ ধারা শুকিয়ে যাওয়ায় বা খাত বদল করে তিব্বতে চীনে জাপানে প্রবাহিত হওয়ায় বৈদিক ধারাই হয় একমাত্র বহমান ধারা। এর থেকে যতখানি উর্বরা হওয়া সম্ভব ততখানি উর্বর হয়েছে আমাদের সাহিত্যের ও দর্শনের খেত। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ফলন লক্ষ করা যায়নি। যাকে আমরা হিন্দু

ঐতিহ্য বলি তার ঝোঁকটা যুক্তির দিকে নয়, বিশ্বাসের দিকে। তাই আমাদের দার্শনিকরা ফিলসফি আর থিয়োলজির পার্থক্য মানেন না। ধর্মগ্রন্থও তাঁদের কাছে দার্শনিক গ্রন্থ। তেমনি, আমাদের ঐতিহাসিকদের কাছে পুরাণে ইতিহাসে প্রভেদ নেই। রামায়ণ মহাভারতও তাঁদের কাছে ইতিহাসের মর্যাদা পায়। তেমনি, আমাদের শিক্ষিতজনের কাছে জ্যোতিষ আর জ্যোতির্বিজ্ঞান অভিন্ন।

প্রাচীন গ্রিসের সঙ্গে ধারাবাহিকতা পুনঃস্থাপন না করলে ইউরোপের রেনেসাঁস সম্ভব হত না। তা বলে কি কেউ প্রাচীন গ্রিসকেই পুনরুজ্জীবিত করার কথা ভেবেছেন বা বলেছেন? রেনেসাঁসের অন্য নাম রিভাইভাল নয়। অথবা রিভাইভালের নামান্তর রেনেসাঁস নয়। রেনেসাঁসের দৃষ্টি সম্মুখের দিকে। তার সামনে অনন্ত ভবিষ্যৎ। অতীত তার তুলনায় কতটুকু! অপরপক্ষে রিভাইভালের দৃষ্টি পশ্চাৎ দিকে। সেপদে পদে অতীতের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চায়। যেন অতীতেই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে তার ভবিষ্যৎ। অতীতকে অতিক্রমণের স্বাধীনতা নেই। যেন অতীতই অভ্রান্ত।

আমাদের রেনেসাঁস বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যবয়স থেকে প্রাচীন ভারতের পুনরুজ্জীবনের দিকে মোড় ঘোরে। ততদিনে সিপাহিবিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে বিদেশি শাসকের সংহারমূর্তি উদঘাটিত হয়েছে। স্বদেশি শিল্পের বিনাশফলে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ যান্ত্রিক প্রগতি দিয়ে ঢাকা যায় না। স্বদেশ বনাম বিদেশ এই চিন্তা থেকে উদ্ভূত হয় জাতীয়তাবাদ। কিন্তু গোড়ায় সেটা রূপ নেয় হিন্দু জাতীয়তাবাদের। প্রাচীন ভারতের হিন্দু জাতির পুনরুজ্জীবনই হয় লক্ষ্য। মুসলমানরা তো প্রাচীন ভারতে ছিল না। সুতরাং তাদের বাদ দিয়ে ভাবা হয়। যাদের বাদ দেওয়া হল তারাও চায় পুনরুজ্জীবন। কিন্তু প্রাচীন ভারতের নয়। কারণ সেখানে তারা ছিল না। তারা চায় ইসলামের আদিপর্বের পুনরুজ্জীবন। তাদের বেলা ওটা জাতীয়তাবাদ নয়। প্যান ইসলামিজম। পরবর্তীকালে হিন্দু জাতীয়তাবাদ যখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হয় তখন প্যান ইসলামিজম হয় মুসলিম জাতীয়তাবাদ।

সব দেশেই রেনেসাঁস দেশভিত্তিক অথবা ভাষাভিত্তিক। কোথাও ধর্মভিত্তিক বা সমাজভিত্তিক নয়। পুনরুজ্জীবনবাদীরা বিদেশি বর্জন করতে গিয়ে স্বযুগকেও বর্জন করার পরামর্শ দেন। ফিরে যেতে বলেন প্রাচীন যুগে বা মধ্যযুগে। ফিরিয়ে আনতে চান প্রাচীন যুগ বা মধ্যযুগকে। পরাধীন ও পরশোষিত দেশে রেনেসাঁসের বাণী তার গরিমা হারায়। আগে তো আমরা স্বাধীন ও স্বয়ম্ভর হই, তার পরে হবে রেনেসাঁস। স্বয়ম্ভর বলতে এটাও বোঝায় যে সংস্কৃতিতে স্বয়ম্ভর হতে হবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাদের স্বয়ম্ভরতার অন্তরায়। তাঁদের বিশ্বাস ইংরেজিচর্চা করলে বাংলার উন্নতি হতে পারে না। অথচ হিন্দু কলেজের উদ্যোক্তারা বাংলাকেও ইংরেজির সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করেছিলেন ও ইংরেজি শিক্ষার গোড়া থেকেই বাংলা শিক্ষা ছিল। তার সঙ্গে সংযুক্ত পাঠ্যপুস্তক লেখা হত ইংরেজি, বাংলা, ফরাসি, সংস্কৃত ও আরবি ভাষায়। কলকাতায় স্কুলবুক সোসাইটির রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, জানুয়ারি ১৮৩২ থেকে ডিসেম্বর ১৮৩৩ এই দুই বছরে ইংরেজি বই বিক্রি হয় ১৪,৭৯২ খানা। বাংলা বই ৪,৮৯৬ খানা। ফারসি বই ৮৩ খানা। সংস্কৃত বই ২০৮ খানা। আরবি বই ১৩ খানা। বেশ বোঝা যায় ইংরেজির ঠিক পরে আসর জমিয়ে বসেছে বাংলা। পরাধীনতা ও পরশোষণ তার অন্তরায় হয়নি।

সংস্কৃত সাহিত্য একদা অতি জীবন্ত ছিল, কিন্তু কালক্রমে তার অবস্থা হয় জীবন্মৃতের মতো। তার কাছ থেকে পাবার যা ছিল তা ক্রমে নি:শেষিত হয়, কিন্তু ইংরেজির মারফত পাওয়া ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শন ইতিহাস প্রভৃতির ভান্ডার অফুরন্ত। স্বযুগ স্বদেশের চেয়ে বড়ো। অতীতকে কাঁধে নিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না। বাড়তে পারে না। রেনেসাঁস থেকে যাঁরা অতীতে সরে গেছেন তাঁরাও রেনেসাঁস পরবর্তী বিজ্ঞানের কাছে ঋণী। বিজ্ঞান না হলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অচল। বিশেষত শহর অঞ্চলে। আধুনিক বিজ্ঞান পাশ্চাত্য রেনেসাঁসেরই মানসসন্তানই। এ স্রোতের উজানে যাওয়া নিরর্থক। ধর্মের বেলা সেটা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের বেলা অসম্ভব। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ মহাশূন্য অতিক্রম করে চন্দ্রে পদার্পণ করেছে। মানুষের অসাধ্য কী আছে, যদি সেক্রমাগত অগ্রসর হয়? যদি আপনার অস্ত্রে আপনি নির্মূল না হয়?

মানুষ যে অসাধ্যসাধন করতে পারে এ ধারণা আগেও ছিল, কিন্তু মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে। এখন মন্ত্রতন্ত্রের স্থান নিয়েছে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। তার পেছনে রয়েছে অবশ্য এই প্রতীতি যে মানুষই মানুষের নিয়ন্তা। বাইরের কোনো অলৌকিক শক্তি নয়। প্রকৃতির সমস্ত রহস্য এখনও অধিগত হয়নি, কিন্তু হতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে। মানুষের ভিতরেও রয়েছে অপার সম্ভাব্যতা। সেহতে হতে কী হয়ে উঠবে তা সেনিজেই জানে না। সুপারম্যান হওয়াও অসম্ভব নয়। সেকালে লোকে তপস্যা করত স্বর্গের ইন্দ্র হতে। একালের বিশ্বমানচিত্রে স্বর্গের অবস্থান অজানা। ইন্দ্রের হাতে ছিল বজ্র। তার চেয়েও শক্তিমান হাইড্রোজেন বোমা এখন মানুষের হাতে। আরও শক্তিশালী মারণাস্ত্র এর পরে হাতে আসতে পারে। রেনেসাঁসের পূর্বে বৌদ্ধরা বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ সাধনা করলে বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারে। আর বুদ্ধ যিনি হন তিনি দেবতাদের চেয়েও উর্ধ্বে। দেবত্ব লাভ করাই বড়ো কথা নয়। রেনেসাঁসের পরে হিউম্যানিস্টরা বিশ্বাস করেন যে দেবত্বলাভ বা বুদ্ধত্বলাভও শেষ কথা নয়। শেষ কথা বলে কোনো কথা নেই। ক্রমাগত বিবর্তিত হতে হবে, জগতের পরিবর্তন ঘটাতে হবে, এমন কোনো পরিণতি কাম্য নয় যা অপরিবর্তনীয় বা চিরন্তন।

এসব সত্ত্বেও আজকের দিনের মানুষ আশাবাদী নয়। যতদূর বোঝা যায় পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতল হয়ে আসবে, তুষার দিয়ে ঢেকে যাবে। মানুষ যদি বেঁচে থাকে তো এস্কিমোদের মতো বরফের গুহায় বাস করবে। ভাবনার কথা বই কী। তখন হয়তো মানুষ গ্রহান্তরে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করবে। সারাপৃথিবী তো আজ এখনই উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরু বনে যাচ্ছে না। সামনে হাজার হাজার বছর সময় রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের সামগ্রিক ব্যবস্থা উদ্ভাবনের। প্রাণ এক ফুঁয়ে নির্বাপিত হয় না। এটা অবশ্য বিশ্বাসের কথা।

রেনেসাঁস হল রিয়্যালিটির সঙ্গে পা মিলিয়ে নেওয়া। তা যদি না হয় তো সেটা রেনেসাঁস নয়, সেই নামে অন্য জিনিস। বাংলার রেনেসাঁস কি রিয়্যালিটির সঙ্গে পা মিলিয়ে নিয়েছে? ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত বইপত্র পড়ে যাঁদের জ্ঞানোদয় হয় তাঁরা ধর্মে ও সমাজে ঘোর রক্ষণশীল হলেও বাস্তব জগতের স্বরূপ জানতে সংস্কারকদের মতোই উৎসুক ছিলেন। হিন্দু কলেজের সনাতনী উদ্যোক্তারা স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্টকে যা বলেন তা হাইডের পত্রে বর্ণিত হয়েছিল এইভাবে—

> The principal objects proposed for their adoption had been cultivation of the Bengalee and English languages in particular. The Hindustanee tongue as convenient in the Upper Provinces, and the Persian if desired as ornamental. General duty to God. The English system of morals (the Pundits and some of the most sensible of the rest deplored their national deficiency in morals), Grammar Writing in English (as well as Bengalee), Arithmetic (this is one of the Hindu virutes), History, Geography, Astronomy, Mathematics, English Belles Letters, Poetry as the fund increases. (Sir Edward Hyde East's letter to the Earl of Buckinghamshire, dated, Calcutta, 7 May 1816).

লক্ষণীয় এই যে বিষয়তালিকায় সংস্কৃতের উল্লেখ ছিল না। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা হিন্দু। তারাই তাহলে সংস্কৃতবর্জিত শিক্ষালাভ করবে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় বেসরকারি উদ্যোগে। সরকার তার দায়িত্ব নিতে নারাজ। পরে সরকারি উদ্যোগে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে সমাজসংস্কারক রামমোহন রায় লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লেখেন তার সার কথা এইরূপ :

> Rammohan's chief arguments were the Sanskrit learning resembled the pre-Baconian scholastic learning of medieval Europe ; he apprehended that the plan to establish a Sanskrit College could 'only be expected to lead the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors or to society.' He therefore made a fervent appeal to the Government to 'promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing mathematics, natural philosophy,

chemistry and anatomy with other useful sciences which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen with talents and learning educated in Europe, and providing a College furnished with the necessary books and instruments and other apparatus.' This remarkable letter was forwarded by Lord Amherst to the Committee for Public Instruction for its consideration. But the Committee dominated by the 'Orientalists' seemed to ignore it. Social Ideas and Social Change in Bengal, 1818-1835 by Dr A. F. Salahuddin Ahmed, pp 159-60)।

হিন্দুরা সংস্কৃত চায় না, চায় পাশ্চাত্য বিদ্যা। ইংরেজরা পাশ্চাত্য বিদ্যা শেখাতে চায় না, শেখাবে সংস্কৃত। আজ আমাদের কাছে এটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু গত শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে এটাই ছিল শিক্ষার অবস্থা এবং ব্যবস্থা। তৃতীয় দশকে মেকলে এসে পাশ্চাত্য বিদ্যার পক্ষে মত দেন। পাশ্চাত্য বিদ্যার বাহন হয় প্রথমত ইংরেজি, দ্বিতীয়ত বাংলা। পাশ্চাত্য না বলে তাকে আধুনিক বলাই সঙ্গত। স্কুল কলেজে প্রধানত আধুনিক বিদ্যাই শেখানো শুরু হয়। সংস্কৃতকেও স্থান দেওয়া হয়। আরবি, ফারসিকেও।

ইউরোপের রেনেসাঁসের অন্য নাম নিউ লার্নিং। সেখানকার রেনেসাঁসের সূচনা আর নববিদ্যার সূচনা সমসাময়িক। এদেশের রেনেসাঁসের সূচনা আর নববিদ্যার সূচনাও সমসাময়িক। নববিদ্যা যে চিরকাল ইংরেজি ভাষার সাহায্য নেবে এমন কোনো কথা ছিল না, এমন কোনো কথা নেই। বাংলাও নববিদ্যার বাহন হতে পারে। হচ্ছেও বাংলাদেশে। পশ্চিমবঙ্গে যদি না হয়ে থাকে তার কারণ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অঙ্গ। আর ভারত একটি বহুভাষী দেশ। প্রত্যেকটি রাজ্য যদি ভাষাভিত্তিক হয় তবে ভারত বহুধাবিভক্ত হতে পারে। যেমন হয়েছে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি। ইংরেজিই একমাত্র ভাষা যা সব রাজ্যের বিদ্বানরা বোঝেন, যা তাঁদের যোগাযোগের ভাষা। তাই ইংরেজির প্রয়োজন ফুরোয়নি, চিন্তার আদান-প্রদানের জন্যে তা অপরিহার্য এক লিঙ্গুয়া ফাঙ্কা। তা ছাড়া বাইরের বিশ্বের নতুন জ্ঞানও তো ইংরেজির সাহায্যেই আমরা পাচ্ছি। সংস্কৃত বা ফারসির মতো ইংরেজি গতিহীন নয়। এ দেশের ইংরেজি জানা লোকেরাই সবচেয়ে এগিয়ে। নিছক বাংলা জানা লোকেরা তুলনায় পেছিয়ে। রেনেসাঁস তো অগ্রসরদের নিয়েই হয়। সর্বজনকে দিয়ে নয়।

সার্বজনীন শিক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন। সেটাও হবে বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষা। তার সঙ্গে কারিগরি বা কৃষিকর্মের। কিন্তু তার জন্যে আমি ইংরেজির আবশ্যকতা দেখিনে। তবে যাদের বেলা সেটা উচ্চতর শিক্ষার সোপান তাদের জন্যে ইংরেজির ব্যবস্থা থাকা চাই। নইলে তাদের উচ্চতর শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শিক্ষার সম্পূর্ণতা ন্যায়ত সকলের প্রাপ্য, কিন্তু কার্যত তাদেরই, যারা তার যোগ্য ও যারা তাদের যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়েছে। শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে অন্তত পঁচিশ বছর বয়স লাগে, অতদিন অপেক্ষা করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া ক-জনেরই বা তাতে সত্যিকার আগ্রহ আছে? অধিকাংশেরই তো লক্ষ্য রুজিরোজগার। তার জন্যে জীবনের প্রথম পঁচিশটা বছর অপেক্ষা করতে রাজি হবে ক-জন? স্কুলের পড়া শেষ হতে-না-হতেই ইংল্যাণ্ডে আজকাল চাকরি জুটে যায় অধিকাংশের। চাকরি করতে করতে তারা রাতের বেলা ক্লাস করে, পরে পরীক্ষা দেয়, ডিগ্রি পায়। নয়তো লাইব্রেরিতে গিয়ে বা লাইব্রেরি থেকে বই আনিয়ে পড়াশোনা করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলাটাই মুখ্য। যারা পেছিয়ে পড়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রিধারী হলেও একালের দৃষ্টিতে সেকালের।

ইংরেজ আমলের আগে হিন্দুরা ছিল পেছিয়ে পড়া সেকেলে এক ধর্ম সম্প্রদায়। মুসলমানরা তাদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছিল গ্রিক থেকে অনূদিত আরবি গ্রন্থের ও আরবি থেকে অনূদিত ফারসি গ্রন্থের মাধ্যমে। ইটালিতে গ্রিক পণ্ডিতদের আশ্রয়গ্রহণের পূর্বে আরবরাই স্পেন জয় করে গ্রিক থেকে অনূদিত আরবি গ্রন্থের সাহায্যে সেকালের পক্ষে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দেয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিক থেকে সেটাও একপ্রকার রেনেসাঁস। কিন্তু তার সীমা অত্যন্ত সংকীর্ণ। গ্রিক থেকে কিছু দার্শনিক গ্রন্থও আরবিতে তর্জমা হয়েছিল। কিন্তু সবার উপরে কোরান সত্য, তাহার উপরে নাই। তাই মানবিকবাদী চিন্তা আরব-পারসিকদের

মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ভারতের মুসলিমসমাজ কালক্রমে সেকেলে হয়ে যায়। রিয়্যালিটির থেকে তাদের দূরত্ব মাদ্রাসার শিক্ষার দ্বারা ঘোচে না। ঘোচবার নয়। প্রয়োজন ছিল হিন্দু কলেজের অনুরূপ আর একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার অথবা হিন্দু কলেজেই অহিন্দু ছাত্রদের সহাধ্যয়নের। প্রথমটিতে মুসলিমসমাজের আগ্রহ ছিল না। দ্বিতীয়টিতে হিন্দুসমাজের আপত্তি ছিল। শেষে সরকারি চাপে হিন্দু কলেজের উচ্চতর বিভাগ রূপান্তরিত হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে, নিম্নতর বিভাগ নামান্তরিত হয় হিন্দু স্কুলে। মুসলমানরা কলেজ বিভাগে প্রবেশ পায়। কিন্তু তাদের সংখ্যা বাড়া দূরে থাক কমতে কমতে শূন্য হয়ে যায়। বোঝা গেল যে তারা কলেজ ফি জোগাড় করতে পারছে না। তখন তাদের জন্যে ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করতে হয়। ইতিমধ্যে হিন্দু ছাত্ররা ঝাঁকে ঝাঁকে পাস করে বেরিয়েছে। কেবল প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে নয়, বেসরকারি কলেজ থেকে; সেখানকার ফি অনেক কম। হিন্দু ছাত্ররা যে স্টার্ট পেয়ে যায় মুসলিম ছাত্ররা একই কলেজে পড়ে কোনোদিনই তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। তখন তাদের জন্যে আলাদা কলেজ খুলতে হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তো সেই একই। পরে তাদের জন্যে আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ও হল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টা প্রধানত তাদের স্বার্থেই প্রতিষ্ঠিত।

হিন্দু কলেজের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও ঐতিহাসিক ভূমিকা হল রেনেসাঁসের উদবোধন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে যে 'বুদ্ধির মুক্তি' গোষ্ঠীর উদয় হয় তার নজির কলকাতার হিন্দু কলেজের 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠী। ডিরোজিয়ো যার নেতা। মুসলমানপ্রধান পূর্ব বাংলার রেনেসাঁসের সূত্রপাত হয় মূল বাংলার রেনেসাঁসের শতখানেক বছর পরে। এই অস্বাভাবিক বিলম্বের একাধিক কারণ। প্রথম কারণটা হল খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে একাকার ভেবে ইংরেজির প্রতি অনীহা। এটা হিন্দুদের মধ্যেও কতক পরিমাণে ছিল। ওড়িশায় এ মনোভাব বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও লক্ষিত হয়েছে। চিন্তামণি আচার্যের পিতা তাঁকে ইংরেজি স্কুলে পড়তে পাঠাবেন না, ছেলে পাছে খ্রিস্টান হয়ে যায়। ছেলেকে বাড়ি থেকে পালাতে হয়। অমূলক আশঙ্কা। কিন্তু এর ফলে রেনেসাঁস বিলম্বিত। সারা দুনিয়ার মুসলমান এর দরুন পশ্চাৎপদ। ইংরেজির প্রতি অনীহা দূর হল যদি তো বাংলার প্রতি বিরাগ কিছুতেই যায় না। বাংলা নাকি হিন্দু ধর্মের সঙ্গে একাকার। পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও বাঙালি মুসলমান বাংলার মধ্যে হিন্দুত্বের গন্ধ পায়। যে ভাষা ইসলামের ভাষা নয় সেভাষা কী করে বাঙালি মুসলমানের ভাষা হবে? অথচ উর্দু শিখতেও সেউৎসাহ বোধ করে না। প্রতিযোগিতায় উর্দুভাষী মুসলমানদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। আরবি হরফে লেখা বাংলা, আরবি ফারসি দিয়ে 'পাক' করা বাংলা এমনই কতরকম প্রস্তাবের পর সেবাংলাকেই তার আপনার ভাষা বলে মেনে নেয় ও তার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করে।

ভূমি বা ভাষা এর একটির বা এ দুটির উপর দাঁড়িয়ে আছে যেকোনো দেশের রেনেসাঁস। তা সেইটালিরই হোক আর বাংলারই হোক। হিন্দুত্বের রেনেসাঁস হয় না, হয় রিফর্মেশন। ইসলামের রেনেসাঁস হয় না, হতে পারত রিফর্মেশন, কিন্তু এখনও হয়নি। হিন্দুরা এটা মোটামুটি বুঝতে পারে মাইকেল মধুসূদনের কীর্তি দেখে। তিনি ধর্মে হিন্দু নন, তাঁর স্ত্রী ফরাসি, তাঁর আচার সাহেবি, অথচ তাঁর সৃষ্টির জন্যে প্রত্যেক বাঙালির উচ্চতা বেড়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ বহুদেবতাবাদী সাকারবাদী হিন্দু নন, একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম। অথচ বিশ্বকবিসভায় তিনিই বাঙালির অদ্বিতীয় প্রতিনিধি। বাংলার রেনেসাঁসের আদিপুরুষ বলে যদি রামমোহনকে গণনা করি তবে তিনিও সাম্প্রদায়িক অর্থে হিন্দু নন। আর যদি রামমোহনকে রেনেসাঁসের আদিপুরুষ না বলে রিফর্মেশনের আদিপুরুষ বলি তবে রেনেসাঁসের আদিপুরুষ বলতে হয় ডিরোজিয়োকে। কিন্তু তাঁর চিন্তার বাহন ছিল বাংলা নয়, ইংরেজি। ঐতিহাসিক কারণে বাংলা আর ইংরেজি দুই ভাষাই হয় বাংলার রেনেসাঁসের আধার। রামমোহনের বেলাও তাই। মাইকেলের বেলাও তাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বেলাও তাই। এমনকী বিদ্যাসাগরও ইংরেজিতে লিখেছেন। এক্ষেত্রে দেশই বড়োকথা। ভাষা তার পরে।

এখন যাকে বাংলাদেশ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে তার বেলা কিন্তু ভাষাই বড়োকথা। দেশ তার পরে। পাকিস্তানের সৃষ্টি ধর্ম থেকে। বাংলাদেশের সৃষ্টি ভাষা থেকে। সেখানকার রেনেসাঁস বিলম্বিত হলেও

সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সবসময় মনে রাখতে হবে যে রিয়্যালিটির সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হবে নইলে বাংলাও সংস্কৃত ও ফারসির মতো পেছনে পড়ে থাকবে।

পরিশিষ্ট

পাশ্চাত্য রেনেসাঁস বেশি লোকের কাজ নয়, অল্পসংখ্যক বিদ্বান ও শিল্পীর কাজ। প্রাচীন গ্রিসেও প্রদীপের তলায় ছিল অন্ধকার। অধিকাংশ লোকই ক্রীতদাস বা ধর্মান্ধ। পাশ্চাত্য রেনেসাঁস যেখান থেকে প্রেরণা পেয়েছিল সেদেশ প্রাচীন গ্রিস। আর পাশ্চাত্য রিফর্মেশন যে-দেশ থেকে প্রেরণা পেয়েছিল সেদেশ প্রাচীন প্যালেস্টাইন। এই দুটো মুভমেন্ট বিচ্ছিন না হলেও স্বতন্ত্র। লুথার ক্যালভিনকে কেউ রেনেসাঁসের নায়ক বলে না। রেনেসাঁসের অগ্রণী যে ইটালি সেখানে কোনোদিনই রিফর্মেশন ঘটেনি। মোগলদের আমলে যে প্রদেশ মধ্যযুগে ছিল সেপ্রদেশ ইংরেজদের আমল শুরু হবার ষাট বছরের মধ্যেই আধুনিক যুগের আলো বাতাস লেগে নতুন করে জেগে উঠেছিল এটা কি বিস্ময়ের কথা? কোনোদেশে কোনোকালে সবাই কি একদিনে বা এক শতাব্দীতে জেগেছে? ইটালির গ্রামবাসী জনগণ কি আজও রেনেসাঁসের তাৎপর্য বুঝেছে? রেনেসাঁস থেকে শিল্পবিপ্লবে পৌঁছোতে ইংল্যাণ্ডেরই লেগেছে তিনশো বছর। ইটালির তো আরও বেশি। দক্ষিণ ইটালিতে এখনও ও-জিনিস হয়নি।

কাউন্টার রেনেসাঁস ইটালিতেও ঘটেছিল। কাউন্টার রিফর্মেশন জার্মানিতেও। এদেশে ঘটলে আশ্চর্যের কী আছে? আমাদের জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে সব রকমের লোক ছিলেন। বীরপূজা রাশিয়ার মতো নাস্তিকদের দেশেও দেখা যাচ্ছে। যুক্তিবাদ কোন দেশেই-বা সুপ্রতিষ্ঠিত! চীন দেশ কোনোকালেই ঈশ্বরবাদী ছিল না। কিন্তু কোথায় তার রেনেসাঁস! একটি মাত্র মুভমেন্টের উপর মানবভাগ্য নির্ভর করে না। সেমুভমেন্টের দৃঢ়ভিত্তি ইউরোপেও বিরল। দুই মহাযুদ্ধ ও রুশ বিপ্লবের পর সেভিত্তিও তেমন দৃঢ় নয়। নইলে সুররিয়ালিস্ট চিত্র বা অ্যাবসার্ড নাটক আসে কেন?

পশ্চিমের রেনেসাঁসের আদিপর্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা ছিল ল্যাটিন। সেভাষায় শিক্ষালাভ করতে ও শিক্ষাদান করতে এক প্রান্তের বিদ্যার্থী ও বিদ্বানরা অপর প্রান্তে যাতায়াত করতেন। অমনি করেই রেনেসাঁস সর্বত্র সঞ্চারিত হয়। ল্যাটিন থেকে ইটালিয়ান, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান ভাষায় উপনীত হতে সাহিত্যের বেলা বেশি দিন লাগেনি, কিন্তু দর্শন বিজ্ঞানের বেলা বহু শতাব্দী লেগে যায়। জার্মানরাই সকলের আগে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাটিনের পরিবর্তে জার্মান চালায়। অথচ ইংরেজরা এই সেদিনও ল্যাটিন পরীক্ষায় পাস না করলে অক্সফোর্ডে কেম্ব্রিজে প্রবেশপত্র দিত না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বঙ্গীকরণ কি রাতারাতি হতে পারে? বঙ্গীকরণ কেন গত শতাব্দীতে হল না, কেন এই শতাব্দীতে হচ্ছে না, তার কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান আলো-বাতাসের মতো আন্তর্জাতিক। মাটির মতো জাতীয় নয়। সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা হয় না। ইংরেজিই একালের ল্যাটিন বা সংস্কৃত। তাকে হটানো জনগণের স্তরে সম্ভব, কিন্তু সুধীজনের স্তরে অসম্ভব। লোকভাষা দিয়ে পপুলার সায়েন্স লেখা যায়, কিন্তু সায়েন্স লিখতে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আচার্যরা এখনও তো পারলেন না। যে দু-একজন চেষ্টা করেছেন তাঁরা ভারতের অন্যত্র অপঠিত ও অচলিত, ভারতের বাইরে তো অজ্ঞাত ও অপাঙক্তেয়। অমন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকেই-বা চিনত কে, যদি-না তাঁর রচনা ইংরেজিতে তর্জমা হত?

রেনেসাঁস জনগণের সৃষ্টি নয়। জনগণের কাছে তাকে পৌঁছে দিতে হলে তার দায়িত্ব নিতে হবে লোকশিক্ষকদের। নিরক্ষরতা দূর করতে হবে, লক্ষ লক্ষ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। বেতার ও টেলিভিশনের সাহায্য নিতে হবে। রাষ্ট্র যতদিন-না যুদ্ধের জন্যে খরচ কমিয়ে শিক্ষার জন্যে খরচ বাড়াচ্ছে ততদিন ওটা দুরাশা। স্বাধীনতার পরে সামরিক ব্যয় বহুগুণিত হয়েছে। যন্ত্রশিল্পের বিস্তারও প্রভূত ব্যয়সাপেক্ষ। তবে লোকশিক্ষার সমস্যারও একদিন সমাধান হবে। যেটার হবে না সেটা রেনেসাঁসের মূল সমস্যা। হাজার হাজার বছর আমরা চর্বিতচর্বণ ছাড়া আর কিছু করিনি। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস একই বিষয়বস্তু নিয়ে শত শত গ্রন্থ রচনার ইতিহাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও তাই।

বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অপূর্ব আবিষ্কার না হলে রেনেসাঁস হয় না। অজ্ঞেয়বাদ এদেশে আড়াই হাজার বছর আগেও ছিল। তার থেকে ক-খানা মহাকাব্য হতে পারে! যুক্তিবাদের চূড়ান্ত দেখিয়েছেন বৌদ্ধরা। সে-ই বা কী রেখে গেল! সব দিক বিবেচনা করলে গত শতাব্দী ভূতপূর্ব বহু শতাব্দীর মতো বন্ধ্যা নয়, উর্বরা। বীজ এসেছিল বাইরে থেকে আলোর সঙ্গে বাতাসের সঙ্গে।